Elementary Teachers' Training
(In Service)

Through Distance Education

Two Year D.El.Ed. Course (ODL) for Para-teachers and Residual Primary School Teachers 2015-17

Art, Health, Work Education
&
Physical Education

(Bengali Version)

West Bengal Board of Primary Education
Acharya Prafulla Chandra Bhawan
D.K. -7/1, Sector-2 Salt Lake
Bidhannagar, Kolkata - 700091

West Bengal Board of Primary Education

Revised 2nd Edition, published by WBBPE in 2014
Updated Reprint Edition for Para-teachers and Residual Primary School Teachers
2015-17

Neither this book nor any key, hints, comments, notes, meaning, connotations, annotations, answers and solution by way of questions and answer or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the President, West Bengal Board of Primary Education.

Publisher : **Prof. (Dr) Manik Bhattacharya, President**
West Bengal Board of Primary Education
Acharya Prafulla Chandra Bhawan,
D.K. -7/1, Sector-2, Bidhannagar,
Kolkata - 700 091

Prelude

It gives us immense pleasure to announce that a Two-year D.El.Ed Course, ODL Mode (approved by N.C.T.E) is about to commence as a result of the collaborative efforts of the WBBPE with the Govt. of West Bengal in the School Education Deptt. after having overcome all the obstacles. This is going to solve the problems of the existing in-service untrained Primary Teachers of our state in the context of N.C.F. -2005, N.C.F.T.E.-2009 and RTE Act-2009 as well. It has been decided that this two year teacher-training course will be conducted in the Open Distance Learning Mode under the aegis of the West Bengal Board of Primary Education for the next three years. Following the order of the School Education Department, W.B., a team of experts comprising eminent educationists, representatives of N.C.T.E and IGNOU has very sincerely prepared the syllabus, study materials, guide books for the trainees and the Coordinators and Counsellors of the 2 year D.El.Ed Course (ODL Mode) under the supervision of WBBPE. The curriculum and Syllabus of the core papers, four method papers with one compulsory optional paper out of two and four practical papers have been framed. Separate year wise study materials have been prepared for each paper and approved by NCTE.

The WBBPE will be glad if these study materials and guide books, which have been developed following the norms of the Open Distance Learning Mode, prove to be fruitful.

The WBBPE welcomes constructive suggestions and feedback for the improvement of these publications. The West Bengal Board of Primary Education would also like to convey sincere gratitude to all the eminent academicians from the NIOS, NCTE, IGNOU, SCERT, West Bengal DIETs, PTTIs and the Syllabus Committee and all others involved in the process of composition, editing and publication of these books.

Dr. Manik Bhattacharya

December, 2014

President
West Bengal Board of Primary Education

আমাদের কথা

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা - ২০০৫, জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা শিক্ষক শিক্ষণ ২০০৯ শিশুর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামুলক শিক্ষার অধিকার আইন - ২০০৯ এর প্রাসঙ্গিক ধারা উপধারা মাথায় রেখে আমাদের ২ বছরের দূর শিক্ষার মাধ্যমে ডি. এল. এড. কোর্সের পাঠক্রম, পাঠ্যবিষয় ও আনুষঙ্গিক বিষয় ও রূপরেখা স্থির করা হয়েছে। এই তিনটি আবশ্যক বিষয় যাতে শিক্ষক শিক্ষিকাগণের ধারণা, কার্য্যপ্রণালী ও চিন্তনের মধ্যে আসে, আমাদের বর্তমান কোর্সের মূল উদ্দেশ্য সেটাই। RTE Act বা শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে সব শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। শ্রেণি কক্ষে শিক্ষক যে প্রণালীতে বা পদ্ধতিতে বিষয় উপস্থাপন ও আলোচনা করবেন, তাতে তাঁকে মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোযোগ, জিজ্ঞাসাকে সঙ্গী করে নিয়ে তিনি পাঠে অগ্রসর হচ্ছেন। শ্রেণি পাঠনের বেশ কিছু সময় যেন শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ব্যয় করা হয়। শিক্ষার্থীদের বিষয় জানবার অধিকার আছে।

মনে রাখা দরকার পঠন-পাঠন হবে শিক্ষার্থী বান্ধব এবং শিশু কেন্দ্রিক। অনুসৃত হবে কর্মভিত্তিক, আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া। শিশুকে সমস্ত রকম মানসিক ভীতি ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশে সাহায্য করতে হবে। শিশুর বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯-এর ২৯নং ধারার আটটি উপধারা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে শিশুর জ্ঞানের উপলব্ধি ও প্রয়োগ ক্ষমতা তার নিরবিচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন করতে হবে।

শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে আপনার নতুন ভূমিকার কথা আপনি মনে রাখবেন-এই অনুরোধ।

আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা সফল হবেই।

ডিসেম্বর, ২০১২

অধ্যাপক ডঃ মানিক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি
পশ্চিম বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

Preface for the Second Edition

Modules of Two Year D. El. Ed Course were first prepared in the year 2012 for the teachers' training of in-service Primary Teachers of West Bengal through ODL mode. The modules were very much popular to its clienteles and were effective in imparting training. In the mean time the curricula of Primary Education and of regular Two Year D. El. Ed. have been changed. With a view to incorporate those changes in the Primary Teachers' Training the content and style of presentation have also been changed in the modules of Two Year D. El. Ed. (ODL) Course for the next session. Hope this module would enjoy more support from its clienteles. Any suggestion for the improvement of this module will be thankfully received.

With best wishes to all,

December, 2014.

Prof.(Dr.) Manik Bhattacharya

President

WBBPE

Preface to the Reprint of Art, Health, Work Education

(Written according to the ODL- Syllabus, revised in 2014)

Reference : Two Year D.El.Ed. Course (ODL) for Para-teachers and Residual Primary Teachers

Session-2015-17

(Vide NCTE-Approval No. F.62-3/2011/NCTE/N&S, Dated : 24.04.2015)

It gives me profound pleasure to write that the reprint-edition of the Module Art, Health, Work Education for the Teacher trainees, undergoing the second year of Two Year D.El.Ed. (ODL) Course for untrained Para-teachers of both Primary and Upper Primary schools as well as residual primary teachers has been procured both in Bengali and English versions and is being distributed free of cost to all the registered trainees.

This Reprint Edition has also been updated accordingly by the members of the Core-faculty Council of the Board. This book is only meant for the Two year D.El.Ed. (ODL) Course-2015-17 for in-service teachers, not for any other course or syllabus. No such book can be sold in the market. If anybody is found to be selling this book or photocopy there of or printing notebook/guidebook, she/he shall be punished in accordance with law.

Hope, this book will help the trainee teachers understand the spirit and content of the subject for furtherance of the search for quality in Elementary Education.

February-2018

Prof (Dr.) Manik Bhattacharya

President
West Bengal Board of Primary Education

পাঠ্যসূচী

শিল্পশিক্ষা (Art Education) পৃষ্ঠা নং

পাঠ একক ঃ ১ কৃৎকলা (Performing Art) 1-60

পাঠ একক ঃ ২ চারুশিল্প (Visual Art) 61-90

কর্মশিক্ষা (Work Education)

পাঠ একক ঃ ৩ কর্মশিক্ষা (Work Education) 91-108

স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা (Health and Physical Education)

পাঠ একক ঃ ৪ স্বাস্থ্যশিক্ষা (Health Education) 109-142

পাঠ একক ঃ ৫ শারীরশিক্ষা (Physical Education) 143-183

শিল্পশিক্ষা

Art Education

পাঠ একক - ১
কৃৎকলা (Performing Art)

১.১ ভুমিকা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চ-প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত

- ১.৩.১ শিল্প ও নন্দনতত্ত্বের সংজ্ঞা ও ধারণা
- ১.৩.২ শিল্প শিক্ষার তাৎপর্য

১.৪ সংগীত

- ১.৪.১ সংগীত কী?
- ১.৪.২ ভারতীয় সংগীতের প্রকারভেদ
- ১.৪.৩ লোকসংগীত
- ১.৪.৪ বিদ্যালয় পাঠক্রমে সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব
- ১.৪.৫ প্রথিতযশা সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব
- ১.৪.৬ প্রাথমিক থেকে উচ্চপ্রাথমিক পর্যন্ত কয়েকটি সংগীতের নমুনা
- ১.৪.৭ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র
- ১.৪.৮ একজন প্রথিতযশা যন্ত্রশিল্পীর অবদান

১.৫ নৃত্য

- ১.৫.১ নৃত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য
- ১.৫.২ নৃত্যের ইতিহাস
- ১.৫.৩ বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়
- ১.৫.৪ বাংলার লোকনৃত্য
- ১.৫.৫ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নৃত্য
- ১.৫.৬ প্রাথমিক থেকে উচ্চপ্রাথমিকে নৃত্য শিক্ষার গুরুত্ব

১.৬ নাটক

- ১.৬.১ উদ্দেশ্য
- ১.৬.২ শিক্ষাক্ষেত্রে নাটকের প্রয়োগ
- ১.৬.৩ প্রথিতযশা নাট্যব্যক্তিত্ব

১.৭ পাঠ্যবই ভিত্তিক সমন্বিত শিক্ষণের ধারণা (Textbook based Integrated Approach)

১.৮ সারসংক্ষেপ

১.৯ অনুশীলনী

১.১০ আপনার অগ্রগতি যাচাই-এর উত্তর

১.১ সূচনা: (Introduction)

ভূমিকা : '' একটি শিশুর ব্যক্তিত্বের উন্নতি ও তার সামগ্রিক
বিকাশের জন্য প্রয়োজন—সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলা''

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হলো—এদেশের শিল্পকলা। ভারতীয় শিল্পকলার সম্পর্কে শিশুদের যদি শৈশব থেকেই সম্যক ধারণা গড়ে ওঠে তাহলে সে তার জাতির শিল্পকলাজাত প্রাচুর্য্য ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হবে। এই বোধ তাদেরকে নিরপেক্ষতা, সৃজনশীল মনন, এবং সুনাগরিক করে গড়ে তুলবে।

শিল্প শিক্ষণের চারটি প্রধান ধারা প্রচলিত, যথা: (i) সঙ্গীত; (ii) নৃত্য; (iii) নাট্য/নাটক এবং (iv) চিত্রকলা। প্রতিটি বিভাগই নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার ভান্ডারে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রতিটি বিভাগে পারদর্শী না হয়েও উপরে বর্ণিত বিষয়গুলির যে কোন বিষয়েই যদি চর্চা করি তাহলে অন্যায্য বিষয়গুলির উপরেও সম্যক জ্ঞান অর্জন করা যায়। অতএব শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীও সমাজ উভয়েই উপকৃত হয়।

একটি শিশুর দৈহিক মানসিক তথা সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে। যথা যে অনুভূতি প্রবণ, অনুমান করার ক্ষমতা, বিচার বোধ, কল্পনা শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে দৃঢ়ক্ষমতা সম্পন্ন হয়।

শিল্প শিক্ষণ শিশুকে বোধ-সম্পন্ন, শৃঙ্খলা পরায়ন, মনোনিবেশে সক্ষম, ধৈর্য্যশীল এবং উদ্ভাবনী-শক্তি সম্পন্ন করে গড়ে তোলে। শিল্প -শিক্ষণ শিশুর মধ্যে শেখার ইচ্ছা ও শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করে তোলে।

অতএব শিল্প-শিক্ষণ হল এমন একটি নান্দনিক মাধ্যম যার মধ্যে দিয়ে শিশুকে এই জাতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যের ধারনা-তাসে আলো, বাতাস, বর্ণ, গন্ধ, চলনশীলতা, গঠন, ধরন এবং শব্দ সম্পর্কে অবহিত করে। তাই শিল্প-শিক্ষণ ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের পরম্পরা পাশাপাশি চলে এবং পারস্পরিক সুবিধা হয়।

১.২ উদ্দেশ্য :(প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ-প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত)

- আনন্দের অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করা।
- পারিপার্শিকতা সম্বন্ধে শিশুর মধ্যে সংবেদনশীলতা তৈরী করা।
- কাদা-মাটি, বালি, নুড়িপাথর, ফুল, পাতা এসব প্রাকৃতিক উপকরণ (যা কিনা অতি সহজ লভ্য) দিয়ে খেলার ছলে স্বাধীনভাবে শিশুকে শিখতে সাহায্য করা।
- গতিশীলতা এবং শব্দের সাহায্যে সঙ্গীত বা নৃত্যের মাধ্যমে শিশুকে শিখতে সাহায্য করা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে শিশু ছড়া, নানা রঙের সম্পর্কে এবং নানা আকার সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা।

- দলগতভাবে এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে লিখতে শেখানো।
- প্রচলিত ছকে বাঁধা উত্তরপত্রের সাহায্য ছাড়াই শিশুকে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নিতে দক্ষ করে তোলা।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের আবেগ ও ধারণাকে স্পষ্ট ও স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা।
- পর্যবেক্ষণ, আবিস্কার ও অনুভূতি ব্যক্ত করার মতো প্রয়োজনীয় দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো।
- পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অখণ্ড/পরিপূর্ণ শিক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- শুধু নিজেরাই নয় অন্যের ভাবনা-শক্তির প্রাথমিক স্তরে শিল্প-শিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুর পঞ্চইন্দ্রিয়ের সঠিক ব্যবহার করা। এই কোর্সের পরিকল্পনাই করা হয়েছে শিশুকে তার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে ব্যক্তিসত্তা অনুযায়ী সঠিকভাবে বিকশিত করে তোলার জন্য।

  কাজকেও সমমর্যাদা দেওয়া।

১.৩ (প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চ-প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত) শিল্প ও নন্দন তত্ত্ব

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঠক্রম তৈরী করা প্রয়োজন। সৃজনশীলতা, নিজেকে ব্যক্ত করার স্বাধীনতা এসবই যদি পাঠক্রমের মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় তবে তা শিশুর ভবিষ্যতের পক্ষে অনেক বেশী কার্যকরী হয়।

উচ্চপ্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে চিরায়ত শিল্প ও লোকায়ত শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে হবে যাতে শিশু বা শিক্ষার্থী নিজেই সেই পাঠে আগ্রহী হয় ও পরবর্তীতে সুযোগ অনুযায়ী সেই কৃতকৌশল বা -কৃতকলার প্রদর্শন করতে পারে। এইভাবে শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাদান একদিকে যেমন মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে অন্যদিকে শিশুর শারীরিক/ মানসিক তথা সম্পূর্ণ বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয়।

সুতরাং প্রাথমিক স্তরেই যদি শিশুকে শিল্প শিক্ষার হাতে কলমে পাঠ দেওয়া যায় অর্থাৎ গান করা-শোনা-নৃত্য কলাদি -দেখা ও শোনা-ইত্যাদির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষার সূচনাটুকু করে দেওয়া যায়-তবে পরবর্তীকালে শিক্ষা তার কাছে হয়ে ওঠে আনন্দদায়ক।

তাই উচ্চপ্রাথমিক স্তরে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে যেমন শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে তেমনই সমাজ ও উপকৃত হবে।

১.৩.১ শিল্পও নন্দন তত্ত্বের সংজ্ঞা ও ধারণা (Meaning and Concept of Arts and Aesthetics)

শিল্প হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা সুচিন্তিত বিচার বিবেচনার দ্বারা ঘটনার পরম্পরা বা ব্যক্তি মানস ও সমাজের উপর প্রভাব ফেলে। শিশুর বিচার-বুদ্ধি, তার আগে তার বুদ্ধি বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রন করে। শিল্পবোধ শিশুকে তথা শিক্ষার্থীকে মানুষের

বিভিন্ন শৈল্পিক কার্যাবলী, কারখানার নানা বৈচিত্রময় সম্ভার তাকে পরিবেষ্টন করে রাখে। কাজেই শিল্প শিক্ষার অর্থ আর তার দর্শনতত্ত্বের মধ্যেই নন্দনতত্ত্বের (aesthetics) এর ধারণা অর্ন্তনিহিত আছে।

প্রথাগত ধারণাঅনুযায়ী শিল্প শিক্ষা কথাটির প্রয়োগ হয় তখনই যখন কোন ব্যাপারে দক্ষতার প্রয়োজন। বর্তমানে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে।

শিল্পকলা হলো মানুষের মৌলিক চিন্তনের/মননের এক শ্রেণীবদ্ধ নৃতাত্ত্বিক তথা যুক্তিবোধের বিকাশ। সাধারণভাবে মানুষের চিন্তন ও মননের সার্বিক উদ্দীপনার কাজ করে এই শিল্পকলা।

নন্দনতত্ত্ব হল এমন কিছু দর্শনের সমষ্টিগত প্রকাশ যা প্রকৃতি, পরিবেশ কলা বিদ্যা, অনুভব ক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও সুন্দরের পূজার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে বিকাশও হয়। আরও বিস্তারিত ভাবে বলতে হলে নন্দনতত্ত্ব হলো ললিতকলা। কৃষ্টি আর সমগ্র চরাচর তথা বিশ্বপ্রকৃতির সভ্যতার সমকালীন প্রতিফলন।

১.৩.২ প্রাথমিক শিক্ষায় শিল্প শিক্ষার তাৎপর্য (Significance of Art education at Elementary Label) & Art Education-এর গুরুত্ব

স্বাধীনতার পর থেকেই বর্তমান সময় অবধি রাষ্ট্রে শিশুর সার্বিক বিকাশের স্তর থেকেই প্রথাগত শিক্ষার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক দেশীয় ঐতিহ্য তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারার সাথে ছোটবেলা থেকেই প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ধীরে ধীরে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে নানাবিধ পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। বলা হয় যে, প্রতিটি ছাত্র তথা শিক্ষার্থীর পড়াশুনা খেলাধূলার বাইরেও কিছুটা সময় কোন বিশেষ শিল্পকর্ম বা শিল্পের কোন বিশেষ ধারায় চর্চা করে পরবর্তী কালে জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে প্রয়োগ ঘটাতে পারে। কেবলমাত্র উপার্জন নয় বরং হাতে কলমে নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী কাজ করে গঠনমূলক কাজ করার আনন্দ অনুভব করতে পারে একই সাথে শ্রমের মূল্যের যথাযথ মর্যাদা দিতে শেখে।

লোকায়ত বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যমে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে মানুষকে সংহতির সূত্রে গাঁথে। একসূত্রে গ্রথিত মানুষের সামাজিক উত্তরণ ঘটে। সমৃদ্ধ হয় দেশ ও জাতি তথা ব্যক্তি মানুষ নিজে।

নৃতত্ত্ব লোকায়ত শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব ও ললিতকলার মাধ্যমে মানুষে মানুষে সেতু তৈরীর কাজ সহজ হয়। তাই এর শিক্ষা শিশুকাল থেকে দেওয়া হলে ভবিষ্যতের ব্যক্তি মানসে তা গ্রথিত হয়ে যায় ও শিশুর ব্যক্তিত্বের সহজ সরল অথচ সাবলীল বিকাশ ঘটে।

প্রদর্শিত শিল্পকলা বলতে কি বুঝি ? (What is Performing art?)

প্রদর্শিত শিল্পকলা তথা Performing art হলো কোনো নির্দিষ্ট আঙ্গীকের শিল্পকলার মাধ্যমে সরাসরি দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। এর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিবিশেষ এককভাবে বা যৌথভাবে কোনো শিল্পকর্ম সংগীত, নাটক ইত্যাদি মঞ্চে উপস্থাপন করেন। সেক্ষেত্রে শিল্পীর মন প্রাণ আবেগ অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের প্রয়োজন। প্রদর্শিত শিল্পকলার মাধ্যমগুলি হলো সংগীত নাটক, নাচ, ম্যাজিক, মাইম ইত্যাদি। এগুলি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে শিল্পীরা বিভিন্ন সাজ পোষাক ও মেকআপ করেন যার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ ভাবনা বা চরিত্র ফুটিয়ে তোলা সহজ হয়। বিভিন্ন আঙ্গীকের প্রদর্শিত শিল্পকলার মধ্যে কয়েকটির সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১.৪ সঙ্গীত (Music)

ইংরেজী Music শব্দ এসেছে Muse থেকে। গ্রীক দেবতা Zeus এবং দেবী Mnemosyne এর কন্যা Muse, এঁরাই কবি ও গায়ককে অনুপ্রাণিত করেন, তারই ফলে সৃষ্টি হয় সঙ্গীত। স্বভাবতই এটি পুরানের একটি কাল্পনিক কাহিনী। প্রত্যক্ষভাবে বলতে গেলে, কোনও বস্তুকে অপর বস্তু দিয়ে আঘাত করলে শব্দ সৃষ্টি হয় এবং যে পদার্থকে আঘাত করা হলো তার পরমানুর মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়। সেই কম্পনে চারদিকের বায়ু কম্পিত হয়। সেই কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ কানে প্রবেশ করে আমাদের মস্তিষ্কে পৌছায় এবং আমরা শব্দ অনুভব করি। সব শব্দ আমাদের কানে ধরা পড়ে না। শব্দের প্রতি সেকেন্ডে ২০ বারের কম প্রকম্প বা ২০ হাজার বারের বেশী হলে তা আমরা শুনতে পাই না। এই প্রকল্পের সমান মাত্রা থেকেই সুরের সৃষ্টি হয়। সুরের একত্ব ও বহুত্বই সঙ্গীত। তালই সঙ্গীতের মূল কথা।

সঙ্গীতকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করা না গেলেও সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগের ও ধরনের ভিত্তিতে আমরা বিভক্ত করতে পারি। সঙ্গীত একটি সুসম্পাদিত, সূক্ষ্ম, শ্রুতি কলা যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। সামবেদকে বলা হয় ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস। কিন্তু এই মত বিতর্কিত কারণ বৈদিক সভ্যতার আগেও ভারতে অনার্য, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষা ও সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া গেছে।

১.৪.১ সংগীত কি?

গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি কলাকে একত্রে বলা হয় ''সংগীত''। প্রাচীন গ্রন্থ (সংগীত রত্নাকরে) বলা হয়েছে—''গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীত মুচ্যতে।''

গীত— সুর ও তালের দ্বারা কণ্ঠের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে 'গীত' বলে।

বাদ্য— সুর ও তালের দ্বারা যন্ত্রের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে 'বাদ্য' বলে।

নৃত্য— ছন্দ সহযোগে দর্শন সুখকর অঙ্গাভঙ্গীর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে 'নৃত্য' বলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে গীত, বাদ্য ও নৃত্য তিনটি পৃথক কলা। এই তিনটি কলাকে একত্রে 'সংগীত' (সম+গীত) বলে।

বৈদিক যুগে পূজার্চনায় সামগান গাওয়া হোত, সংগে বীণা, বংশী, মৃদংগ, শৃঙ্গারাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হোত। ব্রাক্ষ্মণগণ স্তোত্রপাঠে নানা প্রকার অঙ্গ সঞ্চালন করতেন।

১.৪.২ ভারতীয় সংগীতের প্রকারভেদ

''ভারতীয় সংগীতের দুইটি মুখ্য পদ্ধতি''

ভারতবর্ষে সংগীত ঠিক কোন সময় থেকে আরম্ভ, তা সন তারিখ দিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভারতর্ষের সংগীত পৃথিবীর আদিমতম সংস্কৃতির অন্যতম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অনেক বিদ্যার ন্যায় সংগীতেও ভারতবর্ষের কাছে ঋণী। যেমন—বর্মা, চীন, জাপান, শ্যাম, কম্বোডিয়া, পারস্য ইত্যাদি। আদিমতম কাল থেকে বরাবর ভারতীয় সংগীত একই ধারায় বয়ে চলেছিল। শার্ঙ্গদেবের সময় (জন্ম আনুমানিক ১২১০ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। ভারতবর্ষে মুসলমান আগমনের ফলে উত্তর ভারতের আর্য সংগীতের সংগে মুসলমান রীতির সং মিশ্রনে ভারতীয় সংগীতের ধারায় পরিবর্তন হয়। তারপর থেকেই ভারতীয় সংগীত 'উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়' এই দুই ধারায় পৃথক হয়ে যায়, বর্তমানে ভারতের দুই প্রকার সংগীত পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়।

উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী পদ্ধতি ঃ উত্তর ভারত অর্থাৎ বিন্ধ্যাচল পর্বত শ্রেণীর উত্তর দিক অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম, বিহার, ত্রিপুরা ইত্যাদি প্রদেশে প্রচলিত পদ্ধতি।

দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকী পদ্ধতি ঃ দক্ষিণ ভারতে অর্থাৎ বিন্ধ্যাচল পর্বত শ্রেণীর দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ তামিলনাড়ু, দক্ষিণ কেরল, অন্ধ্র, মহীশূর ইত্যাদি প্রদেশে প্রচলিত পদ্ধতি।

ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন ধারা ঃ

খেয়াল — বাংলায় যাকে খেয়াল (হিন্দী ও উর্দূতে খ্যাল) বলা হয় সেই শব্দটি মূলত আরবী শব্দ আরবী ভাষায় এর উচ্চারণটা অনেকটি এইরূপ 'খ'য়াল। কথাটির অর্থ চিন্তা, কল্পনা, উদ্যম, ভাবনা, মতলব, ঝোঁক প্রভৃতি। খেয়াল গান বলতে সাধারণভাবে আমাদের মনে এমন ধরণের গানের কথা জাগে যা কল্পণাত্মক এবং যা গায়কের মর্জির উপর নির্ভর করে। ভারতীয় উচ্চাংগ সংগীতের একটি বিশেষ রীতির নাম খেয়াল। এই নামকরণ হওয়ার কারণ বিষয়বস্তু এবং প্রয়োগের দিক থেকে এটা কল্পণাত্মক। রাগের কাঠামো ছাড়া ধ্রুপদের মত এর দৃঢ়বন্ধন নেই।

খেয়াল দুই-তুক বিশিষ্ট গান। অর্থাৎ স্থায়ী এবং অন্তরা নিয়ে এই গানের কাঠামো সম্পূর্ণ হয়। বন্দেশ শুরু হওয়ার আগে নির্দিষ্ট রাগে সামান্য আলাপচারী করা হয়, একে বলে পুর্ব্বালাপ। গানের কাঠামোতে যতদূর সম্ভব স্বরবিস্তার (রাগের শুদ্ধতা বজায় রেখে) চলে। এই গানে মুর্চ্ছনা, গিটকিরী প্রভৃতি অলংকার ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বোপরি চলে তান প্রয়োগ। এই তানের আবার বহু রকমফের বর্ত্তমান। এই গানে শিল্পীর স্বাধীনতা বেশী।

খেয়াল গানে বিষয়বস্তুর বিশেষ কোনো বাঁধাধরা গন্ডি নেই, এর বিষয়বস্তুর মধ্যে নিংসর্গ চিত্র, ঋতুবর্ণনা, ভক্তিমূলক পার্থিব নরনারীর আশা আকাঙ্খার কথাও পাওয়া যায়। সাধারনত: একতাল. ত্রিতাল, ঝুমরা প্রভৃতি তালে এই গান গাওয়া হয়।

ভজন — মধ্যযুগের এক শ্রেণির ভক্তসাধক যে আকুতিভরা গানে ভগবান কৃষ্ণের বা রামচন্দ্রের সাধনা করতেন তাকে ভজন বলা হয়। ভজন শান্তরসের গান — কৃষ্ণপদে আত্মনিবেদনই এ গানের মূলসুর। মীরাবাঈ, কবীর, নানক প্রভৃতিদের রচিত ভজন গান বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেছে - এ গানের সুর ও চলনভঙ্গি বাংলার ধর্মীয় সংগীতকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে।

ধ্রুপদ — ধ্রুপদকে বলা হয় ভারতীয় মার্গ সংগীতের আদিগান, যদিও এ নিয়ে মতভেদ আছে। ধ্রুপদের পুরো কথাটি হল ধ্রুবপদ (ধ্রুব - বিষ্ণু, পদ - কলি) এ গান ঈশ্বর বর্ণনামূলক, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর 'কণ্ঠ কৌমুদি' গ্রন্থে ধ্রুপদ গানের বর্ণনা প্রসংগে লিখেছেন '' যে গীতে দেবতার শিক্ষা, রাজাদের যশ ও যুক্ত প্রভৃতির বর্ণনা থাকে তাকে ধ্রুপদ বলে''— ধ্রুপদ গানে প্রাকৃতিক অর্থাৎ ঋতুর বর্ণনাও থাকে। ধ্রুপদ চারতুক বিশিষ্ট উচ্চাংগ সংগীত। এই চারতুকের নাম স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, ধ্রুপদ গানে আলাপের একটি বিশেষ ভুমিকা আছে। বন্দেশ বা বন্দেজ গাইবার আগে এই আলাপচারিতা করা হয়। আলাপে নির্দিষ্ট রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলি বিভিন্ন প্রকার বিন্যাস দ্বারা রাগটিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধ্রুপদের আলাপে রি, রে, তা, না, নুম, তুম, তোম, নোম ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই সময় কোনো তালবাদ্য হয়না, আলাপ শেষ হলে বন্দেশ গাওয়া হয়। ধ্রুপদ গানে তান এবং সরগম ব্যবহৃত হয় না, এই গানে অগ, মীড়, গমক, মুর্চ্ছনা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

ধ্রুপদ গানের সংগে পাখোয়াজ তালবাদ্য সংগত করা হয়, সাধারনত: আড়া চৌতাল, চৌতাল, সুর ফাঁকতাল প্রভৃতি বিস্তৃত আবর্ত্তন বিশিষ্ট তানে ধ্রুপদ সংগত নিবদ্ধ থাকে। ধ্রুপদ সংগীতে ভাবগাম্ভীর্য্যকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এই তাল বিশেষ সহায়তা করে।

ধামার — ধামার এক প্রকার তাল। ধ্রুপদ যখন ধামার তালে গাওয়া হয় তখন তাকে ধামার গান বলা হয়। ধামারগানে ধ্রুপদের মত পরিপূর্ণ স্থির গাম্ভীর্য্য নেই। এতে শৃংগার রসোদ্দীপক প্রেমগীতি বেশি রচিত হয়ে থাকে। বৎস্তোৎসব উপলক্ষ্যে ভগবদলীলা সম্বন্ধীয় ধামার তালাশ্রিত ধ্রুপদকেই হোরী বা ধামার বলে। ধ্রুপদের পরেই ধামার গাইবার রেওয়াজ ছিল।

ধ্রুপদ অপেক্ষা লঘুতর রচনা। ধামার গানেও ধ্রুপদের মতো নানা লয়কারী দেখানো হয়। এই গানে অলংকার বেশি থাকে। ধামার তালে ধ্রুপদ রচিত হলে তাকে যেমন ধামার গান বলা হয়। তেমনি ঝাঁপতালে ধ্রুপদ গান রচিত হলে তাকে বলা হয় সাদরা। এই গানে তানের অবকাশ নেই।

টপ্পা — টপ্পা একটি হিন্দী শব্দ। এর আদি অর্থ লম্ফ বা টপকে যাওয়া। এই গান শৃংগার রসাত্মক, ঠুংরী যেমন মিলনাত্মক টপ্পা বিরহাত্মক। প্রাচীনকালে পাঞ্জাবে উট পালকগন এক প্রকার গান করতেন তা থেকে ১৭ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে শোরী মিঞা প্রথম টপ্পা গাইতে শুরু করেন। এর পরেই নিধুবাবু হিন্দুস্থানী রাগ রাগিনী ও তান অনুসরণ করে বাংলা গান রচনা করে গাইতে আরম্ভ করেন। মোটা দানা বিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ ভংগীর তান প্রয়োগ করে নিধুবাবু যে বাংলা গান রচনা করেছিলেন তা পরবর্তী কালে বহু সংগীত রচয়িতাকে প্রভাবিত করেছিল। একসময় নিধুবাবুর টপ্পাগান বাংলার সংগীত জগতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল— তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে তার জনপ্রিয় গানগুলি 'গীত ও রত্ন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তার সব গান স্থান পায়নি। নিধুবাবু রচিত বিশেষ জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে' 'তোমারি তুলনা তুমি প্রান' প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য— টপ্পা খুব সংক্ষিপ্ত গান, এরও দুটি ভাগ— স্থায়ী ও অন্তরা, কথার সঙ্গে একধরণের দানাযুক্ত তান যুক্ত করে এ গান গাওয়া হয়। সাধারনত খাম্বাজ, পিলু প্রভৃতি হালকা ধরনের রাগে গানের সুর বাঁধা হয়। অধিকাংশ টপ্পার গান পাঞ্জাবী।

ঠুংরী — যে সকল গান টপ্পার রাগিনীতে এবং আধা কাওয়ালী ও ঠুংরী তালে গাওয়া হয়, তাকে ঠুংরী বলে। একসময় কেবলমাত্র বাইজীরাই এ গান গাইতো। কোনো অভিজাত সংগীত আসরে এ গানের পরিবেশন নিষিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানে গানের সভায় ঠুংরী গানও বিশেষ সম্মানে সমাদৃত হয়।

ঠুংরী দুই তুক বিশিষ্ট গান। গানের কলেবর সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার বৈচিত্র্য অনেক। সাধারনতঃ ভৈরবী পিলু, কাফী, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগে এ গান গাওয়া হয়। তবে রাগের বিশুদ্ধরাগ প্রকাশ করার চেয়ে ভাব প্রকাশের দিকেই গায়কের বেশী লক্ষ্য থাকে। প্রধানত: যৎ, দীপচন্দী, ত্রিতাল প্রভৃতি তাল এ গান গাওয়া হয়। গানের শেষভাগের লয়কে দ্রুত করার রেওয়াজ চলিত আছে। দক্ষ শিল্পীরা ঠুংরী গানে রাগের মিশ্রন ঘটিয়ে ও সরগম প্রয়োগ করে গানকে চিত্তাকর্ষক করে তোলেন। এক বিশেষ জাতের ঠুংরীকে 'দাদরা' বলা হয়। লক্ষ্ণৌ এবং বারানসীর ঠুংরী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর। একটি রাগের উপর ঠুংরী পরিবেশনকালে বিবাদী স্বরগুলি প্রয়োগ করা হয়। বর্ত্তমানে ঠুংরীতে ছোট ছোট তানেরও প্রচলন দেখা যায়। গানের কথাগুলি ব্যবহার করে শৃংগার রসে প্রকাশ করে বিস্তার করা হয়।

গজল — এই গান মুলত উর্দ্দু ও কার্ফী ভাষায় রচিত। তবে বর্ত্তমানে বাংলাতেও গজল প্রচলিত দেখা যায়। বাংলা গজলে কাজী নজরূল ইসলামের অবদান সর্বজন বিদিত। বাংলা গজল কাহারবা, দাদরা তালেও গাওয়া হয়। কোনে কোনে গজল গম্ভীর ও উচ্চভাব সম্পন্ন হলেও শৃংগার রসই এই গানের প্রধান উপকরণ। স্থায়ী ছাড়া সব গুলিই অন্তরা। প্রতিটি অন্তরার সুর একই প্রকার। শেয়র যুক্ত ও শেয়র ছাড়া দুরকম গজল আছে।

সংগীতের তাত্ত্বিক অংশ —

স্বর :- সহজ কথায় বলা যায়, ২২ টি শ্রুতি হতে যে নির্বাচিত শ্রুতি সমূহ রাগে ব্যবহার করি তাই স্বর। মূলত স্বরই শ্রুতি। কিন্তু যখন কয়েকটি শ্রুতির মধ্যে একটিকে নির্বাচিত করা হয় রাগে ব্যবহারের জন্য তখন তা স্বর। শ্রুতি সংখ্যার উপর স্বরের অধিষ্ঠান অনুসারে স্বর সংখ্যা ৭টি। এই সাতটিকে বলা হয় শুদ্ধ-স্বর। এদের নাম যথাক্রমে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম,

পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। সা, ম, প এর ৪ টি নি ও গ এর ২ টি এবং রে ও ধ এর তিনটি করে শ্রুতি। এই স্বরগুলি শ্রুতিস্থান পরিবর্তন করলে তাকে বলা হয় বিকৃতস্বর। অতএব স্বর দুই প্রকার শুদ্ধ ও বিকৃত।

শুদ্ধ স্বর :- সাতটি স্বর যখন যথাক্রমে প্রথম, পঞ্চম, অষ্টম, দশম, চতুর্দশ, অষ্টাদশ ও একবিংশ শ্রুতিতে বিরাজ করে তখন বলা হয় শুদ্ধস্বর। অর্থাৎ প্রতিটি শুদ্ধস্বর তার প্রথম শ্রুতিতে বিরাজ করে।

বিকৃতস্বর :- সাতটি স্বর যখন উপরিউক্ত শ্রুতিতে বিরাজ না করে স্থান পরিবর্তন করে তখন তাকে বলে বিকৃত স্বর।

সপ্তক :- সা রে গা মা প ধ ও নি ক্রমানুসারে সাতটি স্বরকে একত্রে বলা হয় সপ্তক (সপ্ত + এক)। উচ্চ-নীচ ভেদে সপ্তককে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—মন্দ্র, মধ্য ও তার।

মন্দ্র সপ্তক :- প্রথম সপ্তক অর্থাৎ মধ্য সপ্তকের নীচের সপ্তককে মন্দ্র সপ্তক বা উদারা বলে। এর সাংকেতিক চিহ্ন স্বরের নীচে বিন্দু। যথা—ধ নি ম ইত্যাদি।

মধ্য সপ্তক :- দ্বিতীয় সপ্তককে মধ্য সপ্তক বা মুদারা বলে। এর কোনও সাংকেতিক চিহ্ন নেই। যথা— গ, ম ইত্যাদি।

তার সপ্তক :- তৃতীয় সপ্তককে তার সপ্তক বা তারা বলে। এর সাংকেতিক চিহ্ন স্বরের ওপর বিন্দু। যথা— রে, গ, ম।

আরোহন ও অবরোহন :- নীচ থেকে ক্রমান্বয়ে ওপরে ওঠা ও ওপর থেকে ক্রমান্বয়ে নীচে নামাকে যথাক্রমে আরোহন ও অবরোহন বলে যেমন ইমন রাগের আরোহন সা রে গ ম প ধ নি সং। অবরোহন— সং নি ধ প ম গ রে সা।

শ্রুতি :- নাদের স্থানভেদ অনুযায়ী 'সা' হতে পরবর্তী সপ্তকে 'সা' এর পূর্ব পর্যন্ত অনেক নাদ আছে। কম্পাঙ্ক সংখ্যা এক বৃদ্ধি মানেই অন্য একটি নাদ। আবার পূর্ণ বৃদ্ধি না পেয়ে ভগ্নাংশ বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলেও নাদের পরিবর্তন ঘটে। অতএব অংকের বিচারে একটি সপ্তকে হাজার হাজার নাদ উৎপাদিত হয়। এদের ব্যবধান এত কম যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারেই এদের অস্তিত্ব পাওয়া সম্ভব আমাদের গলা অত সূক্ষ্ম পার্থক্যের নাদ উৎপাদন করতে সক্ষম নয়, কানও অত সূক্ষ্ম পার্থক্যের তফাৎ বুঝতে সক্ষম নয়। তাই প্রাচীন কাল হতে সংগীত পণ্ডিতগণ একটি সপ্তককে ২২টি সমদূরত্বের নাদ স্থানে ভাগ করে প্রতিটিকে শ্রুতি আখ্যা দিয়েছেন।

''শ্রূয়তে ইতি শ্রুতি''। এরা পরস্পরের পার্থক্য সহ মানুষের বোধগম্য হয়। এই ২২টি শ্রুতির নাম—তীব্রা, কুমুদবতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রক্তিকা, রৌদ্রী, ক্রোধী, বজ্রিকা, প্রসারিনী, প্রীতি, মার্জনী, ক্ষিতি, রুদ্রা, সন্দিপিনী, আলাপিনী, মদন্তী, রোহিনী, রম্যা, উগ্রা ও ক্ষোভিনী।

তান :- রাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহের বিভিন্ন প্রকার রচনাকে নানাপ্রকার লয়ে গাওয়াকে তান বলে। তানে যদি গানের কথা ব্যবহৃত হয় তবে তাকে বোলতান বলে।

স্থায়ী :- গানের প্রথম অংশটির নাম স্থায়ী। যে অংশের রাগের রূপ প্রকাশ করে তার স্থায়িত্ব এনে দেয় তাকে স্থায়ী বলে। ইহাতে রাগের বর্ণনা করা হয় মন্দ্র বা মধ্য সপ্তকের দ্বারা।

সঞ্চারী :- স্থায়ী আরোহ ও অবরোহ এই তিন বর্ণের মিশ্রণের নাম সঞ্চারী।

আভোগ :- গানের শেষ অংশের নাম আভোগ। গানের পূর্ণতার জন্য এই ভাগটি ব্যবহার করা হয়।

অলংকার :- নিয়মিত বর্ণ সমূহকে অলংকার বলা হয়। যথা সারেগা, রেগামা, সামা, রেপা, সাপা, রেধা ইত্যাদি।

ঠাট :- রাগ প্রকাশ করবার মত শক্তিসম্পন্ন স্বরসমূহকে মেল বা ঠাট বলে। রাগের কাঠামোকেই আমরা ঠাট বুঝি। সাতটি স্বরকে পরপর সাজালে (কখনও শুদ্ধ, কখনও বিকৃত) আমরা অনেকগুলি স্বরসজ্জা পাই। তাদের মধ্যে যেগুলি রাগ তৈরী করতে সক্ষম তাদের ঠাট বলা হয়।

ঠাট ও রাগের পার্থক্য

ঠাট	রাগ
১. রাগ তৈরী করতে সক্ষম এরূপ স্বরসজ্জা।	১. রস প্রকাশে সমর্থ এরূপ বিশিষ্ঠ স্বর রচনা।
২. নিজস্ব নাম নেই।	২. নিজস্ব নাম আছে।
৩. স্বরগুলি ক্রমানুসারে থাকে।	৩. স্বরগুলি ক্রমানুসারে না-ও থাকতে পারে।
৪. ৭ টি স্বরই বিদ্যমান।	৪. ৫,৬ বা৭ টি স্বর দ্বারা রচিত।
৫. কোনওস্বর বর্জন করা হয় না।	৫. ১ বা ২ টি স্বর বর্জন করা হতে পারে।
৬. শুধু আরোহ আছে।	৬. আরোহ ও অবরোহ দুইই প্রয়োজন, কারণ রাগ বিশেষে আরোহ অবরোহ দুই প্রকার হতে পারে।
৭. শ্রোতার মনে রস সৃষ্টির ক্ষমতা নেই	৭. শ্রোতার মনে রস সৃষ্টির ক্ষমতা আছে।
৮. রঞ্জকতার প্রয়োজন নেই।	৮. রঞ্জকতার প্রয়োজন আছে।
৯. পরিবেশনের সময় নেই।	৯. পরিবেশনের সময় আছে।
১০. বাদী ও সমবাদী নেই।	১০. বাদী ও সমবাদী আছে।
১১. জাতি নেই।	১১. জাতি আছে।

ঠাট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

১। ঠাটে সাতটি স্বরই পরপর থাকবে। যথা— সা রে গ ম প ধ নি।

২। ঠাট যেহেতু পরপর সাতটি স্বরেরই সজ্জা তাই অবরোহনের প্রয়োজন নেই।

৩। ঠাট কণ্ঠে বা বাদ্যে সোজাসুজি প্রয়োগ করা হয়। কোনো রঞ্জকতার প্রয়োগ নেই।

৪। ঠাটের নিজস্ব কোন নাম নেই। পরপর সাতটি স্বরের কোনো কাঠামো হতে যতগুলি রাগ তৈরী হয়, তাদের আশ্রয় রাগের নামকেই ঐ কাঠামো বা ঠাটের নাম হিসাবে ধার্য করা হয়। যেমন সা রে গ ম প ধ নি একটি ঠাট। এই ঠাট হ'তে ভৈরব, জোগীয়া কালিংগড়া, রামকেলি, বিভাস ইত্যাদি রাগের সৃষ্টি। তাই আশ্রয় রাগের নামানুসারে ওই ঠাটের নামকরণ করা হয়েছে 'ভৈরব'।

ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে রাগগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সংকীর্ণ । যেহেতু কোনো না কোনো ঠাট থেকেই সকল রাগের জন্ম সেহেতু রাগ মাত্রকেই বলা হয় 'জন্য রাগ'। ঠাট থেকে রাগের জন্ম বলে ঠাটকে জনক ঠাট বলে। আর একই কারণে যে দশটি ঠাটের কথা বলা হয়েছে সেগুলিকে বলা হয় জনক ঠাট।

জনক ঠাট — ঠাট ৩২টি। কিন্তু সব ঠাট রাগ উৎপাদনে সক্ষম নয়। এদের মধ্যে ১০টি ঠাট রাগ উৎপাদনে সক্ষম। এই ১০টি জনক ঠাট, সা রে গ ম প ধ নি ঠাট হলেও জনক ঠাট নয়, কিন্তু সা রে গ ম প ধ ন (আশাবরী) জনক ঠাট।

রাগ :- পৃথক পৃথক স্বরের সমাবেশে ভাব সৌন্দর্য ও রস লালিত্য প্রয়োগে শ্রুতি মধুর ও দশটি লক্ষণযুক্ত যে স্বরমুর্ত্তি তাকে রাগ বলে। অর্থাৎ সাধারণের ভালো লাগে এরূপভাবে স্বর রচনাকে রাগ বলে।

রাগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

১। ঠাট থেকে রাগের সৃষ্টি।

২। রাগে ৭টি, ৬টি বা ৫টি স্বর থাকতে পারে তবে ৫টির কম স্বর দ্বারা রাগ হয় না।

৩। রাগে আরোহ ও অবরোহ একই প্রকার নাও হতে পারে, তাই আরোহন ও অবরোহন দুইয়েরই প্রয়োজন আছে।

৪। রাগে যেহেতু ৭টির কম স্বরও থাকতে পারে তাই প্রয়োজন মতো কোনো কোনো রাগে ১ বা ২ স্বর বর্জন করা হয়। কিন্তু মধ্যম ও পঞ্চম দুটি স্বরই এক সাথে বর্জন করা হয় না।

৫। রাগে রঞ্জকতা থাকবে অর্থাৎ রাগে রস পরিস্ফুটিত হবে।

৬। রাগের নিজস্ব নাম আছে।

পুর্ব্বাংগ ও উত্তরাংগ রাগ— সপ্তককে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। কোন সপ্তকের 'সা' থেকে উচ্চতর সপ্তকের 'সা' পর্যন্ত্য যে মোট আটটি স্বর তাকে তাকে দুভাগ করলে প্রথম ভাগটিকে অর্থাৎ স র গ ম— এই চারটি স্বরকে পূর্বাঙ্গ এবং দ্বিতীয় ভাগটিকে অর্থাৎ প ধ ন র্স এই চারটি স্বরকে উত্তরাংগ বলা হয়। যে রাগের বাদীস্বর সপ্তকের ও পূর্ব্বাংগে অবস্থিত সেগুলি পরিবেশন করতে হয় সময়ের ও পূর্ব্বাংগে অর্থাৎ বেলা বারোটা থেকে রাত বারোটার মধ্যে। এই রাগগুলিকে বলা হয় পূর্ব্বাংগ রাগ— যেমন ইমন, কেদারা, খাম্বাজ, বৃন্দাবনী সারং ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগের স্বরগমগুলি সপ্তকের উত্তরাংগে অবস্থিত এবং এগুলি পরিবেশন করতে হয় রাত ১২টার পর থেকে পরের দিন সকাল ১২টা পর্যন্ত। এই রাগগুলিকে বলা হয় উত্তরাংগ রাগ। যেমন— ভৈরবী, রামকেলী, বিভাস ইত্যাদি।

বাদী :- পণ্ডিত অহোবল রচিত 'সঙ্গীত পরিজাত'-এ আছে ''.... প্রয়োগে বহুধা যস্য বাদিনং তং স্বরং জগুঃ।। রাজত্বমপি তস্যেতি মুনয়ঃ সঙ্গিরন্তি হি....''। অর্থাৎ রাগের মধ্যে যে স্বরটি সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য প্রয়োগ করা হয় তা বাদীস্বর। সঙ্গীতচার্যগণের নিকট বাদীস্বর রাগের নৃপতিরূপ স্বীকৃত হয়।

এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, একটি দীর্ঘ সময় পরিবেশনকালে নিশ্চয় ঐ রাগের অর্ন্তগত সমস্ত স্বরগুলি গুনিয়া গুনিয়া প্রয়োগ করা সম্ভব নয় যে কোন্ স্বরটি কতবার প্রয়োগ করা হ'ল। আসলে প্রতি রাগে বিশেষ একটি স্বরকে বিভিন্নভাবে প্রাধ্যান্য দেওয়া হয়। যেমন ঐ বিশেষ স্বর থেকে বিস্তার আরম্ভ করা বা শেষ করা। ঐ বিশেষ স্বরে কিছু সময় থাকা ইত্যাদি। ঐ বিশেষ স্বরকে রাগের বাদী স্বর বলে। যেমন ভৈরব রাগে, বাদী স্বর 'ম' অর্থাৎ ভৈরবী রাগ গাইবার বা বাজাবার কালে 'ম' স্বরটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সমবাদী :- বাদী স্বরের পরেই রাগে সমবাদী স্বরের স্থান। বাদীস্বর ছাড়া অন্যান্য স্বরগুলির মধ্যে যে স্বরটির ওপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাকে সমবাদী স্বর বলে। 'সঙ্গীত দর্পণে আছে ''বাদী রাজাস্বরস্তস্য সংবাদী প্যাদমাত্যবৎ'' অর্থাৎ বাদী রাজার ন্যায় এবং সমবাদী মন্ত্রীবৎ। যেমন ভৈরবী রাগে সমবাদী 'সা' অর্থাৎ ঐ রাগে বাদীর 'ম' কে সর্বপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া হয়। বাকী স্বরগুলি সা রে গ প ধ ও নির এদের মধ্যে 'সা' কে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অনুবাদী :- সঙ্গীত পরিজাতের মতানুযায়ী ''ন বাদী ন চ সম্বাদী ন বিবাদ্যপি যঃ স্বরঃ'' যে স্বর রাগে বাদী, সমবাদী বা বিবাদী স্বররূপে গণ্য হয় না তা-ই অনুবাদী। 'ভৃত্য তুল্যানুবাদী'—অনুবাদী স্বর ভৃত্যের ন্যায়। রাগে ইহাদের প্রয়োগ আছে কিন্তু প্রভুত্ব নাই। যেমন ইমন রাগে সা, রে, ম ও ধ।

বিবাদী :- সঙ্গীত পরিজাতে আছে ''স্যাদ্বিবাদী শত্রুবদ্ভবেৎ'' যা রাগকে বিকৃত করে, সেই স্বর বিবাদী বা শত্রু স্বর। যেমন কেদার রাগে র, গ, ধ ও নি স্বরগুলি বিবাদী স্বর। এই স্বরগুলির প্রয়োগে রাগ ভ্রষ্ট হয়।

শত্রুর সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে যেমন কেউ সমাজে নিজের ভালত্বের পরিচয় দেয় কিন্তু শত্রুর সংগে বেশী মেশেন না কোনো ক্ষতির আশঙ্কায়; সেরূপ কখনও কখনও কোন রাগে সৌন্দর্য্য আনার জন্য বিবাদী স্বরগুলির কোন একটিকে ব্যবহার করা হয় তবে তা ক্ষনিকের জন্য। নইলে রাগ ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন কেদারা রাগে কোমল নিখাদের ব্যবহার করা হয়।

রাগের জাতি :- পূর্বেই বলেছি, সব রাগেই যে ৭টি স্বরই ব্যবহার করা হয়, তা নয়। ৭টি, ৬টি বা ৫টি স্বরও ব্যবহৃত হয়। আবার আরোহ ও অবরোহ ভিন্ন প্রকার ও হ'তে পারে। যে রাগে পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত হয় তা ঔড়ব (ঔড় + অব), যে রাগে ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হয় তা ষড়ব (ষড় + অব) এবং যে রাগে সাতটি স্বর ব্যবহৃত হয় তা সম্পূর্ণ জাতি বলে বিবেচিত।

পকড় :- স্বল্পসংখ্যক স্বর সমষ্টি দ্বারা স্বর রচনা যা রাগের রূপ প্রকাশ করতে সক্ষম তাই হোলো পকড়, যেমন ভৈরবী রাগের পকড় .....ম, গ, সা রে সা, ধ নি সা।

''তাল''

শঙ্করের তাণ্ডব নৃত্যের 'ত' কার এবং পার্বতীর লাস্যনৃত্যের 'ল' কার সহযোগে তাল সৃষ্টি। এতো গেল কাল্পনিক ব্যাখ্যা, আসলে তাল কি? গানের সময়ের পরিমাণ হলো তাল। যেমন দিনের সময়ের পরিমাণ হলো ঘন্টা। অর্থাৎ ৭টা থেকে ৮টা যতক্ষন সময় ১১ থেকে ১২ ঠিক ততক্ষন সময়। সেরূপ তাল হোলো গানের সময়ের পরিমাপ। তালকে দুইটি জাতিতে ভাগ করা হয়।

(১) **সমপদী তাল**— যে তালের পদগুলি সমান সমান মাত্রায় বিভক্ত যেমন কাহারবা তাল ৪/৪ মাত্রায় বিভক্ত।

(২) **বিষমপদী তাল** — যে তালের পদগুলিতে সমান সংখ্যক মাত্রা থাকে না যেমন তেওড়া ৩/২/২ মাত্রায় বিভক্ত।

''পদ বা বিভাগ''

ঘন্টাকে যেমন মিনিটে ভাগ করা হয় তেমনি তালের ক্ষেত্রেও ছন্দের দিকে দৃষ্টি রেখে তালকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগকে বলা হয় বিভাগ বা পদ।

মাত্রা— সময়ের ক্ষুদ্রতম একককে যেমন সেকেন্ড বলে তেমনি তালের ক্ষুদ্রতম একককে বলা হয় মাত্রা। অর্থাৎ এক একটি ইট গেঁথে যেমন অট্টালিকা তৈরী হয় তেমনি কয়েকটি মাত্রা দ্বারা গঠিত হয় তাল। বলা যায় তাল কয়েকটি মাত্রার সমষ্টি।

তালের জাতি— যে তালের প্রতিটি বিভাগ বা পদে সম সংখ্যক মাত্রা থাকে, তাকে বলা হয় সমপদী তাল। যেমন দাদরা তালের দুই পদেই সমসংখ্যক তিনটি করিয়া মাত্রা বিদ্যমান।

যে তালের প্রতিটি বিভাগ বা পদ এর মাত্রা সংখ্যা অসমান তাকে বিষমপদী তাল বলে। যেমন তেওড়া, তালের ১ বিভাগে তিন মাত্রা কিন্তু বাকী দুটি পদ দুই মাত্রা সমন্বিত।

লয়—তালের গতিকে লয় বলা হয়। লয় তিন প্রকার।

(১) তালের গতি যখন ধীরে ধীরে চলে, তাকে বলে বিলম্বিত লয়। (বিলম্বিত একতাল)

(২) মাঝারি গতির লয়কে মধ্যলয় বলা হয় (মধ্যলয় ত্রিতাল)

(৩) তালের দ্রুত গতির চলনকে দ্রুতলয় বলে। (দ্রুতলয় দাদরা)

বোল বা ঠেকা— তাল প্রদর্শনের সাহায্যকারী বাদ্য যেমন পাখোয়াজ, তবলা, মৃদংগ, শ্রী খোল ইত্যাদি থেকে উৎপাদিত শব্দকে আমরা যখন ভাষায় প্রকাশ করি তাকে বলে বোল। বোল অর্থে তালের ভাষা বলা যায়। তবলার পরিভাষায় 'ঠেকা' বলা হয়।

সম্ — যে মাত্রা থেকে কোন তাল আরম্ভ হয় তাকে বলে সম '+' অথবা '×' চিহ্ন দ্বারা সম বোঝানো হয়। যেমন ঝাঁপতাল

I^{+} ^{২}ধি না । ^{২}ধি ধি না। ^{০}তি না । ^{৩}ধি ধি না I ধি

তালি ও খালি — তাল বিভাগ দেখাবার সময় দুই হাতের তালুতে আঘাত করে যে শব্দ করা হয় তাকে তালি বা তাল বলে। আর অনাঘাতের দ্বারা যে তাল বোঝানো হয় তাকে ফাঁক বা খালি বলে। কোনো তালের একাধিক তালিকে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। আর ফাঁক বোঝাবার জন্য '০' চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। এইরূপে ঝাঁপতাল ও ত্রিতাল তিনটি তাল ও একটি ফাঁক আছে, দাদরা ও কাহারবায় একটি তাল একটি ফাঁক আছে কিন্তু তেওড়া তালে কোনো ফাঁক নেই।

তালের পরিচয় ও তাল লিখন—

দাদরা - ঠেকাঃ—	১	২	৩	৪	৫	৬	ধা১
	ধা	ধিন	না	না	থুন	না	
	×			০			×

মাত্রা সংখ্যা - ৬, বিভাগ — ২, প্রতিবিভাগে ৩টি মাত্রা, ১টি তালি ও ১টি খালি, ১ম মাত্রায় তালি বা সম এবং ৪র্থ মাত্রায় খালি সমপদী তাল

কাহারবা— ঠেকাঃ-	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	ধা১
	ধা	গে	না	তি	না	ক	ধি	না	
	×				০				×

মাত্রা সংখ্যা - ৮, বিভাগ-২, প্রতিবিভাগে ৪টি মাত্রা, ১টি তালি ও ১টি খালি, ১ম মাত্রায় তালি বা সম্ এবং ৫ম মাত্রায় খালি, সমপদী তাল,

একতাল (ত্রিমাত্রিক)

ঠেকাঃ—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
	ধিন	ধিন	ধা	ধা	থুন	না	কৎ	তা	ধাগে	তেটে	ধিন	ধাধা	ধিন
	×			০			৩			৪			×

মাত্রা সংখ্যা ১২, বিভাগ ৪, প্রতি বিভাগে ৩টি মাত্রা, ৩ টি তালি ১টি খালি, সমপদীতাল

একতাল (দ্বিমাত্রিক)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
ঠেকাঃ—	ধিন্	ধিন্	ধাগে	তেটে	থুন	না	কৎ	তা	ধাগে	তেটে	ধিন	ধাধা	ধিন্
	×		০		২		০		৩		৪		×

মাত্রা সংখ্যা ১২, বিভাগ ৬, প্রতিবিভাগে ২ মাত্রা, ৪টি তালি, ২টি খালি। ইহা সমপদী তাল। ১ম মাত্রায় তালি বা সম , ৫ম মাত্রা ৯ মাত্রা ও ১১ মাত্রায় তালি, ৩য় মাত্রা ও ৭ মাত্রায় খালি বা ফাঁক।

ত্রিতাল ঠেকাঃ—	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
	ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা	না	তিন	তিন	না	তেটে	ধিন	ধিন	ধা	ধা
	×				২				০				৩				×

মাত্রা সংখ্যা ১৬, বিভাগ ৪, প্রতিবিভাগে ৪ মাত্রা, ৩টি তালি ১টি খালি, ইহা সমপদী তাল। ১ মাত্রায় তালি বা সম্ ৫ মাত্রায় ও ১৩ মাত্রায় তালি, ৯ মাত্রায় খালি বা ফাঁক।

ঝাঁপতাল ঠেকাঃ—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	ধি
ধি	না	ধি	ধি	না	তি	না	ধি	ধি	না	
×		২			০		৩			×

মাত্রা সংখ্যা ১০, বিভাগ ঃ বিভাগ ৪, ৩টি তালি ১টি খালি, ১মাত্রায় ১তালি বা সম্। ৩য় মাত্রায় ২ তালি, ৬ষ্ঠ মাত্রায় খালি এবং ৮ম মাত্রায় ৩য় তালি, বিষমপদী তাল

তেওড়া - ঠেকাঃ—

×			২		৩		×
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১
ধা	ধিন	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে	ধা
×			২		৩		×

মাত্রা সংখ্যা ৭, বিভাগ ৩, ৩টি তালি ১মাত্রায় ১তালি। ৪র্থ মাত্রায় ২ তালি, ৬ষ্ঠ মাত্রায় তয় তালি এবং এতে খালি নাই। এটা বিষমপদী তাল।

১.৪.৩ লোকসংগীত (Folk Song)

ভারতীয় লোকসঙ্গীত অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর কারণ হলো ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। উত্তর ভারতের পল্লীগীতিগুলি সরল পল্লীজীবনেরই ভাষ্য। পল্লীবাসীদের সুখ-দুঃখ, কাজকর্ম ও জীবনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি প্রতিফলিত হয় এই গানগুলিতে। আসামের লোক সঙ্গীত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটেছে এই গানে। ওড়িশার লোকসঙ্গীত বলতে ওড়িশার শহর গ্রামের নিরক্ষর অসংস্কৃত জনসাধারণ থেকে কান্ধা, কোল প্রভৃতি আদিবাসীর গানকেই বোঝায়। তেলেগু লোকগীতিতে গোদাবরী মান যথেষ্ট উন্নত। তামিলদের নানা বৈশিষ্ট্য এবং নিসর্গদৃশ্যাবলী এই সব গল্পে ও গানে প্রতিধ্বনিত। লোকসঙ্গীত দৈহিক পরিশ্রমের কষ্টলাঘব করতে সমর্থ্য। গুজরাতী মহিলাদের চালগুড়ো করার সময় 'ওভি' ভঙ্গিমার খেয়াল গীতি, মহারাষ্ট্রের লাঙ্গল দেওয়ার গান, বোম্বাই এর (মুম্বাই) নৌ-সঙ্গীত, মাদ্রাজের গোযান সঙ্গীত, রাজস্থানের পানিহারী গীতি, মালাবারের কূপ-খনন গীতি, যাকে বলা হয় 'পাহাড়ী সঙ্গীত' প্রমাণ করে যে এগুলি মানুষের কাজ করতে সহায়তা করে। জাতীয় জীবনের পূর্ণ গঠন করতে হলে প্রত্যেক নরনারী বালক-বালিকা, নিজস্ব সংস্কৃতির আবহমান ধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, এবং সাংস্কৃতিক মনোভাব ও সংস্কৃতিতে মনোনিবেশ, আচরণ ও কলাচর্চাকে নিজের জীবনে আত্মস্থ করে নিতে পারে, তার ব্যবস্থা করা একান্তই আবশ্যক। এই ধারাটিকে বজায় রাখার একটি অন্যতম কাজ হল - বাংলা তথা দেশের লোকগীতি চর্চা। লোকসংস্কৃতির এক সুসমৃদ্ধ শাখা হল লোকগীতি বা লোকসংগীত।

লোকসংগীতের কতকগুলি প্রধান বিশেষত্ব হলো :-

- প্রথমত, এই সংগীত মৌখিকভাবে রচিত হয়ে মৌখিকভাবেই প্রচার লাভ করে। পূর্বে একে লিখে রাখার প্রয়োজন হত না। কারণ - প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে লোকসংগীতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হত, এবং প্রানশক্তি রক্ষা পেত।
- দ্বিতীয়ত, কোনো দেশে কোনো কালেই লোকগীতি অনুশীলনের কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই।
- তৃতীয়ত, লোকসংগীত মানুষের মনের কষ্ট বা বিশেষ অনুভূতি, প্রাণের আর্তি, বা প্রেরণা, গ্রাম্য কবিদের কণ্ঠে স্বতঃস্ফুর্ত বাণী জুগিয়েছে। তাই লোকসংগীতে কোনো কৃত্রিমতা নেই। গানগুলি মুখে মুখে প্রসার লাভ করে ও কানে শুনে আয়ত্ত করতে হয়।
- চতুর্থত, এই গ্রাম্য সংগীতগুলি সমাজজীবনের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত। সমাজের নীচু স্তরের মানুষের দ্বারাও এই লোকসংগীত গীত হয়।

- পঞ্চমত, বিচিত্র সামাজিক জীবনের জন্য, বিষয়বস্তুর দিক থেকে লোকসংগীত বিশেষ বৈচিত্র্যময়। বিশেষ করে বাংলার লোকসংগীত, বিষয়, ভাব, রস ও সুরের দিক দিয়েও অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

লোকসংগীত কি?

লোকসংগীত বা লোকগীতি সমাজের সৃষ্ট গান। কোনও ব্যক্তির একক সৃষ্টি নয়। অলিখিত লোক পরম্পরায় প্রচারিত ও প্রচলিত গানই লোকগীতি। লোকগীতি এক বিশাল সমুদ্র, বিশেষ ব্যক্তিগণ নদী। তারা পাহাড় থেকে জল বয়ে এনে সমুদ্রকে দিয়েছেন।

লোকসংগীতের প্রকারভেদ ঃ

১। **আঞ্চলিক লোকসংগীত ঃ** পশ্চিমবঙ্গের ভাদুগান, টুসু গান, ঘেটু গান, পূর্ববঙ্গের জারি গান, উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া।

২। **প্রেমসংগীত ঃ** প্রেমসংগীতের বিষয় দুই রকম হয় - ক) রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক, খ) হর-গৌরী বিষয়ক। এ ছাড়াও প্রেমসংগীতের মধ্যে আছে, পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি।

৩। **ব্যবহারিক সংগীত ঃ** সাধারণত বিবাহের গীত, ছাদপেটানোর গান, কুয়ো-পাতকুয়ো বা নলকূপ বা পুকুর খোঁড়ার গান, এই লোকসংগীতগুলি ব্যবহারিক সংগীতের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪। **আনুষ্ঠানিক সংগীত ঃ** এই সংগীত বছরের কোনো নির্দিষ্ট তারিখ বা কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে বা সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গাওয়া হয়। যেমন - শিবের গাজন-সেই উপলক্ষ্যে গান, দোল উৎসবের গান, চড়কের গান, রাসের গান, ধান কাটার গান, নবান্নের গান ইত্যাদি।

৫। **কর্মসংগীত ঃ** প্রত্যক্ষভাবে দৈহিক পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজের সাথে বা কর্মের মধ্যে লিপ্ত থাকার সময়, সমবেতভাবে যে সংগীত গাওয়া হয়, তাকে কর্মসংগীত বলে। যেমন - নৌকা চালানোর সময় সমবেতভাবে যে গান গাওয়া হয়, তাই হল সারি গান। এই গানগুলি কর্মসংগীতের অন্তর্ভুক্ত।

৭। **টুসু গান ঃ** সীমান্ত বাংলা বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, ঝাড়খন্ড, মেদিনীপুর ইত্যাদি অঞ্চলের মেয়েরা এই টুসু পূজা করে এবং আনন্দ-উৎসবে, নাচে গানে মেতে ওঠে। সারা পৌষ মাস ধরে হৈমন্তিক ধান ''আমন'' ধানের দেবী টুসুকে পূজা করে থাকে মেয়েরা। টুসু পূজায় কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। মেয়েরা নিজেরাই এই পূজা করে।

৮। **ভাদু গান ঃ** সীমান্ত বাংলা বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে ভাদু পূজা উপলক্ষ্যে মেয়েদের কণ্ঠে যে গান শোনা যায় তাকেই ভাদু গান বলে। ভাদু গান আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়। সাধারণত এর কথা এবং সুরগুলি প্রাচীনকাল থেকে পরম্পরাগত পাওয়া যায়। ভাদ্র মাসে ভাদু পূজা হয়। ভাদুর মূর্তিকে কুমারী মেয়েরা পূজা করে ও গান করে ভালো বর পাবার আশায়। এটি একটি প্রচলিত রীতি। বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় লোকসংগীতের মধ্যে একটি এই ভাদু গান।

৯। **সারি গান ঃ** সারিবদ্ধ ভাবে বসে একসাথে সমবেত কণ্ঠে যে গান কাজ করতে করতে গাওয়া হয়, তাই সারি গান নামে পরিচিত। ধান কাটার গান বা অন্যান্য গোষ্ঠীর সংগীতগুলি যা গ্রামবাংলায় প্রচলিত তার সবগুলি কর্মসংগীতের মধ্যে পড়ে। এই সংগীতগুলি দলবদ্ধভাবে বা সারিবদ্ধভাবে গাওয়া হয় বলেই এরা সারিগান নামে পরিচিত। তবে পূর্ব বাংলার নৌকা-বাইচ খেলার প্রতিযোগিতায় সারিবদ্ধভাবে বসে নৌকার বৈঠার তালে তালে যে গান গায়, তাই প্রধান সারিগান হিসাবে গণ্য। এ গানে থাকে উদ্দীপনা, নৌকা চালিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা। ভাটিয়ালি মাঝিদের কণ্ঠের একক সংগীত।

১০। **জারি গান ঃ** জারি একধরনের ইসলামীয় ধর্মীয় সংগীত। পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচলিত। তবে এই জারি গান সর্বপ্রথম গ্রামবাংলার সব অঞ্চলেই শোনা যায়। 'জারি' কথার অর্থ হল ক্রন্দন। কারবালা প্রান্তরে শহিদ হাসান হুসেনের বীরত্বের কথা ও সাকিনার বিলাপ ও ক্রন্দনের বর্ণনা সর্বদাই এই জারি গানে বর্ণিত হয়ে থাকে।

১১। **ভাটিয়ালি গান ঃ** পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা, মিথিলা ও আসামে, অনুমান করা হয়, এই ভাটিয়ালি গান সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। পূর্ব বাংলার বা অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা ইত্যাদি অঞ্চলের অন্যতম লোকগীতির নাম হল ভাটিয়ালি। খাল, বিল, নদীনালা অধ্যুষিত মাঝিমাল্লার কণ্ঠের একক সংগীত হল ভাটিয়ালি।

১২। **ভাওয়াইয়া ঃ** উত্তরবাংলার বা উত্তরবঙ্গের রংপুর, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চল থেকে শুরু করে আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চল পর্যন্ত এই গানের বিস্তৃতি। উত্তর বাংলার কোচবিহার অঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায়ের গান হল ভাওয়াইয়া গান।

১৩। **গম্ভীরা ঃ** গাজন গানের মতো গম্ভীরা গানকেও একধনের শিবসংগীত বলা চলে। এই গানের সময় হল চৈত্র মাস। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার প্রধান লোক উৎসব হল গম্ভীরা এই গান সাধারণত, পোলিয়া, রাজবংসী, নাগর, কোচ, প্রভৃতি আদিবাসীদের কণ্ঠে শোনা যায়।

বাংলা গানের জগতে রবীন্দ্রসংগীতের অবদান অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতে উপনিষদ, হিন্দু পুরান, সংস্কৃত কাব্যনাট্য ও বৈষ্ণব এবং বাউল দর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। সুরের দিক থেকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত (হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী উভয়তঃ), বাংলা লোকসংগীত, কীর্তন ও রামপ্রসাদী এবং পাশ্চাত্য ধ্রুপদী ও লোকসংগীতের 'ত্রিবেনীসঙ্গম' ঘটেছে এই রবীন্দ্রসংগীতে। রবীন্দ্রনাথের সকল গান তাঁর 'গীতবিতান' গ্রন্থ সংকলিত। রবীন্দ্রনাথের জনগনমন অধিনায়ক জয়হে ও আমার সোনার বাংলা গানদুটি যথাক্রমে ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। ভারতের জাতীয় স্তোত্র বন্দেমাতরম্ রবীন্দ্রনাথেরই সুরারোপিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিকে 'পূজা', 'স্বদেশ', 'প্রেম', 'প্রকৃতি', 'বিচিত্র', 'আনুষ্ঠানিক' — এই ছয়টি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছিলেন। কবিপ্রয়াণের পর তাঁর অগ্রন্থিত গানগুলি নিয়ে 'গীতিনাট্য', 'নৃত্যনাট্য', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'নাট্যগীতি', 'জাতীয় সঙ্গীত', 'পূজা ও প্রার্থনা', আনুষ্ঠানিক', প্রেম ও প্রকৃতি ইত্যাদি পর্বে বিন্যস্ত হয়। ৬৪ খন্ডে প্রকাশিত স্বরবিতান গ্রন্থে তাঁর সমুদয় গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে।

১.৪.৪ বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সংগীত শিক্ষার গুরুত্ব

শৈশবে সংগীত শিক্ষা শিশুর অধ্যয়নে নানাভাবে সাহায্য করে। সংগীত পরিবেশকে স্নিগ্ধ করে। সংগীতের মূর্ছনা মনকে প্রশান্ত করে, আধ্যাত্মিকভাব বিকাশে সাহায্যে করে। জীবনকে সুন্দর করার অন্যতম প্রধান উপাদান হলো গান। সংগীতের প্রভাবে শিশু ভদ্র, বিনয়ী ও মানবিক গুণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রতিটি জাতি বেঁচে থাকে তাঁর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে। দেশের বা জাতির ভবিষ্যৎ হিসেবে শিশুই এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

বর্তমান যুগ হলো শিশু শিক্ষার যুগ। শৈশবে শোনা সুরুচিপূর্ণ সংগীতের সুর শিশুর কানে গেঁথে যায় — তার শ্রবণশক্তি বাড়ে, আবার সুর, তাল, লয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান হয় এবং অনুভূতির বিকাশ ঘটে। গান শিখলে দেশাত্মবোধ তথা জাতীয়তাবোধ জাগে। শিশুরা ক্রমে মার্জিত রুচিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। কাজের একঘেঁয়েমি দূর হয়। সামাজিক ও পারিবারিক ঐক্য ও ভাবের মেলবন্ধন হয়। কণ্ঠস্বর পরিচ্ছন্ন হয়। ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শব্দভাণ্ডার বাড়ে। উপলব্ধির ক্ষমতা বাড়ে। শৈশবে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ নিতে নিতে নিজের প্রতি আস্থা আসে এবং ক্রমে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য হল — শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনা বিকশিত করা এবং শিশুর মধ্যে সেই জীবনবোধ গড়ে তোলা যা অন্যকেও একই সম্ভাবনায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। সমাজজীবনে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা ও দায়বদ্ধতা একান্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— অপরের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই আমাদের সর্বোত্তম আনন্দ।

আমাদের দেশে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ে আসে। তাদের মধ্যে একই বোধ সঞ্চারিত করা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে সংগীতের জুড়ি নেই—একাজটা সংগীত শিক্ষার মাধ্যমে সহজে হয়। শিশুর মধ্যে যাতে ছোটোবেলা থেকেই আমাদের দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ— বিবিধের মাঝে মহামিলন ও সভ্যতা তথা একতার বোধ গঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে সাথে সংগীত শিক্ষারও সুযোগ শিশুর মধ্যে সেই বোধ জাগ্রত করে। তাদের মধ্যে ছোটোবেলা থেকে নিজের অজ্ঞাতসারেই জন্ম নেয় নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ। পরবর্তীকালে এই বোধই তার মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিস্ফুটন ঘটায়, শিশুকে আরও মানবিক করে তোলে এবং তাকে দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

সবশেষে, আজকের দিনে এই প্রতিযোগিতামূলক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর, আত্মকেন্দ্রিক ভোগ-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার ঝোঁক বেড়েছে। শিশুর প্রতি চাপও তাই বেড়েছে। নষ্ট হচ্ছে তাঁর মানবিক মূল্যবোধ। একে অন্যের কাছ থেকে শেখার কথা ভুলে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে অন্যান্য বিষয়গুলো শিক্ষার সাথে সাথে সংগীত শিক্ষাই একমাত্র পথ যেখানে শিশুর মধ্যে অনায়াসে প্রোথিত হয়ে যায় 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের'— তত্ত্ব, তাই শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে, মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে, শিশুকে পরধর্মমতে ও সংস্কৃতিতে সহিষ্ণু করে তুলতে শৈশবেই সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১.৪.৫ প্রথিত যশা সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্ব ঃ

রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গে পাল রাজত্বের অবসানের পর কর্ণাটক থেকে বহিরাগত হিন্দুরা যখন পালদের পরাজিত করে বঙ্গদেশ নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসেন তখন এরা এদেশকে কলুষমুক্ত করার জন্য কনৌজ এবং কর্ণাটক থেকে দীর্ঘদেহী শ্বেতকায় ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। এদের মধ্যে পাঁচঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাদেরই একটি ধারা থেকে ঠাকুর পরিবারের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ।

প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ পারিপার্শ্বিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের প্রকৃত ধারক ও বাহক। যে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১৮৬১ খ্রিঃ ২৫শে বৈশাখ), কলকাতার জোড়াসাঁকোর সেই ঠাকুর পরিবার কিন্তু কোনদিনই আর পাঁচটা সাধারণ পরিবারের মতো ছিল না। ধনে, মানে, শিক্ষায়, যোগ্যতায় অসাধারণ হয়ে ওঠা এই পরিবারটির প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ছিল নিজস্বতা, যা কিছু ভাল তাকে আয়ত্ত ও আত্মস্থ করার দুর্লভ ক্ষমতা। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও মাতা সারদা দেবীর অষ্টম পুত্র রবীন্দ্রনাথ। মোট নয় ভাই ও ছয় বোন তাঁর আত্মজ। পূর্বপুরুষদের পদবী ছিল 'কুশারী'। আদি নিবাস অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার আলাইপুরের পূর্বদিকে পিঠাভোগে। পূর্বপুরুষ পঞ্চানন কুশারী কালিঘাটের কাছে গোবিন্দপুরে জনবসতি স্থাপন করেন। ঐ অঞ্চলের সকলে নবাগত ব্রাহ্মণকে ঠাকুর বলে সম্বোধন করতে করতে ক্রমে পদবী পরিবর্তিত হয়ে ঠাকুর হয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবন তাঁর বাড়িতে বহু মানুষের হট্টগোলে কাটলেও, তিনি ছিলেন একা। ছোটবেলা থেকেই অনেকের সাথে গড়ে উঠেছেন কিন্তু তাঁর আসল সঙ্গী ছিলেন তিনি নিজেই। তাঁর পরিবারটি ছিল আকারে বৃহৎ — আত্মীয়স্বজন, পুত্র-কন্যা, বধূ-ননদে, কর্মচারী-ভৃত্যে পরিপূর্ণ। বহু গুণীজনের নিত্য আসা-যাওয়া, ক্রমাগত বহু অনুষ্ঠান— নানা সাংস্কৃতিক

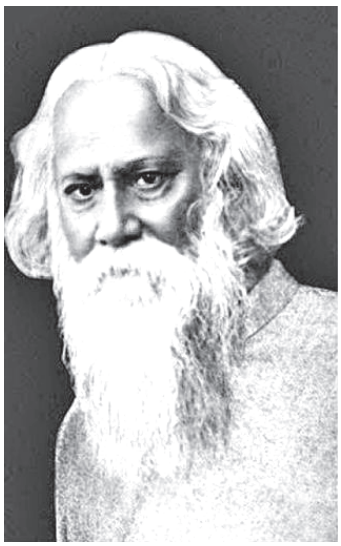

সন্ধ্যা যা কখনও কখনও বা রাত পেরিয়ে ভোর পর্যন্ত চলত — গানের ঢেউ উঠত — বাজনার সুর ছড়িয়ে পড়ত — সুরের মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠত বাড়ির পরিবেশটি। সর্বক্ষণ তাঁর বাড়িতে সাহিত্যের হাওয়া বইত। গানের জোয়ার আসত আর এসবেরই অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে। তাঁর ভাগ্যে মায়ের আদর জোটেনি। ভৃত্যদের পরিচালনায় তাদের কড়া শাসনেই দিন কেটেছে তাঁর। কিন্তু এই অনাদরও যে একধরনের স্বাধীনতা সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। তাই ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী। পরবর্তীকালে এই অন্তর্মুখীনতাই তাঁকে দিয়েছে অনবদ্য সৃষ্টির প্রেরণা। তাঁর সব গানই যে আমাদের প্রত্যেকের একেবারে নিজের গান মনে হয় তার কারণই হল এই যে তাঁর ভেতরের মানুষটার সঙ্গে আমাদের ভেতরের মানুষ কখন যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। কাজেই, ঠাকুর বাড়ির এই পরিবেশের মধ্যে বড়ো হওয়াটা রবীন্দ্রনাথের জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ এবং পরবর্তীকালের মহীরূহের বীজটি রোপিত হয় এখান থেকেই। পড়াশুনা বালক রবির ভাল লাগত না। স্কুলে যেতেন বটে তবে পড়ায় মন দিতেন না। কড়া নিয়মে বাঁধা ছিল শৈশব। ভোরবেলা কুস্তি লড়তে হোত ওস্তাদের কাছে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র শেখাত শারীর বিদ্যা। তাছাড়া, পাটিগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত-এর সাথে বাংলা সাহিত্য— ইংরেজী সাহিত্য ইত্যাদির মাঝেই থাকত রবীন্দ্রনাথের শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা।

বাড়ীর অন্যান্য সভ্যদের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন একাধিক গুণীজনের কাছে। তার প্রথম সঙ্গীত গুরু হলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার তৎকালীন প্রখ্যাত গুণী 'বিষ্ণু চক্রবর্তী'। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন তৎকালে বাংলার এক বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া। এরপর তিনি শ্রীকণ্ঠ সিংহের কাছেও শিক্ষালাভ করেন। ইনি একজন সঙ্গীত রসিক ছিলেন। গুরুদেবের কথায় ''তিনি তো গান শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না, স্ফূর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বলজ্বল করত, গান ধরতেন— ম্যয় ছোড়োঁ ব্রজকি বাঁসরী'— এই শ্রীকণ্ঠবাবুর হিন্দী গান ভেঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীত লিখেছেন ''অন্তরতর অন্তরতর তিনি যে, ভুলোনারে তায়''। তিনি এমনই সঙ্গীত প্রেমিক ছিলেন করুণাময়ের শ্রী চরণে চির আশ্রয় নেবার কালেও গেয়ে ওঠেন ''করুণা তত করুণাময়''। এরপর কবিগুরু স্মরণ করেছেন এক অজানা গায়ককে— ''ভোরবেলা মশারী থেকে টেনে বের করে তার গান শুনতেন'' এই অজানা গাইয়ের নিকট ও কবিগুরু বহু গানের তালিম নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথকে যিনি ওস্তাদী রীতিতে গান শেখাতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন তখনকার দিনে সর্বভারতীয় স্তরে বিখ্যাত বাঙালী ধ্রুপদীয়া 'যদুভট্ট'। কবি মনেপ্রাণে ছিলেন যদুভট্টের ভীষণ ভক্ত। তাই তার কাছে নিয়মিত ভাবে গান না শিখলেও তাঁর দ্বারা কবি ভীষণভাবে প্রভাবিত হন এবং যদুভট্টের রচিত অনেক গানের অনুকরণে অনেক গানও রচনা করেন। উল্লেখিত সঙ্গীতজ্ঞগণ ছাড়াও অনিয়মিত শিক্ষা কবি অনেকের কাছেই পেয়েছেন। তবে সঙ্গীত শিক্ষক বলতে যা বোঝায় তেমনভাবে আমরা দেখি কবির শেষ শিক্ষক রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিশ্রকে। তাঁর গানগুলিকে আমরা ছয়টি পর্যায়ভুক্ত করি— পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক।

স্বদেশি গানে যেমন স্বদেশের স্তুতি ও গরিমা পাই তেমনিই স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করার স্বপ্নও দেখতে পাই। প্রেম পর্যায়ে বিরহ ও মিলন উভয়েই উপস্থিত। কবিগুরুর রচনায় প্রেম যেন পূজায় উন্নীত, প্রকৃতি পর্যায়ে প্রকৃতির বর্ণনা, ঋতুবৈচিত্র্য নিয়ে গান, তাঁর অনেক গানই বিষয়ের বিচারে কোনটির মধ্যেই স্থান পায় না, কিন্তু লিরিক কবিতা হিসাবে এই গানগুলি সম্পদ। এগুলিকে বিচিত্র পর্যায়ে ধরা হয়েছে। এছাড়াও আছে আনুষ্ঠানিক গান, আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে আছে খেলার গান, চলার গান, পথের গান, জন্মদিনের গান, বিবাহের গান, মৃত্যু শোকের শান্তির গান, চাষ করার গান, ধান কাটার গান,

গৃহ প্রবেশের গান, হাসি ঠাট্টার গান, তৃষ্ণার জলের গান, সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মানুষের প্রতি সমবেদনার গান, শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন উৎসবের প্রয়োজন অনুযায়ী গান।

বাঙালী জীবনে রবীন্দ্রনাথের গান নিত্যসঙ্গী। তিনি এখন ভীষণভাবে প্রাত্যহিক। 'সুখে-দুখে, শয়নে-জাগরণে, শান্তিতে-সংগ্রামে, সম্পদে-বিপদে, বিরহ-মিলনে, নিঃসঙ্গতায় ও পূর্ণতায় বিচিত্র বলয় উদ্ভাসে' তিনি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। তিনি গীতাঞ্জলি লিখে নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে। তখন এমন এক বিশ্বের জন্ম হয়েছে যেখানে পারস্পরিক হিংসা আর দ্বেষই হয়ে উঠেছে সমাজের মূল চালিকাশক্তি। অহং-এর দর্প, আত্মাভিমান হয়ে উঠেছে প্রবল থেকে প্রবলতর। সেসময় তাঁর সেই অহংশূন্য আত্মনিবেদনের বাণী শুনল সমগ্র বিশ্ব—

''আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে''।।

তাই তো উন্মাদ আত্মকেন্দ্রিকতার এই সময়ে তিনিই হয়ে ওঠেন মনের শান্তি, প্রাণের আরাম। মূর্ত হয়ে ওঠে সেই সত্য যা শাশ্বত, যে সত্য মানুষকে মানবে পরিণত হওয়ার আশ্বাস জানায়, মাটির এই পৃথিবীটাকে আরো সুন্দর করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখায়।

১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট বাংলার ১৩৪৮ সালের ২২ শে শ্রাবণ এই মহাপ্রাণের মহাপ্রয়ান ঘটে।

রজনীকান্ত

বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত একটি গ্রাম, নাম ভাঙাবাড়ী। রজনীকান্তের জন্ম এই গ্রামে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুলাই (বাংলা ১২৭২ সালের ১২ই শ্রাবন)। তাঁর পিতা ছিলেন গুরুপ্রসাদ সেন ঢাকার মুন্সেক। গুরুপ্রসাদ সংস্কৃত, ফরাসী, ও ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন মনমোহিনী দেবী—অশেষ গুনবতী, ধার্মিক ও নিষ্ঠাবতী। রজনীকান্তের নিজের জীবনে পিতামাতার বহু গুন প্রতিফলিত হয়েছিল।

ছোটো বেলায় রজনীকান্ত ছিলেন অতি চঞ্চল এবং জেদী। পরবর্তীকালে বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। পরিপূর্ণ যুবক বয়সে দেখা গেল সংগীত রচনায় প্রতিভা, সংগীত গায়নে ও সুর রচনায় কুশলতা, সর্বোপরি সংগীত মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কিংবা কাজি নজরুল ইসলামের মতো বহুমুখী সাংস্কৃতিক প্রতিভায় ভাস্বর না হলেও কান্ত কবি রজনীকান্তের নাম একই সাথে উচ্চারিত হয়। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি ও সুরকার। সহজসরল ভাষায় রচিত হওয়ায় তাঁর গান অনায়াসে সর্বস্তরের মানুষের হৃদয় স্পর্শ করত। সুরারোপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাগরাগিণীর সাথে সাথে কীর্ত্তন ও বাউল গানের প্রভাব লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রযুগের কবি হয়েও তিনি স্বকীয়তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর গানে এক অদ্ভুত সহজ সরল মাধুর্য আছে যা অতি সহজে আমাদের হৃদয়কে ভক্তিরসে আপ্লুত করে। শুধু ভক্তিরস নয় — দেশাত্মবোধেও সমান জাগ্রত মনের অধিকারী রজনীকান্তের- ''মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'' লোকের মুখে মুখে ফিরত। অপ্রয়োজনীয় ওস্তাদিপনা এবং অহেতুক কলাকৌশল-অলংকার বর্জিত গানগুলির সহজ-সরলতা ও তার ছন্দোময়-সাংগীতিক সুরের মায়াজালে তাই আজও আমরা

অবগাহন করি। তৃপ্ত হই। ১৮৫৬ খ্রিঃ ২৬ জুলাই পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙাবাড়ি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ছিলেন প্রখ্যাত কণ্ঠসংগীত শিল্পী আর পেশায় ছিলেন সাবজজ। মাতা পিতার কাছেই তাঁর সংগীতের তালিম শুরু হয়। রাজশাহি কলেজে F.A পাশ করে রজনীকান্ত কোলকাতায় আসেন এবং (বি.এ., এল.এল.বি.) ওকালতি পাশ করে রাজশাহিতে ফিরে যান ও ওকালতি শুরু করেন। একইসাথে চলতে থাকে কাব্য রচনা ও সংগীতসাধনা। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গানগুলি হলো—

(১) 'আমি অকৃতি অধম..... বলেও তো' (২) পূর্ণ জ্যোতি তুমি

(৩) কেন বঞ্চিত হব চরণে (৪) তুমি নির্মল করো

রাজশাহির 'উৎসব' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তাঁর গান প্রকাশিত হতে থাকল। ক্রমে— 'বাণী', 'কল্যাণী', 'অমৃত', 'আনন্দময়ী', 'অভয়া' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। চারিদিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে তাঁর গান। তিনি বিশিষ্ট কবি ও সুরকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর রচিত ''তব চরণ নিম্নে... উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা''; প্রিয় পুত্রের বিয়োগের পর ''তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ''; আবার বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ও বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক দিয়ে লেখা ''আমরা নেহাত গরিব, আমরা নেহাত ছোটো তবু আজি সাতকোটি ভাই জেগে ওঠো'', ''মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'' প্রভৃতি গানগুলিতে একদিকে যেমন গানের কথার সাথে অদ্ভুতভাবে সুরের মিশ্রণ ঘটেছে, তেমনি ওই গানগুলির সহজিয়া সুর ও তাঁর আবিলতা আজও আমাদের প্রাণ-মনকে আপ্লুত করে তোলে। রজনীকান্ত একজন বিশিষ্ট কবি, একজন বিশিষ্ট সংগীতকার। স্বকীতায় পরিপূর্ণ-নিরহংকার, আধ্যাত্মবোধ ও ঐকান্তিক আবেগের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর গানের কথায় ও সুরে। নিজে সুগায়ক ছিলেন। প্রাণ-মন দিয়ে গান করতেন আর তাই সেইসব গান তখনকার যুবসমাজের মুখে মুখে ফিরত।

১৮৮৩ সালে বিদূষী মহিলা হিরন্ময়ী দেবীর সাথে তিনি বিবাহসূত্রে বাঁধা পড়েন। হিরন্ময়ী দেবীর সাথে তিনি তাঁর কবিতা, গান নিয়ে আলোচনা করতেন এবং কখনও কখনও তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু কী হবে সেটা নিয়েও পরামর্শ করতেন। রজনীকান্তের চার ছেলে— শচীন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, ভূপেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র এবং দুই কন্যা— শতদলবাসিনী ও শান্তিবালা ছিল। ভূপেন্দ্র অত্যন্ত অল্প বয়সে মারা যান। নিদারুণ পুত্রশোকে ব্যথিত হৃদয়ে আধ্যাত্মবোধ তবু জাগ্রত ছিল। লিখলেন—

''তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দুনয়নে তোমারি শোক-বারি
তোমারি ব্যাকুলতা তোমারি হা-হা-রব।''

তিনি রসিক ব্যক্তিও ছিলেন এবং সেক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর গলায় ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে অমৃতলোকের পথে যাত্রা করেন। যদিও দুরারোগ্য ব্যাধিও তাঁর কাব্য ও সংগীত চর্চায় ছেদ টানতে পারেনি। এই অবস্থায় তিনি লিখেছিলেন—

''তুমি সকল রকমে কাঙাল করেছ
গর্ব করিতে দূর,
তাই যশ-অর্থ-মান-স্বাস্থ্য
সকলি করেছ দূর।''

কাজী নজরূল ইসলাম

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ শে মে পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান জেলার অর্ন্তগত চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী নজরূল ইসলাম দরিদ্র পরিবারের সন্তান হলেও তিনি অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বকালে বিচারালয়ের কাজীর পদ পেয়ে পাটনার হাজীপুর থেকে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে আসেন নজরূল। কবির পিতা ফকীর আহমেদ ও মাতা জাহেদা খাতুনের দ্বিতীয় পুত্র, শিশুকালে তাকে ''দুখু মিঞা'' বলে ডাকা হোত। কেউ কেউ আবার তারা খ্যাপা ও 'নজর আলি' নামেও ডাকতেন। কবির জন্মদিন নিয়ে মতান্তর আছে, প্রখ্যাত জ্যোতিষি কে, আর, ব্যানার্জী মতে ১১ই বৈশাখ ১৩০৬ সাল। তবে ১১ই জৈষ্ঠ্য, ১৩০৬ সাল সরকারী ভাবে সিদ্ধ ও সর্বজন গ্রাহ্য। কবি মাত্র আট বৎসর বয়সে ছাত্রাবস্থায় পিতৃহীন হন। পিতৃহীন কবি দশ বৎসর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেই অর্থাভাবের জন্য জীবন সংগ্রাম শুরু করেন। ঐ বয়সেই তিনি শিক্ষকতা, মাজার-শরীকের খিদমগিরী, মসজিদের ইমারতি ও গ্রামে মোল্লাগিরি করে উপার্জন শুরু করেন।

সহকর্মী মৌলবী কাজী ফজলে আহম্মদের নিকট তিনি আরবী ও কারগী ভাষা শিক্ষা করেন, পরে সুপণ্ডিত কাজী ফজলে করিমের নিকট আরও জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ইসলামী গান ও বাংলা গজলে আরবী ফারসী উর্দূ ভাষার প্রয়োগে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। এর মূল উৎস হোল শিশুকালের জীবন ধারা।

অর্থের প্রয়োজনে তাকে কিশোর জীবনেই মাত্র বার বৎসর বয়সে লেটোর দলে যোগ দিতে হয়। স্বীয় প্রতিভার অতি অল্প দিনেই তিনি দলের ওস্তাদের পদ অলংকৃত করেন, লেটো দলের প্রয়োজনে গান লেখার তাগিদে তিনি ঐতিহাসিক ও হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যান চর্চা করেন। 'দাতা কর্ণ', 'মেঘনাদ বধ', 'শকুনি বর্ণ', 'কবি কালিদাস', 'রাজপুত্র', 'আকবর বাদশা' প্রভৃতি পালা ঐ সময়ে লেখেন। হিন্দু শাক্ত ও বৈষ্ণব কবি হিসেবে তার সাফল্যের বীজ ঐ সময়ে অঙ্কুরিত হয়। শুধু তাই নয় লেটো দলের প্রয়োজনে গান রচনা ও সুর সংযোজনা করার ফলে জীবনে তিনি অনুরোধ মাত্র গান রচনা করে অনায়াসে সুর প্রয়োগ করতে পারতেন।

কবি ছিলেন চঞ্চল স্বভাবের, কখনও কোন কাজে বেশিদিন তিনি টিকে থাকতে পারেন নি। তাই ওস্তাদের সম্মানীয় পদে উন্নীত হয়েও তিনি লেটো দলে ইস্তফা দেন। আবার পড়াশুনা আরম্ভ করেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে তিনি কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিককে শিক্ষকরূপে পান। কিন্তু তার ভবঘুরে মন ও আর্থিক স্বল্পতার কারণে আবার পড়াশুনা ছেড়ে যোগ দিলেন বাসুদেবের শখের কবি গানের দলে। শুরু হল গান রচনা , সুরারোপ করা ও ঢোলক বাজিয়ে গান গেয়ে আসর মাৎ করা। শুরু হয় পরবর্তীকালে সুরকার ও গীতিকার কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে ওঠার সিড়ির প্রথম ধাপ।

আবার জীবন নদীর তরী পরিবর্তন। তার কবিগানে মুগ্ধ হয়ে এক বাঙালী খ্রীষ্টান তাকে বাবুর্চির কাজ দেন। চাকুরীটাও সামান্য কিছুদিনের মধ্যে ছেড়ে দেন। আসানসোলে চলে আসেন মাসিক এক টাকা ও আহারের বিনিময়ে চায়ের দোকানে কাজ নেন, রাতে একটি তিনতলা পাকাবাড়ীর সিঁড়ির নীচে ঘুমোতেন। এবারে কবি ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তিহন কিন্তু কয়েকমাস পর বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি আবার চলে যান।

তিনি অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন শিয়ারশোল রাগ হাইস্কুলে। মেধাবী ছাত্র হিসাবে মাসিক সাতটাকা বৃত্তি পান। এখানে কবি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে বন্ধু হিসেবে পান। কবি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ফারসী নেন। শিক্ষক ছিলেন হালিম নুরুন্নবী।

এছাড়া এই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক সতীশ চন্দ্র কাঞ্জিলাল উচ্চাংঙ্গ সংগীত চর্চা করেন। তিনি কবির প্রতিভার পরিচয় পেয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান এবং উচ্চাংঙ্গ সংগীতের তালিম দেন। সুরকার নজরুল ইসলামের বহুমুখী সংগীত প্রতিভার একটি বিশেষ দিক রাগাশ্রিত সুরের উৎস হলেন কাঞ্জিলাল মহাশয়। প্রিটেস্ট পরীক্ষা শুরু হল। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তৃতীয় বৎসর। দেওয়ালে পোষ্টার দেখে কবি সেনাদলে নাম লেখালেন। পরীক্ষা আর দেওয়া হল না। তিনমাস ট্রেনিং শেষ করে ৪৯ নং বাঙালী পল্টনের হেড কোয়ার্টার করাচীতে যোগ দেন, সামান্য সময়ের মধ্যেই 'ব্যাটেলিয়ন - কোয়ার্টার মাস্টার' হাবিলদারের পদ পান।

দরিদ্র পরিবারের পিতৃহীন শিশুটি অস্থিরভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে জীবন কাটিয়ে শৈশব ছাড়িয়ে এসে ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে নিজেকে অংশীদার করেন। তার অস্থির জীবন ধারার জন্য আমরা হয়ত আরও ভাল এক গীতিকার ও সুরকারকে পাওয়া থেকে বঞ্চিত হলাম। হয়ত বা তাঁর ভবঘুরে জীবনের জন্যই এক বহুমুখী গীতিকার ও সুরকার পেলাম। কোনটা সত্য জানিনা, হয়ত দুইই সত্য। তবে এটাতো অবশ্যই সত্য যে বাংলা গানের বর্তমান যুগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই আর যে কজনের ভূমিকা চিরস্বরণীয় কাজী নজরুল ইসলাম তাদের অন্যতম। এটা সত্য যে রবীন্দ্র যুগেও যিনি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ছিলেন তিনি কাজী নজরুল ইসলাম।

কবিগুরু গানে বিশ্বসংগীতের যে আমন্ত্রণ আমরা দেখি তার কিছু কিছু অনিমন্ত্রিতদের আমন্ত্রণ (আরবী সুর, ফারসীসুর, ইজিপ্‌সিয়ণ সুর ইত্যাদি) জানিয়ে তিনি বাংলা গানের ভান্ডার সম্পূর্ণ করে গেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি. এল. রায়) ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান। তিনি একজন কবি তথা নাট্যকার ও গায়কও ছিলেন। খুব ছোটবেলা থেকেই সাংগীতিক পরিমণ্ডলে তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। অগ্রজ রাজেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায় সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। কাজেই, পারিবারিক পরিবেশেই বিদ্যানুরাগ ও শিল্প সংস্কৃতির আবহ ছিল। এই পরিবেশের প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনেও পড়ে এবং তিনি ক্রমে গায়ক - গীতিকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন সভা-সমিতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য স্বরচিত গান গাইতেন। সুকণ্ঠের অধিকারী দ্বিজেন্দ্রলাল সেই গান গেয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতেন। তাঁরা বিমোহিত হয়ে যেতেন। ছাত্র হিসেবেও তিনি মেধাবী ছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১৮৭৮ খ্রীঃ বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ করেন এবং হুগলি কলেজ থেকে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ইংরাজীতে এম.এ পাশ করেন এবং সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে যান। তিন বছর সেখানে থাকাকালীন পাশ্চাত্য সংগীতের সংস্পর্শে আসেন ও অভিনয় এবং রঙ্গালয়ের কলাকৌশল সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পরবর্তী জীবনে যা ব্যবহৃত হয়েছিলো। দেশে ফিরে তৎকালীন সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের কোপে পড়েন ও নানারকম সামাজিক উৎপীড়নের শিকার হন। তাঁর এই সময়ের মানসিক অবস্থা — এবং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার এই কালোদিকগুলির উপর অভিমান, ক্ষোভ, দুঃখ থেকে উৎসারিত লেখাগুলি সংগৃহিত হয়েছিল তাঁর রচিত 'একঘরে' পুস্তিকায়। ১৮৮৬ খ্রীঃ তিনি ডেপুটি ম্যাজেস্ট্রেট হন। ১৮৮৭ খ্রীঃ প্রখ্যাত চিকিৎসক (হোমিওপ্যাথী), প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা মুরবালা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর পুত্র দিলীপ কুমার

রায় তাঁরই অনুসারী পারিবারিক ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ডি.এল.রায় নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর স্বদেশী সংগীত, হাসির গান এবং নাটকগুলির জন্য প্রভূত খ্যাতি-অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো — 'Lyrics of India', 'Groups of Bengal', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'মেবারপতন', 'বিরহ', 'পাষাণী', 'তারাবাঈ', 'রানা প্রতাপ', 'পরপারে', 'নুরজাহান', 'পুর্নজন্ম', 'হাসির গান', 'আষাঢ়ে', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'আর্যগাথা' (ছটঘাঙ) প্রভৃতি। তাঁর লেখা স্বদেশ গান বাংলা গানের অমূল্য সম্পদ। আজও সেইসব গান বাঙালীর হৃদয়কে আবেগ-মথিত করে তোলে।

তিন বছর পাশ্চাত্যে থাকাকালীন তাঁর পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে নিবিড় যোগযোগ ঘটেছিল, তারই প্রতিফলন ঘটে তাঁর রচিত এই সব স্বদেশী গানগুলির সুরারোপনে। তিনি রাগসংগীত, দেশীয় ও পাশ্চাত্য সংগীতের অভূতপূর্ব মিশ্রন ঘটান ও তার সার্থক প্রয়োগ করেন। ফলে তাঁর এই গানগুলি তৎকালীন সমাজকে আপ্লুত করে তোলে এবং যা তৎকালীন বাংলা গানে — রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে অভূতপূর্ব এক গতির সঞ্চার করে। তৎকালীন বাংলার আকাশে-বাতাসে ধনিত তাঁর স্বদেশী সংগীতগুলি আজও সমান প্রাসঙ্গিক। উদাহরণ স্বরূপ — ধনধান্য পুষ্প ভরা, যেদিন সুনীল জলধি হইতে..., বঙ্গ আমার জননী আমার — আজও সমধিক শ্রুত। তাঁর সমস্ত প্রকাশিত গানের সংকলন একসঙ্গে 'দ্বিজেন্দ্রলাল সংগীত সমগ্র' নামে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা কীর্তনের প্রতিও তাঁর সহজাত আকর্ষণ ছিলো। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত — 'আপদ বিদায়' প্যারডিতে - রবীন্দ্রনাথকে আক্রমন করা হয়েছে বলে একটি প্রচার হয় — যার পরিনামে দীর্ঘদিনের বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এ ঘটনায় তিনি খুব ব্যথিত হয়েছিলেন।

তাঁর চরিত্রের সরলতা, তাঁর মানসিক ঔদার্য্য, বন্ধুবৎসলতা, অভিনয় দক্ষতা, লোকরঞ্জন প্রভৃতি — শিশু প্রীতি — সন্তান স্নেহ মমতা, তাঁর প্রতিদিনের জীবনচর্চায় প্রতিফলিত হয় এবং এর প্রভাব তার সমগ্র সাহিত্য কীর্তি সংগীত চেতনাতে মূর্ত হয়ে ওঠে। বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রলাল যে সময়ে বাংলা সংগীতের জগতে এসেছিলেন সে সময়ে সংগীতের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়েছে। ফলে চিরাচরিত রীতিনীতি ঝেড়ে ফেলা সহজ ছিল না। তা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালকে সনাতন-পন্থীদের বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি দমেন নি। নিষ্ঠার সঙ্গে দেশীয় সংগীতে দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতেও তালিম নেন — এবং পরবর্তীতে তাঁর গানে দু'য়ের অভুতপূর্ব সংমিশ্রন করে সার্থক প্রয়োগ ঘটান।

অদম্য উৎসাহ ও পরিকল্পনা নিয়ে তিনি মাসিক পত্রিকা 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের পরিকল্পনা করেন যা বাস্তবায়িত হবার পূর্বেই ১৯১৩ খ্রীঃ ১৭মে তিনি পরলোকগত হন — রেখে যান তাঁর অনন্য সাধারণ রচনা সমূহ — সংগীত-নাটক ইত্যাদি। সফল ও সুযোগ্য উত্তরাধিকার হিসেবে যা পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র দিলীপ কুমার রায় স্বরলিপিবদ্ধ করেন ও স্বকণ্ঠে গানগুলি রেকর্ড করেন। ফলে গানগুলি আজও আপামর জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় হয়ে আছে।

অতুলপ্রসাদ সেন

অতুল প্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭১ খ্রীঃ ২৬শে অক্টোবর ঢাকা শহরে। পিতা রামপ্রসাদ সেন ও মাতা হেমন্ত শশী দেবী। যৌবনেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী হন। রামপ্রসাদ সেনের আদি নিবাস বাংলাদেশের ফরিদপুর পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণ বিক্রমপুরের নগর গ্রামে থাকলেও ঢাকা শহরে চিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠা পান। কিশোর বয়সেই অতুলপ্রসাদ সেনের পিতৃবিয়োগ ঘটে ফলে মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের কাছে থেকে প্রতিপালিত হন। তাঁর সমগ্র পাঠ্যজীবন তিনি মাতামহের কাছেই অতিবাহিত করেন ফলে, মাতামহের কাছেই তাঁর সংগীত জীবনের হাতে খড়ি যা পরবর্তীতে মহীরুহের আকারে ধারন করেছিল, কালীনারায়ণ গুপ্ত নিজে ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী, গায়ক ও ভক্তি সংগীত রচয়িতা।

১৮৯০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অতুলপ্রসাদ কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন ও পরে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে ওকালতি শুরু করেন। কলকাতা ও রংপুরে কিছুদিন কাটানোর পর তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে বসবাস শুরু করেন। সেখানে আপামর-জনসাধারণের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন। মহামতী গোখেলের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে জনসেবায় আত্মনিয়োগের জন্য রাজনীতির সাথেও যুক্ত হয়েছিলেন, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌ শহরের একটি রাজপথ ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল তাঁর নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁর একটি মর্মর মূর্তিও স্থাপিত হয়েছিল। প্রবাসী বাঙালীদের মাঝে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। সংগীতজ্ঞ, সুরকার ও সুকণ্ঠের অধিকারী একজন শিল্পী হিসাবে।

পেশাগতভাবে তিনি স্বমহিমায় দীপ্তমান ছিলেন। লক্ষ্ণৌতে তিনি ওকালতি ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি অধিক বার অ্যাসোসিয়েশন ও বার কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ছিলেন তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সম্মেলনের মুখপত্র 'উত্তরার' সম্পাদক ছিলেন এবং কানপুর ও গোরখপুর অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। নিত্য কাজের ফাঁকে পাওয়া অবসরগুলি অতুল প্রসাদ সংগীত সৃষ্টির কাজে লাগাতেন। তিনি গানও শেখাতেন। দিলীপ কুমার রায়, কনক বিশ্বাস, সাহানা দেবী, রেনুকা সেনগুপ্ত, মঞ্জুগুপ্ত প্রমুখ শিল্পীরা তাঁর কাছে গান শিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ছিল আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁর রচিত — 'বলো বলো সবে' — 'উঠগো ভারত লক্ষ্মী' 'হও ধরমেতে ধীর' — আজও বাংলার ঘরে ঘরে গীত হয়।

মৃত্যু : ১৯৩৪ সালের ২৬ শে আগস্ট ৬৩ বছর বয়সে এই মহান ব্যাক্তিত্বের জীবন প্রদীপ নিভে যায়।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ন ভাতখণ্ডে

হিন্দুস্থানী সংগীতের জনক পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ন ভাতখণ্ডে ইং ১৮৬০ সালের ১০ই আগষ্ট জন্মাষ্টমীর দিন বম্বের বালকেশ্বর গ্রামে এক অভিজাত ব্রাক্ষণ পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর প্রথম সংগীতগুরু তার মা। মায়ের কাছে তিনি বাল্যকালে ভজন শেখেন। শিশু থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষন বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি ছিলেন শ্রুতিধর, যে কোন গান একবার মাত্র শুনেই তিনি গাইতে পারতেন। তাঁর এই ক্ষমতা দেখে মা বাবা তাঁর ভবিষ্যত সম্পর্কে খুবই আশাবাদী ছিলেন।

তিনি খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাই তাঁর বিদ্যাশিক্ষা ও সঙ্গীতশিক্ষা সমানভাবে চলতে থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীতে প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিদ্যালয়ের গন্ডী পেরিয়ে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন তেমনি অন্যদিকে কাশীর বিখ্যাত সেতারী পান্নালাল বাজপেয়ারীর সুযোগ্য শিষ্য বল্লভদাসের কাছে সেতার শিক্ষা আরম্ভ করেন। সাথে সাথে তিনি প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আইনশাস্ত্রে এল.এল.বি পাশ করে তিনি করাচীতে (বর্তমানে পাকিস্তানের অর্ন্তগত) যান। খুব অল্পদিনের মধ্যে আবার বম্বেতে ফিরে আসেন এবং আইনজীবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এদিকে সঙ্গীতচর্চা চলতে থাকে। তিনি তৎকালীন 'গায়ক উত্তেজকমন্ডলী' নামে এক সঙ্গীত

সংস্থার সভ্য হন। ফলে বহু স্বনামধন্য শিল্পীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পান। সঙ্গীতের তার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনে গুণীসমাজ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু তাঁর সঙ্গীতপিপাসা তাঁকে স্থির থাকতে দিল না, তিনি দক্ষিণ ভারত যাত্রা করলেন। মাদ্রাজ, মহীশূর, তাঞ্জোর, ত্রিবাঙ্কুর, প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত শিল্পীদের সাথে মিলিত হন। তিনি বিশেষভাবে কর্ণাটকী পদ্ধতির সাথে পরিচিত হন এবং নানান দক্ষিণীসঙ্গীত শাস্ত্র পাঠ করেন। পণ্ডিত বেঙ্কটমূখীর ৭২ টি মেলের সাথে পরিচিত হয়ে তিনি নতুন আলোর সন্ধান পান।

৭২ টি মেলের অনুকরণে তিনি হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ১০টি ঠাটের প্রচলন করেন। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এ এক নতুন যুগের সূচনা। তাই তাকে আমরা বলি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জনক। এরপর তিনি উত্তর ভারত ও পূর্বভারত পরিভ্রমণে বাহির হন। দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, মথুরা, বেনারস, গয়া, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর ইত্যাদি অঞ্চলে গিয়ে বহু প্রখ্যাত শিল্পীর সান্নিধ্যে আসেন। সঙ্গীতের প্রাচীনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য সংস্কৃত, হিন্দী, তেলেগু, গুজরাটি, বাংলা প্রভৃতি ভাষা শেখেন। শোনা যায় কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়ের ''গীতসূত্রসার'' অধ্যয়নের জন্য তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি মারাঠী '' হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি'' নামে চারখণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। হিন্দীভাষায় 'চতুর পণ্ডিত' ছদ্মনামে লক্ষনগীত লেখেন। লক্ষনগীত তাঁর এক অমর অবদান। সঙ্গীতের সুরকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি বহুচিন্তা-ভাবনা করে স্বরলিপির একটি পদ্ধতি তৈরী করেন, আজও তা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতে সমাদৃত। বরোদার মহারাজার আনুকুল্যে ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে All India Music Conference আহ্বান করেন, এইভাবে বারবার তিনি বিভিন্নস্থানে সম্মেলন করেন। বিভিন্ন রাগে ধ্রুপদ, ধামার, তারানা, খেয়াল লক্ষনগীতের স্বরলিপিসহ ছয় খণ্ডের ''ক্রমিক পুস্তক মালিকা'' তাঁর এক অমর কীর্তি। তাঁর এই মহাযজ্ঞের ফসল স্বরূপ লক্ষ্ণৌয়ের মরিস কলেজ (বর্তমানে ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ) তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনঝংকারের হাতে তুলে দিয়ে ১৯৩৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর গনেশ চতুর্থীতে ইতিহাস হন।

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা সহরে মাতুলালয়ে ফৈয়াজ খাঁর জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের ৩/৪ মাস পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ছব্দর হুসেন খাঁ-এর লোকান্তর ঘটে। তিনি তাঁহার মাতামহ গোলাম আব্বাসের গৃহে আগ্রাতেই প্রতিপালিত হন এবং মাতামহ তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়স থেকে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মাতামহের নিকটেই তিনি সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করেন। মাতুলের প্রতিবেশী নত্থন খাঁ ও তাঁহার খুল্লতাত ওস্তাদ ফিদা হুসেন খাঁয়ের নিকটেও তিনি সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফৈয়াজ খাঁ-এর পূর্ব্বপুরুষ সুজন সিংহ জাতিতে হিন্দু ছিলেন ও বিশেষ ঘটনাচক্রে মূসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পিতা ও মাতা উভয়েরই ধ্রুপদী ঘরানা প্রাপ্ত হন।বংশগত প্রতিভা ও ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার ফলে অল্প সময় মধ্যেই ফৈয়াজ সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন।

তাঁহার শ্বশুর ওস্তাদ মেহবুব খাঁ-এর নিবাস ছিল আত্রৌলী। তিনি ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ খেয়ালীয়া। শ্বশুরের নিকটেও খাঁ সাহেব খেয়াল গানের শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার শ্বশুরালয়ে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গায়ক-বাদকগণের সমাবেশ হতো। তাঁদের সঙ্গীত বাদ্যের বিভিন্নধারা প্রতিভাধর ফৈয়াজ খাঁ-এর সঙ্গীত শিক্ষার সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল যাহার ফলে তিনি ধ্রুপদ, ধামার (হোরি), খেয়াল ব্যতীত ঠুমরী, কাওয়ালী, গজল ইত্যাদি গানেও যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন।

বিশেষ করো ধ্রুপদ অঙ্গের রি, রে, নোম্, তোম্ ইত্যাদি আলাপে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতবর্ষে খুবই কম ছিল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নিমন্ত্রিত হয়ে ফৈয়াজ খাঁ মহীশূর রাজদরবারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীত শ্রবণে মহারাজা অতিশয় মুগ্ধ হয়ে তাঁহাকে ''আপতাবে মৌসীকী'' উপাধি দান করেন এবং বহুমূল্য মুক্তাখচিত একটি স্বর্ণবলয়ে ঐ উপাধি উৎকীর্ণ করে বলয়টি তাঁহার হস্তে পরিয়ে দেন। ঐ বৎসরেই বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও ফৈয়াজ খাঁকে স্বীয় দরবারে শ্রেষ্ঠ গায়কের পদ দান করে তাঁহাকে ''জ্ঞানরত্ন'' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এই সময় বরোদারাজের নিকট খাঁ সাহেবের গুণপনার সংবাদ পেয়ে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে খাঁ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন খাঁ সাহেব একাদিক্রমে বিশ-বাইশ দিন ধরে পণ্ডিতজীকে শুধু ইমন রাগের বিভিন্নপ্রকারের গানই শোনান। তাতে পণ্ডিতজী নিতান্ত বিস্মিত হন এবং তিনি যে ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত গুণী এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

এর কিছুকাল পরেই তিনি ইন্দোর মহারাজার আমন্ত্রণে ইন্দোর রাজদরবারে যান এবং সেখানে গান করেন। মহারাজা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় খাঁ সাহেবের গান শোনেন এবং এতটা অভিভূত হন যে বহুমূল্য হীরকখচিত আপন কণ্ঠহার তাঁহার কণ্ঠে পরিয়ে দেন। এইভাবে পর পর তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজদরবারে ও জমিদারী তালুকদারের ভবনে এবং কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানে আহূত সঙ্গীত সম্মেলনে গান গেয়ে যশের উচ্চশিখরে উপনীত হন।

খাঁ সাহেবের জীবন ছিল নানা বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, গৌরবর্ণ, সুন্দর পরিচ্ছেদে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন — যখন তিনি কোন সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত হতেন তাঁকে রাজপুরুষের মতই দেখাত।

দরবারী গায়কি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তার শেষ ও শ্রেষ্ঠ রূপ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কণ্ঠেই ছিল বলা যায়। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল দরাজ ও গুরুগম্ভীর, লঘু ও গুরু আলঙ্কারিক কারু কার্য্যে পুর্ণ। তিনি ছিলেন অতিশয় দক্ষ, অতি স্পষ্ট ছিল তাঁর উচ্চারণ, বোল বিস্তারে ছিল অতুলনীয়তা, বলিষ্ঠ ও মাধুর্য্যময় ছিল তাঁর ছন্দায়িত তান লহরী। ভারতীয় সঙ্গীতের দীর্ঘকালস্থায়ী, শেষ পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট রূপায়ণ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। বহু গুণীজনের মতে তাঁহাকে এই যুগের তানসেন আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হবে না।

খাঁ সাহেবের অনেক সৎগুণ ছিল। এত উচ্চশ্রেণীর গায়ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন নিরহঙ্কার ও সদালাপী।

তিনি নির্বিচারে বহু শিষ্যকে শিক্ষা দান করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কেবলমাত্র যাদের গান তাঁর মনে রেখাপাত করত তিনি শুধু তাঁদেরই শিষ্যরূপে গ্রহণ করতেন। তাঁর শিষ্যদিগের মধ্যে অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনজনকর, শ্রীদিলীপচাঁদ বেদী, ওস্তাদ নিশার হুসেন, ওস্তাদ আজমৎ হুসেন (বোম্বাই), ওস্তাদ বশীর খাঁ, ওস্তাদ আতা হুসেন, ওস্তাদ মহতাব হুসেন, মালিকজান (আগ্রা), ওস্তাদ সরাফৎ খাঁ, বাংলার জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রথীন চট্টোপাধ্যায়, ও অধ্যক্ষ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগ্রার রঙ্গিলে ঘরানার এই যশস্বী গায়ক ৬৪ বৎসর বয়সে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর বরোদাস্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মান্না দে

১৯১৯ সালের ১লা মে তৎকালীন ইংরেজ অধ্যুষিত কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন শিল্পী মান্না দে। পিতা ছিলেন পূর্ণচন্দ্র দে এবং মাতা মহামায়া দেবী। মান্না দের পূর্বে নাম ছিল প্রবোধ চন্দ্র দে। তাঁর কাকা সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে ছিলেন বিখ্যাত গাইয়ে। মান্না দের সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে ভুবনজোড়া খ্যাতির পিছনে তাঁর কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দের অবদান অপরিসীম।

ইন্দুবাবুর পাঠশালা থেকে স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল-সেখান থেকে স্কটিশচার্চ কলেজ এবং তারপর বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। শারীরবিদ্যাতেও তার সমান ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজে পড়াকালিন রেসলিং এবং বক্সিং-এর ও তালিম নিয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে সুলোচনা কুমারনের সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন। প্লে-ব্যাক করার সাথে সাথে তিনি নিয়মিত তালিম নিতে থাকেন তাঁর কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে ও ওস্তাদ দ্রাবিড় খাঁর কাছে। এই সময় পর পর তিনবার তিনি ইন্টার-কলেজিয়েট সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। ১৯৪২-এ কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দের সাথে তিনি মুম্বাই যাত্রা করেন সেখানে কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দের সাথে সহ-সংগীত পরিচালক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীকালে শচীন দেব বর্মন সহ অন্যান্য প্রখ্যাত সংগীত পরিচালকদের সাথে যৌথভাবে এবং স্বাধীনভাবে সংগীত পরিচালনার কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি সংগীতের বিভিন্ন ঘরানার ওস্তাদ গাইয়েদের কাছে তালিম নেওয়ার কাজও চালিয়ে গিয়েছেন অবিরাম ভাবে। ওস্তাদ আমান আলি খান ও ওস্তাদ আব্দুল রহমান খান তাঁদের অন্যতম। ১৯৪২-এ তামান্না ছবিতে সুরাইয়ার সাথে যুগ্মভাবে গাওয়া 'জাগো ওয়ি ঊষা পন্‌ছি বোলে' গানটি সংগীত জগতে দারুন সাড়া ফেলে দেয়। এরপর তিনি একের পর এক হিট্ গান বাংলা, হিন্দী সিনেমা এবং লঘু সংগীতের ক্ষেত্রে উপহার দিয়ে গেছেন। সংগীত ছিল তাঁর জীবন ও জীবিকা অর্জনের উপায় আবার জীবন সাধনাও বটে। রাগাশ্রয়ী অথবা রাগ প্রধান, ফিল্মি অথবা লঘু, ফিউশন সংগীত সর্বত্রই তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত। সংগীতের ক্ষেত্রে সর্বত্রগামীতা তাঁকে ভারতবর্ষের সর্বকালের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত শিল্পীর আসনে সমাসীন করেছে। ভারতের প্রায় সবকটি আঞ্চলিক ভাষায় তিনি গান গেয়েছেন। তার রেকর্ড করা গানের সংখ্যা চার হাজারেরও বেশি। সংগীতে নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটি জীবনে বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। সংগীতে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তারমধ্যে ভারত সরকারের দেওয়া ১৯৭১-এ 'পদ্মশ্রী' খেতাব, ২০০৫-এ 'পদ্মবিভূষণ' এবং ২০০৭-এ 'দাদা সাহেব ফালকে' পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। ২০১৩ সালের ২৪ শে অক্টোবর এই মহাপ্রাণের প্রয়ান ঘটে।

১.৪.৬ প্রাথমিক থেকে উচ্চপ্রাথমিক পর্যন্ত কয়েকটি সংগীতের নমুনা

প্রার্থনা সঙ্গীত

আমার বিচার তুমি কর—তেওড়া (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর —তেওড়া (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী — ঝাঁপতাল (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

প্রভু আমার প্রিয় আমার — একতাল (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

তোমার অসীমে প্রাণমনলয়ে — ত্রিতাল (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

আপন কাজে অচল হলে—দাদরা (অতুল প্রসাদ)

তোমারি দেওয়া প্রাণে—কাহারবা (রজনীকান্ত)

বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু—দাদরা (সলিল চৌধুরি)

ঋতু সঙ্গীত

কদম্বেরই কানন ঘেরি—দাদরা (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

মেঘের কোলে রোদ—দাদরা (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

ওরে গৃহবাসী—কাহারবা (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

হিমের রাতে —দাদরা (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

হেমন্তে কোন বসন্তেরই — দাদরা (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

বিচিত্র পর্যায়

খর বায়ু বয় বেগে — কাহারবা (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

হারে রে রে — দাদরা (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

দেশাত্মবোধক

ধন ধান্য পুষ্প ভরা—দাদরা (দ্বিজেন্দ্রগীতি)

উঠো গো ভারতলক্ষ্মী—কাহারবা (অতুল প্রসাদ)

নিশিদিন ভরসা রাখিস—দাদরা (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

দূর্গম গিরি কান্তার মরু—কাহারবা (নজরুল)

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়—দাদরা (রজনীকান্ত)

১.৪.৭ ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ঃ-

সংগীতের মূর্চ্ছনাকে আরও প্রাণবন্ত, মনোগ্রাহী করে তুলতে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন।যাইহোক, সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র যে শুধু শ্রোতার মনকে হাল্কা করে তা নয়, শিশুমনের বাধা (যদি কোন থাকে) সরিয়ে তার অনুভূতিতে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। সঙ্গীতের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সার্বিকভাবে তাদের মানসিক ও নান্দনিক জ্ঞানকে উন্নত করতে পারে।

বাদ্যযন্ত্র বিভিন্ন প্রকারের হয়। কিছু বাদ্যযন্ত্র সুর প্রকাশ করতে সক্ষম। তাদের মধ্যে কিছু বাতাসের সাহায্যে বা কিছু চামড়ার বা ধাতব তারের সাহায্যে সুর সৃষ্টি করে। কিছু বাদ্যযন্ত্র চামড়ার ছাউনি দ্বারা আচ্ছাদিত। তারা তাল প্রকাশ করে। কিছু বাদ্যযন্ত্র ধাতু দ্বারা তৈরি। তারা কেবল তালি দেখাতে সক্ষম। এই প্রকার ভেদ অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্রকে বিভিন্ন রূপে ভাগ করা হয়েছে।

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ঃ- ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র মূলতঃ চারভাগে বিভক্ত ঃ- তত (তারের যন্ত্র), আনদ্ধ (চামড়ার যন্ত্র), ঘন (ধাতুর যন্ত্র) এবং সুষির (ফুঁ দিয়ে বাজানো হয় সেই যন্ত্র)।

তারের যন্ত্র ঃ- মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল, তবলা-বাঁয়া, আনন্দ লহরী (গুবগুবা), পাখোয়াজ ইত্যাদি।

ঘন—মঞ্জিরা, ঝাঁঝ, তাল ঘটম, মটকম ইত্যাদি।

সুষির—হারমোনিয়াম, বাঁশী, সানাই ইত্যাদি।

১। **ততবাদ্য :** তাঁত অথবা ধাতব তারে আঘাত করে যে বাদ্য বাজান হয়। তত বাদ্য দুই ধরণের :

(ক) আঙ্গুল দ্বারা আঘাত করা হয়। যথা— সেতার, তানপুরা ইত্যাদি।

(খ) ছড় দ্বারা ঘষে সুর সৃষ্টি করা হয়। যথা— এসরাজ, বেহালা ইত্যাদি।

২। **সুষির বাদ্য :** বায়ু যে যন্ত্রের আওয়াজ সৃষ্টির উৎস। সুষির বাদ্য দুই ধরণের।

(ক) যে গুলিতে রীড্ ব্যবহার করা হয়। যথা হারমোনিয়াম, পিয়ানো ইত্যাদি।

(খ) যেগুলি ফুঁ দ্বারা বাজান হয়। যথা— বাঁশী, সানাই ইত্যাদি।

৩। **অনবদ্ধ বাদ্য :** কাঠ, মাটি বা ধাতব কাঠামোর ওপর চর্মাচ্ছাদিত ছাউনিতে আঘাত করে ধ্বনি উৎপন্ন করা হয়। এই যন্ত্রের ব্যবহার সাধারণত তাল রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা— পাখোয়াজ, বাঁয়া-তবলা, খোল ইত্যাদি।

৪। **ঘন বাদ্য :** ধাতু বা কাষ্টখণ্ড দ্বারা নির্মিত। আঘাতজনিত শব্দের দ্বারা তালি প্রদর্শন করা হয়। যথা, — ঝাঁঝ, করতাল ইত্যাদি। কিছু ঘন বাদ্য আবার গানের সুর প্রকাশ করতে সক্ষম। যেমন, — জলতরঙ্গ।

তানপুরা

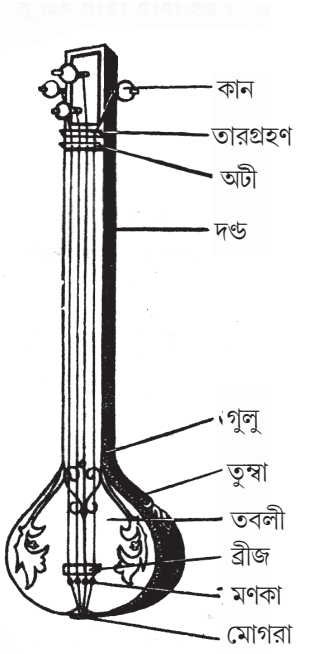

তানপুরার বড় গোলাকার ফাঁপা অংশকে বলা হয় তুম্বা। লাউয়ের খোল দ্বারা তুম্বা প্রস্তুত করা হয়। ইহা ফাঁপা হওয়ার কারণে সুর গুঞ্জরিত হয়। তুম্বার ওপরের লম্বা ফাঁপা কাঠের তৈরী দণ্ডাকৃতি অংশটির নাম দণ্ড। তুম্বা ও দণ্ডের সংযোগস্থলকে বলা হয় গুলু। তুম্বার একদিক ফাঁকা। এই অংশ দণ্ডের সঙ্গে কাঠের চাকতি দ্বারা ঢাকা থাকে। এর নান তব্‌লী। এই তব্‌লীর ওপর সাদা হাড় বা শিংয়ের তৈরী পুলের মত থাকে। এর নাম ব্রীজ। তবলীর নীচের অংশে থাকে ছাঁদাযুক্ত কাঠের টুকরা।

এইখানে তার বাঁধা থাকে। এই কাঠের টুকরার নাম মোগরা। এই মোগরা থেকে তার ব্রীজের উপর দিয়ে গিয়ে তানপুরায় উপরের অংশে কয়েকটি কাঠের খুঁটির দ্বারা বাধা হয়। এই খুঁটিগুলিকে বলা হয় কান। কান দ্বারা তার সুরে মেলান হয়। কানের ঠিক নীচে দুটি হাড়ের টুকরা আঁটা থাকে। এদের নীচেরটি অটি, এর ওপর দিয়ে তার যায়। উপরেরটি তার গহন। তার গহনের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তার যায়। ব্রীজের নীচে যে ছোট ছোট কাঁচের বা হাড়ের গুলি থাকে তাহাকে মনকা বলা হয়। মনকা দ্বারা সুর সূক্ষ্মভাবে মেলান হয়। তানপুরাতে থাকে চারটি তার। ছয় তার বিশিষ্ট তরফদার তানপুরাও আছে। নীচের মোগরাতে তার বাঁধা থাকে। মনকার মধ্য দিয়ে তার ব্রীজের উপর দিয়ে অটির উপর দিয়ে তার গহনের ছিদ্র দিয়ে নিয়ে গিয়ে কানের সহিত বাঁধা থাকে। প্রথম তারটি পেতলের। ইহা মধ্যম বা পঞ্চম বা রাগ বিশেষে অন্য সুরে মেলান হয়। মধ্যের দুটি তার ষ্টীলের। এদের নাম জুড়ির তার। তার সপ্তকে মেলান হয়। শেষ তার মোটা। এটি মন্দ্র সপ্তকের ষড়জে মেলান হয়।

বাঁয়া-তবলা

তাল নির্দেশক বাদ্য-যন্ত্রের মধ্যে বর্তমান যুগে বাঁয়া-তবলার ব্যবহার সর্বাধিক। প্রাচীনকালে মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল। খনন কার্য্যের দ্বারা এ পর্যন্ত্য প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যেসব নিদর্শন পেয়েছি তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয়। রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও মৃদঙ্গের উল্লেখ পাই। মৃদঙ্গ থেকে তবলার সৃষ্টি। কিন্তু কে বাঁয়া-তবলা আবিষ্কার করেছেন এ সম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ আছে। তবে বেশির ভাগ পণ্ডিতের মতে

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমীর খসরু মৃদঙ্গকে দুই ভাগ করে বাঁয়া-তবলার সৃষ্টি করেন। ধ্রুপদ-ধামারের চেয়ে উত্তর ভারতীয় সংগীতে খেয়াল যত জনপ্রিয় হতে লাগল বাঁয়া-তবলার প্রাধান্যও তত বাড়তে লাগল। অপর মতে আবার তবলার সৃষ্টি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানা হয়। সে যাই হোক বর্তমানে গীত-বাদ্য-নৃত্য সব ক্ষেত্রেই তবলা এক অপরিহার্য্য বাদ্য-যন্ত্র। তাছাড়া মৃদঙ্গের তুলনায় তবলা যে কোন সুরে বাঁধা সহজ।

বাঁয়ার কাঠামোটি মাটির তৈরী। তবে বর্তমানে পেতল বা ষ্টীলের পাওয়া যায়। ইহাতেও গুলি ছাড়া তবলার সবদিকই থাকে। বাঁয়া মধ্য সপ্তকের ষড়জে বাঁধা হয়। তাই উঁচু সুরে তোলার প্রয়োজন হয় না। এই কারণে বাঁয়াতে গুলি নাই। তবে কেউ কেউ ধাতব রিং ব্যবহার করেন সুরে বাঁধবার জন্য। সেক্ষেত্রে ধাতব রিং প্রয়োজনে ওঠা-নামা করার জন্য ছোট চামড়ার পরিবর্তে সুতার তৈরী দড়ি ব্যবহার করা হয়। ছিঁড়ে যাওয়ার হেতু অনেকে নাইলন দড়িও ব্যবহার করেন। বর্তমানে অবশ্য ধাতব কাঠামোতে তবলার ন্যায় স্ক্রু-নাটের ব্যবহারও শুরু হয়েছে। কে, কি, কৎ, ক, ঘে, গে ইত্যাদি বর্ণ বাঁয়াতে উৎপাদিত হয়। আবার বাঁয়া ও তবলার একত্রে ধা, ধিন ইত্যাদি বর্ণ উৎপাদিত হয়।

তবলা

মূল কাঠামোটি কাঠ কুঁদে করা হয়। ছাগলের চামড়ার যে আচ্ছাদন থাকে তার নাম ছাউনী। এই ছাউনী তিনটি অংশ থাকে গাব, সুর ও কানি। ছাউনীর মাঝখানে কালো অংশটির নাম গাব বা সাহী। এই গাব যত মোটা হয় আওয়াজ তত নীচু হয় আবার পাতলা হলে আওয়াজ উঁচু হয়। গাব সুরকে নিয়ন্ত্রণ করে। ছাউনীর প্রান্ত ভাগ আর একটি চামড়ার দ্বারা আবৃত থাকে, তার নাম কানি বা চাঁটি। গাব ও কানির মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানের নাম সুর বা লব বা ময়দান। ছাউনীর শেষে বিনুনি করা পাগড়ীর মত অংশকে বলা হয় পাগড়ী বা গজরা। একই রকম আর একটি অংশ তবলার নীচে থাকে তার নাম গুড়রী। পাগড়ী ও গুড়রী উভয়ের দ্বারা একটি চামড়ার দড়ি বা ফিতে ষোল ফেরে বাঁধা থাকে। এই চামড়ার ফিতেকে বলা হয় ছোট্ বা বন্ধি। এই ছোটের সাহায্যে আটকানো হয় আটটি কাঠের টুকরা। এই টুকরাগুলির নাম গুলি বা গাট্টা। এই 'গুলি' গুলিকে উপরে বা নীচে করে তবলার সুর উঁচু-নীচু করা হয়। তবলা সাধারণত তার ষড়জ বা মধ্যম বা পঞ্চমে বাঁধা হয়। তবলায়তা, না, তীন, দীন, থুন, তে, রে টে ইত্যাদি বর্ণ উৎপাদিত হয়।

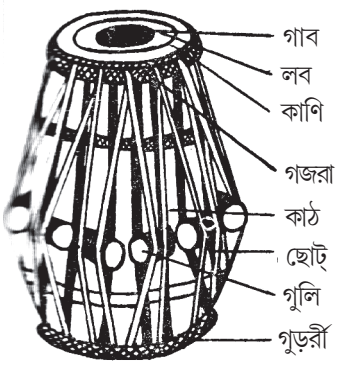

একতারা

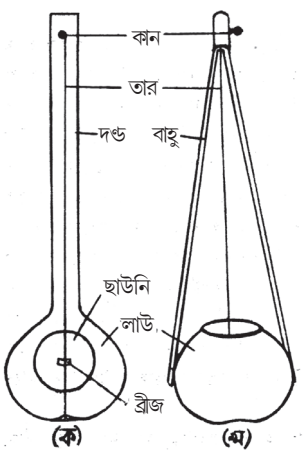

একতারা যন্ত্রে মাত্র একটি তার থাকে। সেই জন্য এই বাদ্যযন্ত্রের নাম একতারা। এই যন্ত্র দুই প্রকার দেখা যায়। এক প্রকার (ক চিত্র) চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত একটি লাউয়ের একদিকে ৩। ৪ ফুট লম্বা একটি কাঠের খুঁটি লাগানো থাকে। খুঁটির বিপরীত দিকে থাকে কান। চামড়ার ছাউনির উপরে থাকে ব্রীজ। লাউয়ের নীচ থেকে তার ব্রীজের উপর দিয়ে গিয়ে কানের সহিত বাঁধা থাকে। দ্বিতীয় প্রকার (খ চিত্র) লাউয়ের একদিক গোল করে কাটা থাকে। খুঁটির পরিবর্তে এক্ষেত্রে মোটামুটি ফুট তিনেক লম্বা বাঁশ ব্যবহার করা হয়। বাঁশের এক প্রান্তের ৪ বা ৫ ইঞ্চি বাদ দিয়ে গোটাটা লম্বা বরাবর মাঝামাঝি ফালি করা হয়। ফলে দুটি বাহু তৈরী হয়। লাউয়ের দুই দিকে এঁটে দেওয়া হয়। বাহুর যে অংশ দ্বিখণ্ডিত নয় সেই অংশে থাকে কান। লাউয়ের নীচে থেকে তার গিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা হয়। এই যন্ত্রকে অনেকে 'লাউ'-ও বলে। একতারার তার

তার-ষড়জে মেলান হয়। বাজাবার জন্য আঙ্গুলের ডগায় তারের আংটি পরা হয়। এই আংটির নাম 'আল'। বৈষ্ণব-বাউলগণকে এই যন্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়।

খোল

খোলকে সম্মানসূচক শ্রীখোলও বলা হয়। পাখোয়াজ বা দক্ষিণ ভারতীয় মৃদঙ্গের সঙ্গে ইহার পার্থক্য থাকলেও এই যন্ত্র এক শ্রেণীর মৃদঙ্গ। শ্রীখোলের মূল কাঠামো পোড়া মাটির তৈরী নল। নলের মোটামুটি মধ্যভাগের পরিধি স্ফীত এবং দুই প্রান্তের পরিধি কমে যায়। তবে বামদিকের পরিধির তুলনায় ডানদিকের পরিধি আরও কম। দুই দিকের খোলামুখ চামড়ার দ্বারা আবৃত। বাঁয়া-তবলার ন্যায় খোলেও ছাউনির মাঝে গাব থাকে, তারপর আছে ময়দান। তারপরের অংশ কানি। তারপর থাকে পাগড়ি। দুই দিকের পাগড়ী চামড়ার ফিতা দ্বারা টান দেওয়া থাকে। এর নাম ভারত-কোষ। এছাড়া মাটির কাঠামো যাতে ভেঙ্গে না যার তার জন্য সরু চামড়ার ফিতা দ্বারা আড়া-আড়িভাবে পুরো কাঠামোটি জড়ানো থাকে। তবলার মত খোলে সুর বাঁধা হয় না। বাংলা মণীপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে কীর্ত্তনে খোলের ব্যবহার দেখা যায়।

গীটার

গীটার দুই রকম। স্প্যানিশ গীটার ও হাওয়াইন গীটার। স্প্যানিশ গীটার তুলনামূলক প্রাচীন। স্প্যানিশ গীটারকে কিছু পরিবর্তন করে হাওয়াই দ্বীপে প্রথম দ্বিতীয় প্রকার গীটারের সৃষ্টি হয়। তাই একে বলা হয় হাওয়াইন গীটার।

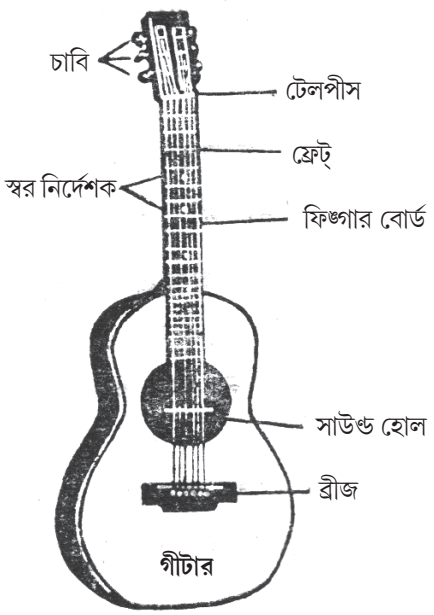

এই যন্ত্রে একটি পাতলা কাঠের বাক্স থাকে। তার ওপর বৃত্তাকার একটি ছিদ্র থাকে, তাকে বলা হয় সাউণ্ড হোল। বাক্সটির সঙ্গে লাগানো থাকে কাঠের দণ্ড। তাকে বলে ফিঙ্গার বোর্ড। এই ফিঙ্গার বোর্ডে ১৮টি সরু ধাতব থ্রেড থাকে স্বরস্থান নির্ণয় করার জন্য। স্বরগুলি যাতে বাজানোর সময় ভুল না হয় তাই ফ্রেটগুলির মাঝে পাঁচটি সাদা ছোট স্বর নির্দেশক থাকে। সাউণ্ড হোলের নীচে কাঠের তৈরী ব্রীজে তারগুলি আটকানো থাকে। সাউণ্ড হোলের বিপরীত দিকে ফিঙ্গার বোর্ডের সঙ্গে ধাতব কোণাকৃতি উঁচু 'টেলপীস' আটকানো থাকে। এই টেলপীসের ওপর দিয়ে তার গিয়ে দুই দিকের চাবির সঙ্গে বাঁধা থাকে। টেলপীসের পর কাঠের টুকরোর মধ্যে থাকে ৬টি চাবি। এই চাবি ঘুরিয়ে তারকে টান বা ঢিলে করে তারে সুর বাঁধা হয়।

গীটারে থাকে ৬টি তার। ১নং, ২নং ও ৩নং এই তিনটি তারকে বলা হয় ট্রেবল। ট্রেবলের তারগুলি প্লেন। ৪নং, ৫নং ও ৬নং তারগুলির নাম বাস স্ট্রিং। এগুলির তারের ওপর তামার তারের কয়েল করা থাকে।

ছোটো ষ্টিলের একটি রড (বার) বাঁহাতের বৃদ্ধাঙ্গুল, তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে ধরে তারের ওপর ঘষে তারের দৈর্ঘ্য ছোটো ও বড়ো করে বিভিন্ন স্বর উৎপন্ন করা হয়। ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমাতে লাগানো থাকে ধাতব পিক্স ও বৃদ্ধাঙ্গুলে সেলুলয়েডের পিক্স। এগুলির দ্বারা তারে আঘাত করলে তারে আওয়াজ হয়।

নীচের নিয়মে তারগুলি বাঁধা থাকে।

৬নং	৫নং	৪নং	৩ নং	২নং	১নং
গ	সা	প	সা	গ	প
			অথবা		
সা	প	সা	গ	প	সা

পাখোয়াজ

প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গের অনুকরণে পাখোয়াজ স্পৃষ্ট হয়েছে। রক্তচন্দন, গাম্ভার, নিম, খয়ের প্রভৃতি কাঠ দিয়ে এই যন্ত্র তৈরী হয়। ফার্সী শব্দ 'পখ' এর অর্থ পবিত্র। পবিত্র আওয়াজ অর্থে পাখোয়াজ নামকরণ করা হয়েছে।

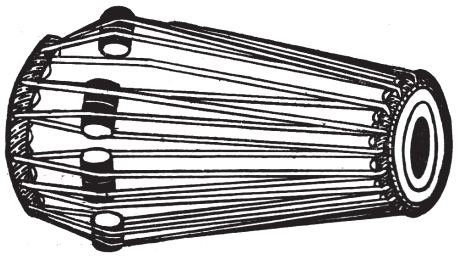

পাখোয়াজ

দুই প্রান্তের তুলনায় মধ্যভাগ অধিকতর স্ফীত। বামদিকের ব্যাস ১২/১৪ আঙ্গুল ও ডানদিকের ব্যাস ৯/১ ০ আঙ্গুল। দুই মুখই চর্মাচ্ছাদিত। ডানদিকের ছাউনির মাঝে গোলাকার খিরল দেওয়া থাকে। ছাউনি দুটি চামড়ার বিনুনি করা বিঁড়া দ্বারা আটকানো থাকে। এই উভয় দিকের বিঁড়া চামড়ার ফিতা দ্বারা বাঁধা থাকে। এই ফিতা বা ছোটে আটকানো থাকে ৮টি করে কাঠের গুলি।

বাজাবার সময় এই গুলির দ্বারা সুর বাঁধা হয়। বাঁদিকের ছাউনিতে আটার প্রলেপ ব্যবহার করা হয়। খেয়াল, ঠুংরী ইত্যাদিতে যেমন বাঁয়া তবলার ব্যবহার হয়, তেমনি ধ্রুপদ, ধামার ইত্যাদির যেমন বাঁয়া তবলার ব্যবহার হয়, তেমনি ধ্রুপদ, ধামার ইত্যাদির সঙ্গে পাখোয়াজের ব্যবহার হয়ে থাকে।

হারমোনিয়াম

আমাদের দেশের সঙ্গীতের সঙ্গে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় সেগুলির মধ্যে হারমোনিয়াম বাদ্যযন্ত্র অন্যতম। বায়ুর সাহায্যে বাজানো হয় বলে হারমোনিয়ামকে সুষির শ্রেণির বাদ্যযন্ত্র বলা হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশে আলেকজাণ্ডার ডিবেইন এই বাদ্যযন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। বিভিন্ন প্রকারের হারমোনিয়াম হয়। সাধারণ হারমোনিয়াম, বক্স হারমোনিয়াম, স্কেল চেঞ্জ হারমোনিয়াম, এক পাট বেলো হারমোনিয়াম, দুপাট বেলো ও সাতপাট বেলো হারমোনিয়াম দেখতে পাওয়া যায়।

হারমোনিয়াম বাজাতে হলে প্রথমে বেলো খুলে দিয়ে স্টপার বা চাবি খুলে দিতে হবে। তারপর বেলো টানতে হবে। এবং ডানহাতের আঙুল দিয়ে হারমোনিয়মের পর্দায় চাপ দিলেই হারমোনিয়াম বাজবে। হারমোনিয়াম বাক্সের উপরে সাদা ও কালো

মিলিয়ে রিড্‌গুলো বসানো থাকে। এতে চাপ দিলেই হারমোনিয়াম বেজে ওঠে। কারণ চাবি খুলে বেলো টানলে বাতাস ঢোকে। তারপর রিড্ টিপলে বাতাসের চাপে সুরটি বেজে ওঠে।

ভারতীয় স্বরে সা ও পা অচল

,, ,, রে, গ, ধ, ন এর কোমল হয় যথা ঋ, জ্ঞ, দ ণ

,, ,, মা -এর তীব্র হয় যথা ক্ষ্মা

পাশ্চাত্ত স্বরে গা ও ধা (E ও A) অচল

,, ,, স, র ম ও প তীব্র হয় (C, D, F, G)

,, ,, ন এর কোমল হয় (B)

কখনো কালো রীডে (পর্দায়) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লাগানো হয় না। হাতটি গোলাকার বস্তু ধরার মত আঙ্গুল করে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে রীডে চাপ দিতে হয়। বুড়ো আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের নীচ দিয়ে ডান দিকে যায়। চাপ যেন জোরে না হয়, কেবল স্পর্শ। রীড্ বোর্ডের রীডের নাম অনুযায়ী ছবি দেওয়া হ'ল। কিন্তু সকলের গলা এক প্রকার নয়। কারও উঁচু, কারও নীচু। এমতাবস্থায় প্রয়োজনমতো 'সা' করে গাইতে হয়। যেমন চতুর্থ কালো রীডকে 'সা' করলে স্কেলটির নামকরণ হয় $G^{\#}$ জি সার্প। পঞ্চম কালো রীড্‌কে 'সা' করলে স্কেলের নাম 'বি ফ্ল্যাট (B^{b}), এভাবে অষ্টম সাদা রীডের ক্ষেত্রে সি ন্যাচারেল (C), ৬নং কালো রীড্ সি সার্প ($C^{\#}$) বা ৭নং কালো রীড ডি সার্প ($D^{\#}$) এভাবে বলা হয়। গায়কের কণ্ঠ অনুযায়ী স্কেল নির্বাচন করে রীড্ গুলি 'স ঋ র জ্ঞ গ ম ক্ষ্মা প দ ধ ণ ন র্স এভাবে সাজানো থাকে।

বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

ক) স্মরণশক্তি বাড়ায়।

খ) কার্যকরীভাবে সময়ের ব্যবহার ও সঠিক পরিকল্পনা করতে শেখায়।

গ) ধৈর্য ও সহনশীলতা বাড়ায়।

ঘ) দায়িত্ববোধ বাড়ায়।

ঙ) মনোযোগ বাড়ায়।

চ) সামাজিক আদান প্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

ছ) শোনার ক্ষমতা বাড়ায়।

জ) নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে।

ঝ) শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ঠিক রাখে।

ঞ) আত্মসম্মানবোধ বাড়ায়।

১.৪.৮ একজন প্রথিতযশা যন্ত্রশিল্পীর অবদান

ভি. বালসারা ঃ ভারতের সর্বকালের সেরা যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভি. বালসারা। আসল নাম ভিস্টাস আরদেশির বালসারা। 1922 সালের 22 শে জুন তাঁর জন্ম হয় মুম্বই শহরে। ছেলেবেলায় মায়ের কাছেই তাঁর হাতেখড়ি হয় - হারমোনিয়াম বাজানোর শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীকালে অন্যান্য অনেক যন্ত্রসংগীত —পিয়ানো, অর্কেস্ট্রা প্রভৃতিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। মাত্র ৬ বছর বয়সে তিনি যন্ত্রসংগীতের Pedal হারমোনিয়াম উপস্থাপনার সামিল হন। মুম্বইয়ের C.J. Hall-এ ব্যক্তিগতভাবে তিনি পাশ্চাত্য সংগীত ও যন্ত্র শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হলেও ১৯৪৭ সালে তিনি এইচ.এম.ভিতে অর্কেস্ট্রা পরিচালক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫৩ সালে পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের আমন্ত্রণে কালকাতার একটি মিউজিকের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন। তার পর থেকেই তিনি কলকাতাতেই পাকাপাকি ভাবে থেকে যান। প্রথিতযশা এই যন্ত্র শিল্পী বহু ফিল্মের সংগীত পরিচালক হিসাবে কাজ করার সাথে সাথে অর্কেস্ট্রা এবং বিভিন্ন বিখ্যাত গানের সুরগুলি পিয়ানোয় রেকর্ড করেন যা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। পরবর্তীতে তিনি মুম্বই সিনে মিউজিশিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পদে অভিসিক্ত হন। বহু হিন্দি ছবির সংগীত পরিচালনার সাথে সাথে বাংলা ছবিরও সংগীত পরিচালনা করেছেন সুচারুভাবে যেমন — 'তিল থেকে তাল' এর সংগীত পরিচালক তিনি।

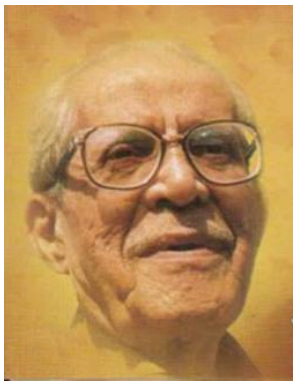

তিনি মৃদুভাষী এবং সুব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। জীবনের বহু ওঠাপড়া, ব্যক্তিগত শোক, দুঃখে — সংগীতকে সঙ্গী করেই অবিচল থেকেছেন। তার মৃত্যুর পর এইচ.এম.ভি (সারেগামা) থেকে একটি ক্লাসিকাল রাগের মূর্চ্ছনা তার যন্ত্রসংগীতে রেকর্ড করানো হয় ও প্রশংসিত হয়। ২০০৫ সালের ২৪ শে মার্চ এই মহাজীবনের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

১.৫ নৃত্য (Dance)

'গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং সংগীতমুচ্যতে।'

গীত, বাদ্য এবং নৃত্য—এই তিনটিকে একত্রে সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া হয়। সংগীতের এই তিনটি কলার মধ্যে নৃত্য বলতে বোঝায় এমন এক শিল্প বিকাশ পদ্ধতি যা বিশেষ দেহভঙ্গীর সহযোগে, নির্দিষ্ট ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে, বিভিন্ন উপযোগী ছন্দে বা তালে নানান পোষাক ও অঙ্গসজ্জার দ্বারা, সুললিত সুর ও কথার মালার সাহায্যে পরিবেশন করা হয়।

এই শিল্পকলা শুধুমাত্র মন, চক্ষু ও মস্তিষ্কের নির্মল শান্তিই দান করেনা, শরীর গঠন ও সুস্থ থাকার বিষয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা করে। সঠিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশে নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

১.৫.১ নৃত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ-

(১) শিশুকে আনন্দ দান

(২) শিশুর অজান্তে শরীরচর্চা করানো

(৩) নিজের দেশকে চেনা

(৪) সাহিত্যবোধ জাগ্রত করা

(৫) আধ্যাত্মিকতাবোধ জাগানো

(৬) সমবেত কাজ করার মানসিকতা তৈরী করা

(৭) বিভিন্ন, চারিত্রিক উন্নতি

(৮) নান্দনিক দিকের বিকাশ

(৯) ভাব ও রসবোধ বাড়াতে সাহায্য করা

(১০) দেশাত্মবোধ জাগানো

(১১) প্রকৃতি প্রেম ও প্রকৃতিকে নিবিড় করে চেনা

(১২) সঠিক জায়গায় সঠিক নির্বাচন ক্ষমতা বাড়ানো।

১.৫.২ নৃত্যের ইতিহাস

নৃত্যের প্রাচীনত্বের খোঁজ করতে না পেরে শাস্ত্রকারেরা আদিগুরু মহাদেবকেই এর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। প্রথমে মহাদেবের কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা করে তাঁর পঞ্চশিষ্য নারদ, রম্ভা, হুহু, তুম্বু ও ভরতকে শিক্ষা দেন। পরে ভরতমুনি পৃথিবীতে সঙ্গীত প্রচার করেন। সঙ্গীত (গীত, বাদ্য ও নৃত্য)-এর মধ্যে ভারতীয় নৃত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে নিম্নলিখিত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) প্রাক-বৈদিক যুগ, (২) বৈদিক যুগ, (৩) বৈদিকোত্তর যুগ, (৪) মধ্যযুগ এবং (৫) আধুনিক যুগ।

ভারতীয় নৃত্যের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

উদয়শঙ্কর ঃ প্রথম বাঙ্গালী তথা ভারতীয় যিনি বিশ্বের দরবারে ভারতীয় নৃত্যের স্থান উঁচু আসনে বসিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন তিনি হলেন উদয়শঙ্কর। বর্তমানে বাংলাদেশের যশোহর থেকে মাননীয় ব্যরিষ্টার শ্যামশঙ্কর চৌধুরী রাজস্থানের উদয়পুরে যান মহারাজার শিক্ষকতার পদ অলঙ্কৃত করতে। সেখানে ১৯০০ সালের ৮ই ডিসেম্বর (মতান্তরে ১৮৯৯ সালের নভেম্বরে) পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন উদয়শঙ্কর। পিতা শ্যামশঙ্কর ছিলেন ভীষণভাবে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ। পিতা বালক পুত্রের চিত্রকলা ও সংগীতের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করে উৎসাহিত হন। পুত্রকে তিনি বোম্বাইয়ের গান্ধর্ব সংগীত মহাবিদ্যালয় এবং জে. জে. স্কুল অব আর্টস–এ ভর্ত্তি করে দেন। চিত্রশিল্পে রা. রা. ধুরন্দর ও সংগীতে বিনায়ক পটবর্ধনকে তিনি গুরুরূপে পান। বোম্বাই-এ তিন বৎসরের শিক্ষা সমাপান্তে নাট্যপ্রেমী পিতা তাঁর নাট্যাভিনয়ে সাহায্যের জন্য পুত্রকে লণ্ডনের 'রয়েল কলেজ অফ্ আর্টস'—এ ভর্তি করেন। উদয়শঙ্কর নিজের যোগ্যতা প্রদর্শন করে 'স্পেনসার' ও 'জর্জ ক্লসেন' পুরস্কার লাভ করেন।

আরম্ভ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। আহত ও পীড়িত ভারতীয় সৈনিকদের সাহায্যার্থে নাট্য প্রদর্শনের উদ্যোগ নেওয়া হল। নাটকে নৃত্যশিল্পী হিসাবে উদয়শঙ্কর যোগদান করলেন। এই সময় প্রখ্যাত রুশ শিল্পী অ্যানা পাভলোভার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অ্যানা পাভলোভা ভারতের অজন্তা, ইলোরার গুহাচিত্র ও ভাস্কর্য দেখে মোহিত হন। তিনি রয়েল কলেজের স্যার উইলিয়াম বথেনস্টাই-এর সঙ্গে আলোচনা করলেন এমন একজন নৃত্যশিল্পীর খোঁজ করা যিনি ঐ সমস্ত চিত্র ও ভাস্কর্যের মূর্তিগুলির ভঙ্গিমা অবিকল নকল করতে সক্ষম। সে যোগ্য ব্যক্তি হলেন উদয়শঙ্কর। ১৯২৩ সালে উদয়শঙ্কর অ্যানা প্যাভলোভার দলে যোগ দিলেন। প্রায় দেড় বছর বিদেশের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে নৃত্যশিল্পী হিসাবে ভীষণ সুনাম অর্জন করেন। বছর দেড়েক পরে ওই দল পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং নিজেই দল গঠন করেন। তাঁর দলে তিমিরবরণ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, রবিশঙ্কর (ভাই), কণকলতা

(ভগ্নী), ফরাসী নৃত্যশিল্পী সিমকী, বিষ্ণুদাস সিরালী, অপরাজিতা নন্দীর মত প্রখ্যাত যন্ত্র-কণ্ঠ-নৃত্য শিল্পীরা যোগদান করলেন। নিজের দল নিয়ে তিনি বহুবার পৃথিবীর নানান্ দেশ পরিভ্রমণ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হন।

ভারতের উত্তরপ্রদেশের আলমোড়ায় 'উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার' নামে একটি নৃত্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে সস্ত্রীক এল.এম্হার্স্ট এবং নিউইয়ার্কের মিস্ বিয়েত্রিচ্ স্ট্রেট্ এগিয়ে আসেন। এছাড়াও বোমা রোল্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সরোজনী নাইডু, স্যার উইলিয়াম, রথেনস্টাইন, স্যার চুনীভাই মাধোলাল, স্যার ফিরোজ খাঁন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

তিনি 'কল্পনা' নামে নৃত্যপ্রধান একটি ছায়াছবি নির্মাণ করেন। রবীন্দ্রনাথকে যেমন নবনৃত্যধারার জনকের সম্মান দেওয়া হয়, তেমন উদয়শঙ্কর হলেন ভারতীয় নৃত্যে ব্যালে প্রবর্তনের জনক। তাঁর নৃত্যপ্রতিষ্ঠানে যাঁদের সাহায্যে তিনি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে শঙ্করণ নাম্মুদ্রীপাদ, রামগোপাল, সাধনা বোস, লালমণি মিশ্র, গোপীনাথ, সহধর্মিনী অমলাশঙ্কর প্রমূখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অবশেষে ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সালে সুযোগ্য পুত্র আনন্দশঙ্কর, সুযোগ্য কন্যা মমতাশঙ্কর ও উদয়শঙ্করের সৃষ্টিকর্মের বর্তমান একাগ্র ও নিষ্ঠাবতী ধারক সহধর্মিনী অমলাশঙ্করকে রেখে তিনি অমৃতলোকে গমন করেন।

১.৫.৩ বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভারতের মতো বিশাল দেশে অন্য নানান ধরনের শিল্পকলার মতো নৃত্য কলাও যে বহুরকমের থাকবে তা খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর মধ্যে প্রধানগুলি হল (১) কত্থক, (২) কথাকলি, (৩) ভরতনাট্যম, (৪) মনিপুরী, (৫) নটবরী, (৬) ওড়িষা, (৭) কুচিপুড়ী, (৮) মহিনীআট্টম, (৯) রবীন্দ্র নৃত্য।

(১) কত্থক ঃ- কত্থক শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রন্থিক বা গাথাকার। প্রাচীনকাল থেকেই এই গাথাকারেরা দেবমাহাত্ম দেবলীলা, পৌরানিক কাহিনী নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতেন। উত্তর ভারতের অন্যতম ধ্রুপদী নৃত্যকলা হল এই কত্থক। এই নাচে তিনটি উপাদান থাকে অর্থাৎ বিশুদ্ধ ছন্দ ভিত্তিক, রস প্রকাশকের উপযোগী ও অভিনয় সমৃদ্ধ নাচ। মুদ্রার ব্যবহার কম হয় কিন্তু সূক্ষ্ম তীব্র পায়ের কাজই এই নাচের মুখ্য বিষয়। পূর্বে এ নাচের বেশভূষা বিভিন্ন দেবদেবী অনুসারে হত যেমন কৃষ্ণ চরিত্রে রেশমী পিতাম্বর, কর্ণে মনরুচির কুন্তল শিরে ময়ুর পঙ্খের মুকুট ইত্যাদি। পরে মুসলিম যুগে পেশোয়াজ পরার প্রচলন হয় ও তার উপরে ওড়না টুপি ইত্যাদি পরা হয়। কত্থক নৃত্যের সাতটি অবয়ব আছে। যথা ঠাট নৃত্যাঙ্গ, জাতিশূন্য, ভাবরঙ্গ, ইষ্টপদ, গতিভাব এবং তারানা।

(২) কথাকলি ঃ- দক্ষিণ ভারতের কেরলের নাচ কথাকলি। এই নৃত্যের বিষয়বস্তু রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী এবং সাধারণত: এই নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয় মন্দির প্রাঙ্গনে অথবা মুক্তাঙ্গনে। আমাদের দেশের যাত্রানুষ্ঠানের মতই মন্ডপের বিশেষ একটি স্থানে নৃত্যানুষ্ঠান হয় এবং দর্শকরা এর চারদিকে বসে থাকেন। রাত্রি ৮ টার পর এই নৃত্যানুষ্ঠান পর্বের সূচনা হয় এবং অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পতন হয়। এই নৃত্যের দুই প্রকার পদম গীত হয়। শৃন্গার পদম ও মুর্গীয় পদম। প্রথমটি মধ্যালয়ে ও দ্বিতীয়টি দ্রুতলয়ে গীত হয়। এর পদাভিনয় তিনভাগে বিভক্ত। (১) এলাকিয়াট্টম, (২) চুল্লিয়াট্টম, (৩) কুত্তিয়াট্টম। রসভূষা ও বেশভূষা এই নৃত্যের বিস্ময়কর সংযোজন। রঙের বিচিত্র বাহার দর্শকদের উজ্জীবিত করে তোলে। রূপসজ্জাকে চরিত্রানুযায়ী পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) নাচ্চা, (২) কাত্তি, (৩) তাড়ি, (৪) কারি, (৫) মিনিক্কু।

(৩) ভরত নাট্যম ঃ- ভরতনাট্যম প্রাচীন নৃত্যরীতির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রূপ। দক্ষিণ ভারতের এই নাচ আঙ্গিক ও রসের বিচারে একান্তভাবে মেয়েদের কামনা আনন্দ বিচ্ছেদসংবলিত শৃঙ্গার রসের নাচ। মূল চরিত্র কৃষ্ণ, কিন্তু শিব ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেও নাচ আছে। এই নৃত্যের গায়িকাদের বলা হয় পদ্মিনী। 'আজউ' এর মাধ্যমে এর সূচনা হয়। এর ছয়টি শ্রেণী বিভাগ আছে। (১) পাক্কা, (২) এট্ট, (৩) টাট মেট, (৪) মেট্টু, (৫) তট্টা, (৬) নাট্টা আজউ।

ভরতনাট্যমের ছয়টি অংশ-আলারিপ্পু, যতিস্বরম, শব্দম, বর্নই, তিলান্না এবং পদম। পূর্বে এই নৃত্যে ডোরাকাটা শাড়ির ব্যবহার ছিল বর্তমানে পায়জামার মত পোষাক ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া উত্তরীয় ও নীতিবন্ধ থাকে। স্কন্ধের উত্তরীয়ের নাম হচ্ছে মেলাকু। চুমকির কাজকরা ব্লাউজ, বেণীর উপরস্থ রঙীন পাথর খচিত ব্রোচ, শিথির দুই পার্শ্বস্থ ব্রোচ, সীমান্তের দুই পার্শ্বে চন্দ্র ও সূর্য নামক দুই ব্রোচ, লকেট, ঝুমকা, বেণীর শেটের ঝুমকা, বাজুবন্ধ এবং নাসিকার জন্য নোলক ইত্যাদি রূপসজ্জার জন্য ব্যবহার করা হয়।

(৪) মণিপুরী ঃ- ভারতের উত্তর-পূর্বে মণিপুর রাজের নাচ হচ্ছে মণিপুরী নৃত্য। মণিপুরের লাহ-হারড় বা উৎসব নৃত্য থেকেই মণিপুরী নৃত্যের সূচনা। প্রথম পর্বে দেবশৃঙ্গার, দ্বিতীয় পর্বে দেবতার নিত্যকার্য করার গান, তৃতীয় পর্বে সৃষ্টি রহস্য ব্যক্ত করা হয় চতুর্থ পর্বে নৃত্যাভিনয়, পঞ্চম পর্বে কৃষিকার্য নৃত্যের মাধ্যমে দেখান হয়, ষষ্ঠ পর্বে টুকরীর সাহয্যে মাছ ধরা সপ্তম পাঠে কন্দক ক্রীড়া অষ্টম পর্বে শিল্পীদের সর্পগতিতে চলন ও নবম পথে আনন্দগান। এর পরে এই নৃত্যের শেষ অংশে গৃহে প্রত্যাগমনের গান।

মনিপুরী নৃত্যের আর একটি অংশ হল রাস। এই নৃত্যের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে খোল বা মৃদঙ্গ প্রধান। এছাড়া ঢোল মঞ্জুরী, করতাল, বাঁশী, শঙ্খ ইত্যাদি বাজান হয়। এই নৃত্যে সাটিংয়ের শক্ত ঘেরওয়ালা ঘাঘরা ও ওড়না এবং পুরুষের কোমরবন্ধ ও পাগড়ি। এছাড়া ধুতি ও টুপি, বালা রতনচুড় প্রভৃতি ব্যবহারকরা হয়।

(৫) নটবরী ঃ- শ্রীকৃষ্ণের একাধিক নামের একটি নাম নটবর। তাই কত্থক নৃত্যের যে অংশ শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য পরিবেশন করা হয় সেই বিশেষ অংশ বা অধ্যায়কে বলা হয় নটবরী নৃত্য। কথিত আছে যে কৃষ্ণভক্ত ঈশ্বর প্রসাদজী নটবর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্বপ্নাভিষ্ট হয়ে কথকের নামকরণ করেন নটবরী।

(৬) ওড়িষী ঃ- উড়িষ্যা দেশের অন্যতম প্রাচীন নৃত্যধারা হল ওড়িষী। ওড়িষী নৃত্যের প্রধান অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে উল্লেখ্য হল ভূমি প্রণাম, বিঘ্নরাজ পূজা, বটুনৃত্য, ইষ্টদেব বন্দনা, স্বরপল্লবীনৃত্য, সাভিনয়নৃত্য এবং তারিঝম। বাদ্যাদির মধ্যে ব্যবহৃত হয় বংশী, পাখোয়াজ, তম্বুরা, মৃদঙ্গ, পারি, মাহুবি, ব্রহ্মবীণা, খনিতাল, পট্টতাল ইত্যাদি। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিই ওড়িষী নৃত্যের মূল ভঙ্গিমা। একে আশ্রয় করে স্থায়ী, চৌকা, চির, লথি, নটবর ও বৈঠি—এই ছয় প্রকার দেহভঙ্গির বিভিন্ন জ্যামিতিক বিন্যাস রচনা করা হয়।

এই নৃত্যে তিন প্রকার কেশসজ্জার উল্লেখ পাওয়া যায়। কটি বেণী, পুষ্পচূঁড়া ও অর্ধবক্তক। অলংকারের মধ্যে কাকর, কেতকী, কোরক, পাহরা, বকুলকলিকা, চপসারিকা, নাগপাশ, মাথামনি ইত্যাদি ও পোষাকের মধ্যে পট্টশাড়ি পাথর খচিত গাঢ় রঙের ব্লাউজ, নীতিবন্ধ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

(৭) **কুচিপুড়ি** ঃ- অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী কুচ্চীপদী গ্রামে এই নৃত্যের জন্ম বলে এর নাম কুচিপুড়ি। সিদ্ধেন্দ্র যোগীকে এই নৃত্যের জনক বলে অভিহিত করা হয়। কুচিপুড়ি পুরুষদের নৃত্য, নারী চরিত্রও রূপায়িত হয় পুরুষদের দ্বারা। বাদ্য এবং কণ্ঠ সঙ্গীতের সহযোগিতায় এই নৃত্য প্রদর্শিত হয়। বাদ্যাদির মধ্যে বেহালা মৃদঙ্গ বীণা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই নৃত্যে মঞ্চ সংস্থার কোন ভূমিকা নেই। কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য হল ঊষা পরিণয়ন, পারিজাত হরণ, ভামকুল্লম, গোলকুল্লম ইত্যাদি।

(৮) **মোহিনীআট্টম** ঃ-দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের একটি ধারার নাম মহিনীআট্টম। ভগবানের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসাই এই নৃত্যশৈলীর বিষয়বস্তু। নায়ক হিসাবে এই নৃত্যে বিষ্ণু কৃষ্ণকেই ধরা হয়। মধ্য ও ধীরগতিতে এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। ভরচনাট্টম ও কথাকলি নৃত্যের অনেক উপাদান ও প্রভাব এই নাচে পরিলক্ষিত হয়। এই নৃত্যে শাড়ির প্রান্তভাগে সোনালী রঙের উজ্জ্বল সূচিকর্মে অঙ্কিত থাকে। নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে বৃত্তাকার ঘুরে এই নৃত্য পরিবশেন করা হয়।

(৯) **রবীন্দ্রনৃত্য** ঃ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের সঙ্গে যে নৃত্য পরিবেশন করা হয় তাকেই রবীন্দ্র নৃত্য বলে। অত্যন্ত সাধারণ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এই নৃত্য করা হয়। এই নৃত্যে প্রধানত শাড়ী পরা হয় এবং বাটিকের ফেট্টি কাঁধ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। বিভিন্ন রঙের ফুল ও ফলের মালা অঙ্গে স্থাপন করে এ নৃত্য করা হয়ে থাকে। কবি মনে করতেন তার গানের সাথে মনিপুরী ও ওডিসি নৃত্যের ভঙ্গিমাগুলি খুব সাবলীলভাবে মিশে যায়। এই নৃত্য শৈলীর নির্দিষ্ট কোন ব্যাকরণ নেই প্রধানত গানের কথা ও ভাবের দিক লক্ষ্য রেখেই এর অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গ সঞ্চালন করা হয়। এই নৃত্যপদ্ধতিতে শিল্পীর স্বাধীনতার সুযোগ বড় বেশী তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত বা কাব্যের রসহানিকর কোনরূপ অভিব্যক্তি যাতে প্রকাশ না পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্তব্য।

১.৫.৪ বাংলার লোকনৃত্য ঃ-

প্রধানত: সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে লৌকিক জীবনের স্বত:স্ফুর্ত আনন্দমুখরতার অভিব্যক্তি ঘটে যে সংহত সামাজিক নৃত্যের মাধ্যমে তাকেই বলা হয় লোকনৃত্য। এই নৃত্যে শাস্ত্রীয় নিয়মকানুনের কোন বন্ধন নেই, কিংবা এতে রঙ্গমঞ্চ বা বেশভূষার ও প্রয়োজন হয় না।

লোক সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে নৃত্য-গীতি। সাধারণ দুঃখ দুর্দশায় জীবনে লোকনৃত্য এক আনন্দের স্রোত এনে দেয়। সমবেত এই নৃত্য পদ্ধতি সামাজিকভাবে বহু ভাবের আদান প্রদানেও সহায়তা করে এবং সকলের মধ্যে একটা আত্মিক বন্ধন গড়ে ওঠে। লোকনৃত্যকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয় (১) স্বত:স্ফুর্ত সহজ, সাবলীল সমবেত গোষ্ঠী নৃত্য। (২) জটিল, তাল, লয় ছন্দে শাস্ত্রীয় আঙ্গিকের গতি, চারী চলন, উৎপ্লাবন, ভ্রামরী ও হস্তকর্মে পুষ্ট লোকসমাজের নাট্যধর্মীয় নৃত্যাদি।

ভৌগোলিক সংস্থা পরিবেশ, প্রথা, রীতি ও ব্যবহৃত অঞ্চলের কথ্যভাষা ভেদেও রুচি রসবোধের দৃষ্টিভঙ্গি ও আঙ্গিক প্রয়োগ কৌশলের পার্থক্য হেতু তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে (১) ধর্মীয় আচরণযুক্ত নৃত্যাদি (২) সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত নৃত্যাদি (৩) শক্তিচর্চা ও অঙ্গচালনের কৌশলযুক্ত রণনৃত্যের অঙ্গীভূত নৃত্যাদি।

বাংলাদেশের লোকনৃত্যকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) বাংলার স্বকীয়তা, ঐতিহ্য, প্রথা, আচারযুক্ত ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের অঙ্গীভূত বাঙালীদের নৃত্য-গাজন, বাউল, রায়বেশে ইত্যাদি। (২) বাংলার বিভিন্ন অধিবাসীদের সুস্থ লোকনৃত্যাদি। যথা লেপচাদের ধান নাচ, নেপালীদের ডাম্ফু, মারুনী, সাওতালদের মোহরায় ওরাওদের কারাম ইত্যাদি।

নিচে কয়েকটি লোকনৃত্যের পরিচয় দেওয়া হল

বাউলঃ- বাউল নৃত্য বাংলার একটি সম্পদ। এর দুটি বিভাগ (১) নৃত্য, (২) নৃত্ত। প্রথমটি অঙ্গকর্ম ব্যঞ্জনাময় এবং দ্বিতীয়টি ব্যঞ্জনাহীন। একতারা বা দোতারা হাতে একক বা সমবেতভাবে এই নৃত্য করা হয়। বিশেষ এক ভঙ্গিমায় ঘুরে ঘুরে গানের দোলায় নিজেকে দুলিয়ে এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

রায়বেশেঃ- এইটি রণনৃত্যের অঙ্গীভূত। বীরভূমের রাজনগর, তাঁতিপাড়া ও চারকল গ্রামসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে এই নাচ প্রচলিত, জমিদারদের আশ্রিত রায়বেশে গোষ্ঠী কর্তৃক এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হত বলে এর নাম রায়বেশে নৃত্য। ঢাক ঢোলের বাজনা সহ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক কসরত বা কৌশল প্রদর্শনই এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য।

কাঠিঃ- গড়বেতা অঞ্চলের নৃত্য হল কাঠি। আশ্বিন মাসে গানের সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে হাতের কাঠিতে আঘাত করে করে মন্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে এই কাঠি নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়।

লেটো ঃ- বাকুঁড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের এই নৃত্যের প্রচলন আছে। এই নৃত্যে যুবক যুবতী সেজে নৃত্য করে। এই লেটোর আঞ্চলিক নাম হচ্ছে ডোলচেঙ্গা। একক বা দ্বৈতভাবে এই নাচ অনুষ্ঠিত হয়।

ঝুমুর ঃ- বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম, রাঢ় অঞ্চল এবং বাংলাদেশের সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে ঝুমুর নৃত্যের প্রচলন আছে। মাদল, বাঁশীর সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এই নাচের সঙ্গে ঝুমুর সুরে প্রেম বিষয়ক গান গাওয়া হয়।

ছৌ ঃ- ঝাড়গ্রাম এবং এর সন্নিহিত অঞ্চলের নৃত্য। চৈত্রের গাজন উৎসবে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। ছৌ নৃত্য নারী-বর্জিত। ঢাক ঢোল বাদ্যের সঙ্গে বলিষ্ঠ অঙ্গভঙ্গী ছৌ নাচের বৈশিষ্ট্য। এই নাচে মুখোশ পরে অঙ্গ সজ্জার এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

ঢালি ঃ- এই নৃত্য সামরিক নৃত্যের অন্তর্গত। বাংলার হাড়ী-বাগদি ডোম প্রভৃতি নিম্নজাতির মধ্যে থেকে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য একদল শক্তিশালী যোদ্ধা প্রস্তুত রাখতেন। এদের বলা হত ঢালি। এই নৃত্যে দুই দলের মধ্যে ঢালে ও বর্শাসহ যুদ্ধের অনুরূপ আক্রমণ এবং আত্মরক্ষারূপ যুদ্ধের কৌশল প্রদর্শন করা হয়।

ব্রতচারী ঃ- বাংলায় এক বিশেষ ধরনের নৃত্যশৈলীর জন্ম দিয়েছিলেন গুরুসদয় দত্ত মহাশয়। এই নৃত্য ব্রতচারী নামে পরিচিত। দেহের উন্নতি করার জন্য এ নৃত্যের প্রচলন। অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক অঙ্গ সঞ্চালনার সাথে সাথে দেহের প্রতিটি অঙ্গের সঠিক ব্যায়াম করার কাজটি যাতে সম্পন্ন হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি এই নৃত্য পদ্ধতির সৃষ্টি করেন। অতি সাধারণ ছাড়া ও গানের মাধ্যমে খেলার ছলে এই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এছাড়া বাংলার বিভিন্ন লোকনৃত্যের গান ও নাচকে একটা অদল বদল করে শরীরের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা ভেবে এই নৃত্যশৈলী এক নতুন মাত্রা এনে দেয়।

নৃত্যের রূপসজ্জা ঃ- নৃত্য প্রদর্শনকালে রূপসজ্জার কথা প্রাচীনকালের বহু গ্রন্থেও উদ্ধৃত আছে। নাট্যশাস্ত্রে গাত্রাবরণের জন্য লাল, হলুদ, নীল এবং কালো রঙের কথা লেখা আছে। সঙ্গীত রত্নাকরে নয়নে অঞ্জন রেখা, কর্ণে কর্ণভূষন, কণ্ঠে তারাহার বলী, কপালে কস্তুরী বিচিত্রি পত্রভঙ্গরেখা ইত্যাদি সহযোগে শিল্পীকে সজ্জিত হবার কথা বলা হয়েছে। আধুনিককালে

স্নো, ক্রীম, ফেসপাউডার, নেলপালিশ, আলতা প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়াও প্রত্যেক নৃত্যশৈলী ভেদে পোষাক বিভিন্ন রকমের পরা হয়ে থাকে। শুধু বিভিন্ন রকমের নয়, বিভিন্ন ভাবেও পরা হয়। কোন কোন ঘরানায় উত্তরীয় ব্যবহার বাধ্যতামূলক। কোন কোন ঘরানায় ওড়না বা ঘাঘরা ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে ব্যবহার করা হয়। মুকুট বা অলঙ্কারাদিও বিভিন্ন প্রকারের নৃত্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। এছাড়া নানা ফুলের মালা দিয়ে খোপায়, গলায়, হাতে, কানে পরার চাহিদাও লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু নৃত্যে মুখের অভিব্যক্তির প্রকাশ স্পষ্ট করার জন্য বিভিন্ন চড়া রঙের ব্যবহার করা হয়। যেহেতু নৃত্য দৃশ্যশিল্প সুতরাং সঠিক রূপসজ্জার দিকে যথেষ্ট খেয়াল ও ঘরানার শুদ্ধতা বজায় রাখার প্রয়োজন আছে।

১.৫.৫ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নৃত্য ঃ-(লোক নৃত্য)

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও এই শিল্পকলার যথেষ্ট সমাদর আছে। স্থান, কাল, পাত্রভেদে তা আলাদা। প্রধাণত: কিছু ধ্রুপদী নৃত্যশৈলী উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে থাকলেও অতি সহজ সাধারণ লোকনৃত্যের চলও বড় একটা কম নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, রীতি নীতি, উৎসব ও নিত্য জীবনযাত্রার ধরনের উপর নির্ভর করেই এই নৃত্য গড়ে ওঠে। মনের স্বত:স্ফূর্ত আবেগ প্রকাশের এবং নির্মল আনন্দলাভের এমন শিল্প-মাধ্যম আর হতে পারে না।

ভারতের বিশেষ বিশেষ প্রদেশের লোকনৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আসাম, বিহার, গুজরাট, কানাড়া, নাগাল্যান্ড, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, সৌরাষ্ট্র, দন্ডীয় রাস, গরবা, গোফগুন্ঠন, মধ্যপ্রদেশ এর নৃত্য।

আসাম ঃ- এই অঞ্চলের লোকনৃত্যের মধ্যে বিহুই প্রধান নৃত্য। বছরের শেষ দিন (অর্থাৎ ৩১শে চৈত্র) থেকে শুরু করে প্রায় একমাস ধরে বিহু উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সমাজের সর্বস্তরের লোকেরাই এতে অংশগ্রহণ করে। বিহুগানের সঙ্গে চলে বিহুনৃত্য। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে চলে এই নৃত্য। ঢোল, বাঁশী, শিঙা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজান হয়।

বিহার ঃ- এই অঞ্চলের লোকনৃত্যে ধর্মমূলক কাহিনীর প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন রামলীলা, নারদী, ভগতা, পৃজারতি, কুঞ্জরাস, কদমলীলা ইত্যাদি। ধর্মমূলক ছাড়াও চটুল আদিরসাত্মক নৃত্যও প্রচলিত আছে। যেমন নাটুয়া, নাচনী রসিক ইত্যাদি। অন্যান্য লোকনৃত্যের মধ্যে লাঝুরী, পাইকা, দশাই, বুবু, ঝুমুর হোলি উপলক্ষে ডাঙ্গা ও ঝিকা নৃত্য উল্লেখযোগ্য। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝারনী নাচ এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে কমলাবাই, চামর ইত্যাদি জনপ্রিয়।

রাজস্থান ঃ- রাজস্থানের লোকনৃত্যের মধ্যেও বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল-ডান্ডিয়া, রসিয়া, কাছি, খোড়ি, ভালার গীদার, ঝুমার ইত্যাদি।

গুজরাট ঃ- গুজরাটের লোকনৃত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গরবা নৃত্য। অস্বামাতার উৎসবে নবরাত্রির সময়ে একটি মঙ্গল দীপকে চক্রাকারে বেষ্টন করে হাতে তালি দিয়ে এই নৃত্য করা হয়। দপ্পুবাদ্যম নৃত্যে ঢোলক ও কাঠি সহ হরিজনরা অংশগ্রহণ করে এবং কুম্মি কেবলমাত্র মেয়েদের নৃত্য।

কানাড়া ঃ- লাঠি হাতে ছেলেদের পারিয়া নাচ বেশ জনপ্রিয়। এই নৃত্যে বাঁশি, মন্দিরা ও চেন্দ্রা বাজান হয়। আরও একটি জনপ্রিয় নাচ হল পুত্তুর অঞ্চলের মেরা গোষ্ঠীর নাচ। এটি মহিলাদের নাচ। সাদা শাড়ী পরে পুরুষ ঢাক-বাদককে পরিক্রমা করে এই নাচ করা হয়।

তামিলনাড়ু ঃ- এখানকার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নৃত্যটির করুভানজী। যাযাবর কুরাতি গোষ্ঠীর মধ্যেই এই নৃত্যটি প্রচলিত। এছাড়া পুরভী আট্টম এবং জিন্নান কোলট্টাম। শেষেরটি মেয়েদের নৃত্য এবং দুইহাতে লাঠি ও ফিতে একত্রে নিয়ে এই নাচ করা হয়।

নাগাল্যান্ড ঃ- নাগাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একটি হল করুই এবং আর একটি জেভি নাগা। দুই দলের খাম্বালিমা নৃত্যের কোন মিল নেই। এই নৃত্যে ছেলে-মেয়ে একত্রে অংশ গ্রহণ করে। এদের আরেকটি নাচ ক্রমিরালিনষ। বর্ণালী পোষাক ও অলংকার ব্যবহারের চল আছে।

উড়িষ্যা ঃ- এই প্রদেশের লোকনৃত্যের মধ্যে সাঁওতালি নাচ, মুন্ডারিদের যাদুর নাচ এবং ভুঁইয়াদের করম নাচ উল্লেখযোগ্য। করম নাচটি ভাদ্রমাসের একাদশীর দিনে করা হয়। করম মানে শস্য। শিবের কাছে ফসলের জন্য প্রার্থনা করা হয়। ছেলে মেয়ে উভয়ে একটি পাহাড় বা টিলার উপরে এই নৃত্য করে।

সৌরাষ্ট্র ঃ- সৌরাষ্ট্রের লোকনৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দন্ডীয় রাস, গরবা ও গোফগুন্ঠন।

দন্ডীয় রাস ঃ- এই নৃত্যে অংশগ্রহণ কারিদের হাতে থাকে দুইটি ছোট লাঠি। সানাই ও ঢোলের সঙ্গে লাঠিতে তাল দিতে দিতে বৃত্তাকারে এই নাচ করা হয়।

গরবা ঃ- হোলি, বসন্তপঞ্চমী, নবরাত্রি এবং শারদ পূর্ণিমায় গরবা নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় এবং কৃষ্ণবিষয়ক গানই এর উপজীব্য।

গোফগুন্ঠন ঃ- এর সাথে দন্ডীয় রাসের সাদৃশ্য আছে। এটিও বৃত্তাকারে নাচা হয় তবে বৃত্তের মধ্যে থাকে একটি কাষ্ঠখন্ড এবং তাতে বাঁধা থাকে নানা প্রকার রংবেরঙের ফিতে। এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে ফিতের প্রান্ত ধরে নাচটি করা হয়।

মধ্যপ্রদেশ ঃ- মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের প্রিয় নাচ করমা। এই নৃত্যে ছেলে মেয়েরা পৃথক দলবদ্ধভাবে নাচে। মেয়েরা নাচে অর্ধবৃত্তকারে এবং ছেলেরা বৃত্তকারে। এরা সারা বছর বিভিন্ন নৃত্য করে যেমন বর্ষাকালে নাচে গোন্ডা, ভাদ্র মাসে নবরানি উৎসব, চৈত্র মাসে চেত দন্ড ও শ্রাবন মাসে গোডো ইত্যাদি।

ঘরানা ঃ- বিভিন্ন সঙ্গীত গুণী বিভিন্ন স্থানে বা আশ্রয়ে থেকে বিভিন্ন ধারার যে গায়কী রীতি প্রবর্তন করেন সঙ্গীতে তাকেই ঘরানা বলে। ঘরানা শব্দটি সঙ্গীত সম্রাট তানসেনের সময়ের এর পূর্বে ইহা বাণী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যেমন শুদ্ধ বাণী, ডাগর বাণী, লোহার বাণী ইত্যাদি। ঘরানা শব্দটি সম্পর্কে একটু অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, কোন বিশিষ্ট গায়ক বা বাদক রাগ সঙ্গীতের সকল নিয়ম পালন করে ও তাঁর গায়ন বা বাদন শ্রেণীতে নিজের স্বতন্ত্রভাব ফুটিয়ে তোলেন অর্থাৎ ব্যক্তিগত চিন্তাধারা অনুযায়ী পান্ডিত্য, রসসৃষ্টি, ছন্দবৈচিত্র্য প্রভৃতির দ্বারা হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশন করে শ্রোতামন্ডলীর প্রশংসা অর্জন করেন। সেই নিজস্ব প্রতিভাজাত নূতন শৈলীর ধারাকে ঘরানা বলে। এই ধারা বংশ পরম্পরা বা গুরু পরম্পরায় ক্রমশ চলতে থাকে।

বিভিন্ন ঘরানার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলির নাম হল - (১) গোয়ালিয়র ঘরানা, (২) রংগীলা বা আগ্রা ঘরানা, (৩) পাতিয়ালা ঘরানা, (৪) কিরান ঘরানা, (৫) বিষ্ণুপুর ঘরানা, (৬) দিল্লী ঘরানা।

ঘরানার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের যে পৃথক ধারা বা শৈলী সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে যত্ন সহকারে বজায় রাখা। প্রত্যেক ঘরানার শিল্পীর উচিত সেই ঘরানার সূক্ষ্ম অথচ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম কানুনকে অত্যন্ত শুদ্ধতার সঙ্গে পালন করা। এক ঘরানার থেকেই জন্ম নেয় নতুন ঘরানা। তাই সঙ্গীত জগতে ঘরানার গুরুত্ব অপরিসীম।

১.৫.৬ প্রাথমিক থেকে উচ্চপ্রাথমিকে নৃত্য শিক্ষার গুরুত্ব

প্রাথমিক শিক্ষার সঠিক প্রসারের প্রধান মাধ্যম হল ছোট ছোট শিশু। এই শিশুর মনে আনন্দ পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষাদানই হল একমাত্র সহজ ও একান্ত প্রয়োজনীয় সেতু। এই আনন্দ পাঠদানের একটি অন্যতম উপকরণ হল সঙ্গীত

(গীত, বাদ্য ও নৃত্য)। এর মধ্যে নৃত্যই আমাদের আলোচিত বিষয়। পড়াশুনার একঘেয়েমি থেকে নূতনত্বের স্বাদ পাবার জন্য সকল শিশুই উদগ্রীব হয়ে থাকে। তাই শিশুমনে এই অচেনা অজানা সুন্দর নতুন বাতাসের ছোঁয়া লাগাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জুড়িমেলা ভার। এই অনুষ্ঠানের একটি অংশ হল নৃত্য। এই শিল্পকলার মাধ্যমে শিশুমনের যে যে বিষয়ের উন্নতি হয় তা নিম্নে দেওয়া হল

১। নৃত্য অনাবিল আনন্দ দান করে। সুন্দর পোষাক ও অঙ্গসজ্জা করে যে কোন শিশু নৃত্য পরিবেশন করলে বা করা দেখলে খুশী হবেই।

২। বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন হয় এই নৃত্যশিল্প পরিবেশনের ক্ষেত্রে এই কারণে মনের খুশীতে নিজেরই অজান্তে তার দেহের শরীরচর্চার কাজটি সম্পন্ন হয়ে যায় যা কিনা যে কোন শিশুর বাড়তি লাভ।

৩। যেহেতু বিভিন্ন জায়গার নৃত্যের বিভিন্ন রূপ আছে; তাই সে সব শিখতে গিয়ে কোন্ জেলার বা কোন্ প্রদেশের নাচ তা শেখা হয়ে যায় ও সেই জেলার বা প্রদেশের প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতির সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা জন্মে।

৪। কোন গ্রামের সাথে যখন নৃত্য পরিবেশন করা হয় তখন সেই গানের কথার মানে বা ভাবের অর্থ অনুসারে অঙ্গ সঞ্চালনা করতে হয়। ফলস্বরূপ তার সাহিত্যবোধের উন্নতি ঘটে।

৫। কোন কোন নৃত্য ঈশ্বরকে নিবেদনার্থে পরিবেশিত হয়। এছাড়া পূজা বা প্রার্থনার গানেও ঈশ্বরবোধকে গুরুত্ব দিয়ে নৃত্যভঙ্গি বা ভাবের প্রকাশ করা হয়। এর সাহায্যে তার আধ্যাত্মবোধ জাগ্রত হয় অতি অনায়াসেই।

৬। যেহেতু নৃত্যে তালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাই এই বিষয়ে শিক্ষাদান কালে গণিতের সাহায্য নিতে হয় এবং অবলীলায় গণিত বিষয়ের দক্ষতা সামান্য হলেও বৃদ্ধি পায়।

৭। জীবনের একটা ছন্দ আছে। সে ছন্দ হল সবার সাথে এক হয়ে চলার ছন্দ। শিশু বয়স থেকেই সমাজের ও ছন্দবোধ জাগ্রত করা উচিত তাই নৃত্যের তালে তালে পা মেলাতে মেলাতে তার এই ছন্দবোধের ভিত আপনা থেকেই গড়ে ওঠে।

৮। নৃত্য একক শিল্পের স্থান পেলেও সমবেত নৃত্যের দৃশ্যনীয় নান্দনিক বিষয়ের সৌন্দর্য্য অপরিসীম, তাই সমবেত নৃত্যের সুর, তাল, লয় ভঙ্গিমার মিলনের চেষ্টা করতে করতে শিশুমন সমবেত কাজের বা সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় বৃহৎ কাজের গুরুত্বকে বুঝতে শেখে।

৯। নৃত্যের মাধ্যমে গড়ে ওঠে সামঞ্জস্যবোধ। বিভিন্ন ধরনের কাব্যরসের সাথে সাথে একাগ্রতা সহযোগে মিলিত সৃষ্টির নেশায় তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও চারিত্রিক উন্নতি ঘটে।

১০। নৃত্যে বেশভূষা একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাই কোন নৃত্যে কোন্ ধরনের পোষাক পরা উচিত বা কেনই বা উচিত তা জানার আগ্রহ বাড়ে এবং প্রকৃতি ও দেশ কালভেদে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে তার পরিচয় ঘটে ও নতুন জ্ঞানার্জন হয়।

১১। নৃত্যে রূপসজ্জা একটি বিশেষ দিক। নিজেকে ও অপরকে সুন্দর দেখতে সবারই ভাল লাগে তাই এই কারণে শিশুমনের নান্দনিক দিকের বিকাশ ঘটে।

১২। নৃত্য পরিবেশনকালে কোন গান বা বিশেষ নৃত্যশৈলীর অন্তরনিহিত ভাব বা মানে প্রকাশ করতে হয় তাই বিভিন্ন ধরনের রসবোধ বা ভাববোধ তার অন্তরে বিকশিত হয়।

১৩। বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে স্বদেশ পর্যায়ের গান বা কবিতা সহযোগে নৃত্য করতে করতে তার দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয় যা বর্তমানে সমাজে বড়ই বিরল বস্তু।

১৪। বিভিন্ন ঋতু উৎসবে যে নৃত্য পরিবেশন করা হয় তাতে প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুর কথা, ঋতু পরিবর্তনের কথা, প্রকৃতিকে চেনার কথা প্রভৃতি বোঝা হবেই এবং এর ফল স্বরূপ সে প্রকৃতিকে ভালবাসতে শেখে।

১৫। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য পরিবেশনের সাথে সাথে কেন সেই নৃত্য নির্বাচন করা হল তা জানতে বা বুঝতে শিখবে এবং পরবর্তীকালে নৃত্য নির্বাচন বা সঠিক অনুষ্ঠানে সঠিক বক্তব্য প্রকাশ করতে শিখবে।

এই সকল দিকের কথা চিন্তা করে সাধারণ সকল পাঠক্রমের সাথে সাথে নৃত্য সহযোগে আনন্দ পাঠদানের এই প্রক্রিয়ার গুরুত্বকে আরও বেশী প্রানবন্ত করে তুলতে হবে।

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ- 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখ

(১) কত্থক নৃত্যে ঘুঙুরের ব্যবহার হয়।

(২) ঝুমুর বাংলার একটি লোকনৃত্য।

(৩) কথাকলি উত্তর ভারতীয় নৃত্যশৈলী।

(৪) ছৌ নাচ নারী বর্জিত নৃত্য।

(৫) আমাদের একটি নৃত্যপদ্ধতির নাম বিহু।

উত্তর ঃ- (১) ✔ (২) ✔ (৩) ✖ (৪) ✔ (৫) ✔

আরো কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন

(১) বাংলার একটি লোকনৃত্যের নাম বল।

(২) ভারতনাট্যম কোন ভারতের নৃত্যশৈলী?

(৩) একজন কথাকলি নৃত্যশিল্পীর নাম লেখ।

(৪) রায়বেশে কোন অঞ্চলের নাচ?

(৫) একটি নৃত্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম বল

উত্তর ঃ- (১) ছৌ নৃত্য (২) দক্ষিণ ভারতীয় (৩) গুরু গোবিন্দ কুট্টি (৪) বীরভূম (৫) নাট্যশাস্ত্র

<u>নৃত্যের উদ্দেশ্যে কিছু গানের নমুনাঃ- 'হ্যাঁ' বা 'না' লিখ</u>

(১) মোরা একই বৃন্তে	দেশাত্মবোধক
(২) বান এসেছে	,,
(৩) ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে	প্রকৃতি
(৪) মেঘের কোলে রোদ	,,
(৫) আমরা চাষ করি	কর্মসঙ্গীত
(৬) সব কাজে হাত লাগাই	,,
(৭) আরো আরো প্রভু	প্রার্থনা

(৮) আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে ..... প্রার্থনা

(৯) সবারে করি আহ্বান ..... আনুষ্ঠানিক

কয়েকজন নৃত্যশিল্পীর নাম ঃ- প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল অবধি বহু শিল্পী এই শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন নৃত্যশিল্পীর নাম নিম্নে দেওয়া হল।

ভরতনাট্টম ঃ- রুক্মিনীদেবী অরুন ডেল, শঙ্করমেনন, ইন্দ্রানী, রহমান, টি. কলা সরস্বতী।
(তামিলনাড়ু)

কত্থক ঃ- শম্ভু মহারাজ, বিরজু মহারাজ, লাচ্ছু মহারাজ, সীতারাদেবী।
(উঃপ্রদেশ)

কথাকলি ঃ- গোপীনাথন, কৃষ্ণানায়ার, গুরু গোবিন্দ কুট্টি
(কেরালা)

কুচিপুরি ঃ- ডেমপতি, চিনাসত্যম, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, রাজারেড্ডি, রাধা রেড্ডি, শোভা নাইডু।
(অন্ধ্রপ্রদেশ)

মনিপুরী ঃ- রীতা দেবী, সবিতা মেহতা, নির্মল মেহতা।
(মনিপুর)

মোহিনী আট্টম ঃ- ভারতী শিবাজী, রাগিনী দেবী, কলা দেবী হেমা, গীতা নায়েক।
(কেরালা)

ওড়িশী ঃ- গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র, সোনাল মানসিংহ, লক্ষ্মীপ্রিয়া মহাপাত্র।
(ওড়িশা)

শাস্ত্রীয় ঃ- শ্রীমন্ত শংকর দেব।
(আসাম)

এঁরা ছাড়াও বেলা অর্নব উদয়শঙ্কর, থাঙ্কুমনী কুট্টি, সংযুক্তা পাণিগ্রাহী, হেমামালিনী, কেলুচরণ মহাপাত্র, সুতপা তালুকদার, অমলা শঙ্কর, স্বপ্নাসুন্দরী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

১.৬ নাটক :

আদিমযুগে মানুষ ভাবপ্রকাশের জন্য বিভিন্ন শব্দের আদানপ্রদান করত। কখনও আনন্দ প্রকাশ করে চিৎকার করে নাচত, আবার কখনও দুঃখে বিভিন্ন শব্দ করত। যখন এরকম প্রকাশ ভঙ্গী শারীরিক অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়ে মানুষের বিনোদনের অঙ্গ হিসাবে উঠে আসল তা লোক নাটক হিসেবে পরিচিত হল। এই লোকনাটক ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ, আনন্দ উৎসবে ব্যবহৃত হতে থাকল। পরবর্তী সময়ে শহুরে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে এই নাটকের আঙ্গিক আরও পরিশীলিত হল। গ্রীক সভ্যতায় নাটক খুবই উন্নতি লাভ করেছিল। গ্রীক শব্দ 'Drama' থেকে Drama বা নাটকের উৎপত্তি। গ্রীসে সফোক্লিস, ইউরোপিডিস প্রভৃতি নাট্যকারের বিখ্যাত নাটক আজও অবিস্মরণীয়। গ্রীসদেশে Dionysus দেবতার পূজায় যে সঙ্গীতের প্রচলন ছিল তা থেকে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি এবং ঐ দেবতার উৎসবে হাস্য পরিহাসযুক্ত শোভাযাত্রা ও সঙ্গীত থেকে কমেডির সৃষ্টি।

ভারতবর্ষে 'নৃৎ' ধাতু থেকে 'নাটক' এই কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে অনুমান করা যায়, নৃত্য থেকে ভারতীয় নাটকের জন্ম। ভারতীয় নাটকের মূলও প্রাচীন ধর্মের মধ্যে নিহিত। কথিত আছে, ব্রহ্মা নাট্যবেদ নামে পঞ্চবেদ প্রণয়ন করেন। চর্তুবেদ থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে তিনি এই নূতন বেদ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা এই বেদ তাঁর শিষ্য ভরত মুনিকে শিক্ষা দেন। ভরতমুনি তা প্রচার করেন।

সংস্কৃত নাটক কবে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। ভাসের নাটকগুলি আবিষ্কার হওয়ার পরে অনেকে বলে খৃ:পূ: তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীর নাট্যকার বলে মত দিয়েছেন। কেউ কেউ অশ্বঘোষকে ভাসেরও আগের নাট্যকার বলে অভিহিত করেছেন। তবে নাটক তখনকার মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গ্রীসদেশে খোলা আকাশের নীচে ত্রিশ হাজার দর্শক সমবেত হয়ে নাটক দেখতেন, তা ছিল সর্বসাধারণের জন্য। সংস্কৃত নাটক এত বেশী অলংকারপূর্ণ ও কবিতাসমৃদ্ধ ছিল—যা দেশের অধিকাংশ সাধারণ লোকেদের কাছে বোধগম্য হত না, যদিও সংস্কৃত নাট্যকারের মধ্যে কালিদাস, ভাসের নাম উল্লেখযোগ্য। 'কুমারসম্ভব', 'শকুন্তলা', 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি নাটক সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিভিন্ন আঙ্গিকের থিয়েটার

প্রসেনিয়াম থিয়েটার : প্রসেনিয়াম শব্দটি লাতিন শব্দ থেকে এসেছে। প্রসেনিয়াম মানে "in front of the scenery" প্রাচীন রোমে এ ধরনের থিয়েটার অনুষ্ঠিত হত। পরবর্তীকালে তা পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান প্রসেনিয়াম থিয়েটার এসেছে। যারা অভিনয় করছে এবং দৃশ্যপটের মধ্যে প্রসেনিয়াম জানালা তৈরি করে। এখানে দর্শক খুব ভালোভাবে অভিনেতাদের দেখতে পায়।

থার্ড থিয়েটার : থার্ড থিয়েটার চারিদিক খোলা একজায়গায় অভিনয় করা হয়। এখানে দর্শক চারিদিকে বসতে পারে। আলাদা করে মঞ্চ তৈরি করা হয় না। মাঠে, ময়দানে, রাস্তায় যে কোনো জায়গায় এই আঙ্গিকে অভিনয় করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে বাদল সরকারকে এই ধারার থিয়েটারের জনক বলা যায়।

যাত্রা : বাংলার সবথেকে জনপ্রিয় লোক থিয়েটার। মূলত: বাংলাভাষী অঞ্চলে 'যাত্রা' সীমাবদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের সময় থেকে এই আঙ্গিকের থিয়েটার শুরু হয়। সেইসময় গান সমৃদ্ধ থিয়েটার (Musical Theatre) হত। পরবর্তীকালে 'যাত্রা' তার নিজস্ব ধারায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

আলকাপ : বাংলার আর এক লোক-থিয়েটার। যা মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম জেলায় প্রচলিত এক লোক আঙ্গিক। গান, নাচ ও অভিনয়ে সমৃদ্ধ থিয়েটার। সাধারণত:, দশ থেকে বারোজন অভিনেতা থাকে। এর মধ্যে 'গুরু' ও দু তিনজন 'ছোকরা' থাকে। এই লোক-থিয়েটারে সামাজিক সমস্যা দর্শকের কাছে তুলে ধরা হয়।

গম্ভীরা : গম্ভীরা ও বাংলার আর এক লোক থিয়েটার। মালদা জেলাতে এই আঙ্গিকের প্রয়োজন। গান ও অভিনয় এই লোক থিয়েটারে ব্যবহার করা হয়। গম্ভীরা শিবের বন্দনা দিয়ে শুরু করা হয়। শিব এখানে গম্ভীর বলে পরিচিত। প্রধান চরিত্র দাদু ও নাতি। এই দুজনের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে গম্ভীরা অনুষ্ঠিত হয়। গম্ভীরার মধ্যে দিয়ে বর্তমান সামাজিক সমস্যা দর্শকের কাছে উপস্থাপিত হয়।

What is Drama ?

Drama মানে নাটক, Means visualy art। Class এ পাঠদানকালে যে কোন পাঠ্য বিষয় যদি 'নাটক' করে দেখানো যায় তবে ছাত্রছাত্রীদের মনে তা এমন ভাবে গ্রথিত হয়ে যায় যে জীবনে সেই ঘটনা ভুলতে পারবে না, এবং পাঠদান ও খুব আকর্ষণীয় হয় আর ছাত্রছাত্রীরা মন দিয়ে শুনবে বা নিজেরা করে দেখাবে। পাঠ্যবিষয় থেকে নিজেরা শিক্ষা নেবে যাতে পরবর্তীকালে তার জীবন সুন্দরভাবে সংগঠিত করতে পারবে। যেমন ধরি — মিথ্যা কথা বলা নিয়ে ছোটবেলায় বাড়ীতে

বড়দের মুখে মুখে শুনেছি রাখাল ছেলে আর বাঘ এর গল্প। পরবর্তীকালে আত্মরক্ষার্থে বা অকারনেই হয়তো মিথ্যা কথা বলতে গেছি- বড়রা/গুরুজনেরা বলেছেন রাখালের পালে বাঘ পড়ার কথা মনে আছে তো? আমরা সাবধান হয়েছি। কাজেই - পাঠ্য বিষয়ের মধ্যেই থাকা এইসব নীতিশিক্ষা মূলক কাহিনীগুলোকে অবলম্বন করে যদি - নাটকের রূপ দেওয়া যায় এবং ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে শ্রেণিকক্ষেই উপস্থাপন করে দেখানো যায় তবে সেই পাঠ্যাংশের সাথে সাথে তার মূল শিক্ষাটুকুও চিরদিন ছাত্রছাত্রীদের মনে গেঁথে থাকবে।

সৃজনশীল নাটক (Creative Drama) : সৃজনশীলতা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যেমন এগিয়ে যেতে সাহায্য করে মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়না।- পারিবারিক, ঐতিহাসিক রূপকথা, পৌরাণিক, সামাজিক হিংসা, প্রেম, কুৎসা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি ঘটনা সম্বলিত, নাটক প্রভৃতি এই পরিবর্তনশীল জগতে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে, সমস্যা নিরসনে কিছু নাটক লেখা হয় মানুষের দৃষ্টি গোচরে দ্রুত আনার জন্য। বাধাধরা ছকের বাইরে গিয়ে কিছু উপস্থাপন করতে হয় যা নাট্যকাররা এবং কলাকুশলীরা করে থাকেন যত্নসহকারে। এক পরীক্ষা বলা যেতে পারে। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, অভিনয় ধারা, ইত্যাদির ওপর পরীক্ষা নিরিক্ষা ক্রমাগত চলতে থাকে— উদ্দেশ্য একটাই - সমসাময়িক ঘটনাবলীর দিকে মানুষের নজর আনা ও তার সমাধান-এর পথ বাত্‌লে দেওয়া।

নৃত্যনাট্য (Dance Drama) : নাচ, গান আর নাটক একই সাথে যদি মঞ্চে পরিবেশিত হয় কোনোও একটি ঘটনা নিয়ে তবে তা হলো নৃত্যনাট্য তবে এক্ষেত্রে অভিনেতা অভিনেত্রীরা নিজেরা কোন সংলাপ (যা কাহিনীকার লিখেছেন) বলবেন না। কোন গান নিজে গাইবেন না। নেপথ্য শিল্পীর গানে ও কথায় মঞ্চে উপস্থিত শিল্পীরা নাটকটি পরিবেশ করবেন নৃত্যের মাধ্যমে। দর্শকদের কাছে এটা কুবই আকর্ষণীয় হয় কারণ তাঁরা এটাতে তিনটি Art from একসাথে পান।

১.৬.১ উদ্দেশ্য :

- নাটকের মাধ্যমে অনেক বিষয় সহজে শেখানো যায়।
- নাটকের মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়।
- নাটক বিনোদনের অন্যতম অঙ্গ যা পড়াশোনার ক্লান্তি থেকে মুক্ত করে।
- সৃষ্টিধর্মী চিন্তাতে সাহায্য করে।

১.৬.২ শিক্ষাক্ষেত্রে নাটকের প্রয়োগ :

নাটক করতে হলে নাটক বাছা খুবই জরুরী। যদিও এক্ষেত্রে শ্রুতিনাটকও করা যেতে পারে। বিশেষ করে অল্প সাজসজ্জা ব্যবহার করে নাটক করা বাঞ্ছনীয়। 'থার্ড থিয়েটার' -এর আঙ্গিকেও নাটক করা যেতে পারে। প্রসেনিয়ম থিয়েটার এখানে করার বিভিন্ন অসুবিধে রয়েছে।

নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপর্ণ কয়েকটি বিষয় নিচে দেওয়া হল।

(ক) নাটকে কোনো বার্তা (Message) অবশ্যই দেওয়া দরকার।

(খ) খরচবহুল কোন নাটক করা যাবে না।

(গ) থার্ড থিয়েটার, ওপেন থিয়েটার ধর্মী নাটক নির্বাচন করা যেতে পারে।

(ঘ) কম চরিত্রের নাটক নির্বাচন করা ভাল।

(ঙ) শ্রুতিনাটক নির্বাচন করা যেতে পারে।

(চ) অল্প পোশাক, মঞ্চ ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপরোক্ত, বিষয়গুলিকে জোর দিয়ে নাটক নির্বাচন করলে ভাল। যেমন-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হাস্যকৌতুক' নাটিকাগুলি এক কথায় অনবদ্য। বিশেষকরে স্কুল, কলেজের অভিনয়ের জন্য উপযুক্ত।

১.৬.৩ প্রথিতযশা নাট্যব্যক্তিত্ব

শম্ভু মিত্র ঃ ভারতবর্ষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, নাট্যকার ও বিশেষ করে বাংলার অন্যতম প্রথিকৃৎ নাট্যবক্তিত্ব। তিনি IPTA (Indian People's Theatre Association) র সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি 'বহুরূপি' নামে একটি নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাকরেন। বাংলার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে এই 'বহুরূপি' নাট্য গোষ্ঠীর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪৮ সালে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। শম্ভুমিত্র তার সহ-পরিচালক ছিলেন। তাঁদের কন্যা শাঁওলী মিত্র-ও বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব। শম্ভু মিত্রের পরিচালনায়—পথিক, ছেঁড়া তার, উলুখাগড়া (নাট্যকার শম্ভুমিত্র), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী', 'বিসর্জন, 'রাজা' ও 'চারঅধ্যায়' আজও জনমানুষের সমোধিক প্রশংসিত, আলোচিত। তাঁর পরিচালনায় এই নাট্যগোষ্ঠীটি বিখ্যাত নাটকগুলির বাংলায় অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করেছে।

সেগুলি দর্শক সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। হেনরি ইবসেন-এর 'পুতুল খেলা' (Doll's House), 'দশচক্র' (An enemy of the People), সোফোক্লেসের রাজা ওডি পাস (Oedipus Rex) তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা চলচিত্রেও তিনি তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত নাট্য ব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের জন্ম 1915 সালের 22শে আগস্ট কোলকাতায়। তাঁর পিতা শরৎ কুমার মিত্র 'জিওলজিক্যাল সার্ভে'-তে চাকরি করতেন। ১৯৯৭ সালের ১৯শে মে এই মহান নাট্যব্যক্তিত্বের প্রয়ান ঘটে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন — (Check your Progress)

(ক) সংগীতের অংশকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

_____

_____

(খ) দুটি সংস্কৃত নাটকের নাম লিখুন।

_____

_____

(গ) বাংলার কয়েকটি লোকনৃত্যের নাম লিখুন।

_____

_____

(ঘ) একটি সমপদী ও একটি বিষমপদী তালের উদাহরণ দাও।

_____

_____

১.৭ পাঠ্যবই ভিত্তিক সমন্বিত শিক্ষণের ধারণা (Textbook based Integrated Approach)

চতুর্থ শ্রেণিতে আমাদের পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা প্রারম্ভে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উল্লেখ করে এই কবিতাটি সুর করে ছাত্র-ছাত্রীদের শোনানো যেতে পারে। আবার বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কবিতাটি পড়াবার সময়ে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যে কবিতাটিতে উল্লেখিত হয়েছে সেটি সুর করে বোঝানো যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের মনে উপাদানগুলির গুরুত্ব ও ধর্ম বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, এতে শিশুরা নিজেকে গড়ে তুলতে উৎসাহ পাবে। এই গানটি গণিতের সাথেও সমন্বিত করা যায়। যেমন — গানের লাইনগুলির শব্দ গোনা, বর্ণ গোনা। (এভাবে প্রথম দু লাইনে কটা শব্দ কটা বর্ণ গুণতে হবে) ক্রমে কবিতার সবকটি লাইনের শব্দ এবং বর্ণ গুনে একত্রিত করা। এরকম করে যোগের ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

নমুনা

শিক্ষক/শিক্ষিকার নাম : বিষয় — সঙ্গীত ভিত্তিক কবিতা

বিদ্যালয়ের নাম— সারদামণি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিশেষ বিষয় — সবার আমি ছাত্র

শ্রেণি — চতুর্থ শ্রেণি অদ্যকার ছড়ার গান — আকাশ আমার .....আপন বেগে চলতে

কাম্য সামর্থ্য — ছন্দ ও তাল সহকারে, বিরামচিহ্নগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে ছড়াটি শিখবে ও ছড়াটি গানের আকারে সুরের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে পারবে এবং বিশেষ অনুভূতির বিকাশ ঘটবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন ধরনের কাজকর্ম দেওয়া হবে যাতে শিশুরা আগ্রহের সঙ্গে শিখবে। পাঠ্যবইয়ের উদাহরণ ব্যবহার করে শিশুদের জ্ঞান নির্মাণে সহায়তা করা হবে।

উপকরণ — বোর্ড, চক, ডাস্টার, হারমোনিয়াম, ছড়ার চার্ট

পাঠ ঘোষণা — আজ আমরা একটি ছড়ার গান শিখব। সমবেতভাবে ছন্দ মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের গানটি শেখানো হবে।

প্রস্তুতি — শিক্ষিকার কাজ — শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে হাসিমুখে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় শ্রেণিবিন্যাস করে ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন এবং শেখাবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন। সকল শিশুর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য আদান প্রদান ভিত্তিক শিখনের পরিকল্পনা করবেন।

- বাড়িতে তোমরা গান শোনো?
- তোমরা কি বাড়িতে গান শেখো?
- কে কে তোমাদের মধ্যে গান করো? ইত্যাদি।

উপস্থাপন — কবিতার বিষয়বস্তু — এই পৃথিবীতে আমরা শুধু লেখাপড়া শিখে বড় হই না। জন্মের পর থেকে মা আর প্রকৃতি উভয়ের অনায়াস সাহচর্যে আমাদের মধ্যে চেতনার উন্মেষ হয়। অনুভব ক্ষমতা তৈরি হয়। পরবর্তীকালে শেখার আলোয় এইসব অভিজ্ঞতাই আমাদের সমৃদ্ধ করে। শিক্ষক/শিক্ষিকা সেইসব বিষয়কে তুলে ধরবেন যা দেখে শিক্ষার্থীরা অনুসরণ ও অনুকরণ করবে এবং এসব থেকে শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ অভ্যাস বা আচরণ প্রভাবিত হবে।

সবার আমি ছাত্র

সুনির্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে।

পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে
দিলখোলা হই তাইরে।
সূর্য আমায় যন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখাল হাসতে মিঠে,
মধুর কথা বলতে।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর,
অন্তর হোক রত্নআকর;
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরনা তাহার সহজ গানে
গান জাগাল আমার প্রাণে,
শ্যামবনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।
বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানানভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।

এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়
শিখছি সেসব কৌতূহলে
সন্দেহ নাই মাত্র।

পাঠদান	শিক্ষক/শিক্ষিকার কাজ	ছাত্রছাত্রীদের কাজ
	শিক্ষক/শিক্ষিকা শৃঙ্খলাপূর্ব্বক গানের উপযোগী শ্রেণীবিন্যাস করে ছড়ার গানটি শেখানোর কাজে অগ্রসর হবেন। ছড়ার চার্টটি টাঙাবেন এবং পরিস্কার উচ্চারণ করে ছন্দের মিল রেখে সুর করে ছড়াটি গাইবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ	শিক্ষার্থীরা ছড়াটি শুনে শুনে বলবে এবং সুর ও ছন্দ সহযোগে ছড়াটি গাইবে।

পাঠদান	শিক্ষক/শিক্ষিকার কাজ	ছাত্রছাত্রীদের কাজ
তাল-দাদরা মাত্রা - ৬	সহকারে শুনতে বলবেন। এরপর শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সমবেতভাবে ছড়াটি গাইতে বলবেন।	ছড়াটি দলগতভাবে গাইবে।
	আজকের ছড়ার গানটি সম্পর্কে শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করে তাদের বোধমুল্যের পরীক্ষা নেবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহ দেবেন।	ছড়ার গানটি শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশ অনুযায়ী একে একে গাইবে অন্যসবাই শুনবে।

মূল্যায়ন— শিক্ষক/শিক্ষিকা এখনকার ছড়ার গানটি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের কিছু প্রশ্ন করবেন	(১) এটা কোন কবির লেখা? (২) কবি কার কার কাছ থেকে শিক্ষা পেলেন?	(১) এটি সুনির্মল বসুর লেখা (২) কবি আকাশ, বায়ু, পাহাড়, সূর্য, মাটি, নদী, ঝরনা ইত্যাদির কাছ থেকে শিক্ষা পেলেন।
	(৩) কে কবিকে মধুর কথা বলতে শেখালো?	(৩) চাঁদ কবিকে মধুর কথা বলতে শিখিয়েছে।
	(৪) গানের কয়টি লাইন আছে? (৫) প্রথম লাইন ও দ্বিতীয় লাইনে মোট কতগুলি শব্দ আছে?	(৪) ৩২টি লাইন আছে। (৫) ৩৬টি শব্দ আছে।
	(৬) কবিতাটির প্রথম ৪টি লাইনে মোট যে শব্দ সংখ্যা আছে ১ থেকে শুরু করে সেই শব্দ সংখ্যা পর্যন্ত কটি মৌলিক সংখ্যা আছে?	(৬) মোট শব্দ সংখ্যা ১৪। ১ থেকে ১৪ র মধ্যে মৌলিক সংখ্যাগুলি হলো ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩ তাই এখানে মোট মৌলিক সংখ্যা ৬টি।
	(৭) কবিতাটির প্রথম চারটি লাইনে মোট যে শব্দসংখ্যা আছে সেই শব্দ সংখ্যাকে ১, ২, ৩, ৪, ৫ দিয়ে গুণ করে কী কী সংখ্যা পেলে? এবার কবিতার প্রথম শব্দ ১ থেকে শুরু করলে সেই গুণফল সংখ্যাগুলির শব্দগুলি লেখ।	(৭) প্রথম অংশ : ১৪, ২৮, ৪২, ৫৬, ৭০ দ্বিতীয় অংশ : পাইরে, হই, কথা, বেগে, দীক্ষা

বোর্ডের কাজ

ছন্দ : ৩/৩

১	২	৩	৪	৫	৬	
ধিন্	ধিন্	না	না	থুন্	না	ধিন্
+			০			+

গৃহকাজ/পুনরানুশীলন — শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের গানের প্রশংসা করে বোর্ড মুছে উপকরণ তুলে ক্লাসটি শেষ করবেন।

'খরবায়ু বয় বেগে' এই গানটিকে অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে সমন্বিত করার একটি উদাহরণ

নৌকার ছবি, 'খরবায়ু বয় বেগে' গানটি অংশবিশেষ লেখা আর্টপেপার। নৌকা চালানোর ছবি।

নিরীক্ষণ : OBSERVATION — নৌকার ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন। নৌকা চালানোর ছবি দেখিয়ে মাঝি, বৈঠা, মাঝির অবস্থান সম্পর্কিত প্রশ্ন। 'খর বায়ু বয় বেগে...' গানটি লেখা দেখানো। — অংশগ্রহণ

পূর্বসূত্র স্থাপন : CONTEXTUALIZATION — বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে পাঠে প্রবেশের প্রবেশদ্বার খোলা। যেমন :— — প্রশ্ন ও অনুসন্ধান

১। তোমরা নৌকায় কে কে চড়েছ? কেমন মজা?

২। নৌকা কারা চালায়? তাদের হাতে কী থাকে? কেমন করে চালায়?

৩। নৌকা চালানোর সময় মাঝিরা কি মুখে কোনো শব্দ করে?

৪। তোমাদের পাঠ্যবইয়ের একটি গানে নৌকা চালানোর কথা আছে। কোন গানে বলতে পারবে?

৫। কেউ কি কখনো নৌকা চালিয়েছ?

জ্ঞানগত শিক্ষানবিশি : COGNITIVE APPRENTICESHIP : — বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ক্ষেত্র উন্মোচন। যেমন : — প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা

১। বলতো নৌকা কী বস্তু দিয়ে তৈরি হয়?

২। নৌকা জলে ডোবে না কেন? জলে আর কী কী ভাসে?

৩। বৈঠা কী দিয়ে তৈরি?

৪। নৌকা চালাতে গেলে শরীরের কোন অংশ কাজ করে? ইত্যাদি

শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশে শিক্ষার্থীরা দলে দলে ভাগ হয়ে বসে নৌকা চালানোর কৌশল, নৌকা চালানোর গান, মাঝিদের শ্রম-জীবিকা, একে অপরের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়ে আগ্রহী হবে।

শিক্ষক/শিক্ষিকা বলবেন— এবার তোমরা আর্টপেপারের লেখাটি পড়ো। যে যে গানটি গাইতে পারে, সে সে গাও। আমার সাথে সবাই মিলে গানটি গাও। 'খর বায়ুবেগে বয় চারিদিক ছায় মেঘে/ওগো নেয়ে নাও খানি বাইও।
তুমি কষে ধরে হাল,/আমি তুলে বাঁধি পাল/হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।'

সহযোগ : COLLAB-ORTION — শিক্ষক/শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের গানটি গাইতে সহযোগিতা করবেন ও গানটির অর্ন্তনিহিত অর্থ বুঝতে সাহায্য করবেন। — সমানুভূতি ও সহযোগিতা

ব্যাখ্যা ও নির্মাণ INTERPRETATION CONSTRUCTION — সমানুভূতি ও সহযোগিতা

ব্যাখ্যা ও নির্মাণ

INTERPRETATION CONSTRUCTION

সমানুভূতি ও সহযোগিতা

চলো এবার আমরা মাঠে যাই। মাঠে প্রবেশের পর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে শিক্ষক/শিক্ষিকা সাহায্য করবেন। চলো এবার বৃত্ত করে দাঁড়াও। চলো আমার সাথে। শিক্ষক/শিক্ষিকা মজা করে সাপের মতো জিগ্‌জ্যাগ্‌ করতে করতে বৃত্ত রচনা করবেন। এবার থামো। হাতে হাত ধরো। বলো—, 'হাত ধরি ধরি, গোল বড়ো করি, হাত শক্ত করি, হাত ছাড়ি ছাড়ি।'

এবার সকলে মাটিতে বসে পড়ে সামনের দিকে দুই পা টান টান করে মেলে দাও। শিক্ষক/শিক্ষিকা মাঝখানে গিয়ে অনুরূপভাবে বসবেন। ভেবে নাও আমরা সকলেই এখন মাঝি। নৌকায় বসে আছি। জলে নৌকা ভাসছে। আমরা বৈঠা হাতে তুলে নিচ্ছি। নৌকা দুলছে। এবার নৌকা চালাব। তোমরা আগে দেখে নাও, আমি কীভাবে বৈঠা বাইছি। শিক্ষক/শিক্ষিকা বেশ কয়েকবার 'কার্ড ৪'-এর বিষয় অনুসরণ করে অনুকরণটি করে দেখাবেন। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দেবেন। শিক্ষার্থীরা নৌকা চালানোর পদ্ধতি অনুকরণ করে নৌকা চালানোর ভঙ্গিমা করবে। কিছুটা রপ্ত হয়ে যাওয়ার পর 'খর বায়ু বয় বেগে...' গানটির সাথে তালে তাল মিলিয়ে নৌকা চালানোর ভঙ্গিমা করবে।

বহুমুখী ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা

MULTIPLE INTERPRETATION AND MULTIPLE MANIFESTATION

ব্যাখ্যা ও নান্দনিকতা

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিকল্প মাধ্যমে (MULTIPLE MANIFESTATION) পঠিত বিষয়টি উপস্থাপনা করবে! - চার্ট, ছবি, লেখচিত্র, মডেল, Role Play নাটক, মুকাভিনয়, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদিতে বিকল্প ও অতিরিক্তভাবে সক্রিয়তা উদ্ভাবন করবে ও সম্পাদন করবে। নৌকা চালানোর বিভিন্ন আচার ও বিভিন্ন ঘটনাকে সমাজজীবনের প্রতিটি প্রেক্ষাপটে যুক্ত করে নিতে সমর্থ হবে। শিক্ষার্থীরা এর মধ্য দিয়ে বুঝতে পারবে যে তারা যে কাজ করছে তারই মধ্যে দৃঢ়ভাবে নিহিত একটি সাধারণ নীতি ক্রমশ উপস্থাপিত হচ্ছে। যেমন—

১) বাস্তবে যে কোনো পরিস্থিতিতে নৌকা চালানোর একান্ত প্রয়োজন হলে নৌকা চালাতে সমর্থ হবে।
২) নাটক বা মুকাভিনয়ে মাঝির ভূমিকায় নিখুঁতভাবে অভিনয় করতে সমর্থ হবে।
৩) পর্যায়ক্রমিক নৌকা চালানোর বিভিন্ন ভঙ্গীর চিত্র অঙ্কন করতে সমর্থ হবে।
৪) মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলির কাজ সম্পর্কে জানাতে সক্ষম হবে।
৫) নৌকা চালানোর ক্রমশ উপস্থাপিত সাধারণ নীতিটি অনুধাবন করতে পারবে।

আচ্ছা বলোতো দেখি, কেন আমরা এই নৌকা চালানোর অনুকরণের খেলাটি খেলছি? ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যাসহ উত্তর দেবার চেষ্টা করবে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা সঠিক উত্তরদানে সহায়তা করবেন।

বহুমুখী ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনা

MULTIPLE INTERPRETATION AND MULTIPLE MANIFESTATION

ব্যাখ্যা ও নান্দনিকতা

নৌকা চালানোর অনুকরণ জাতীয় খেলাটি অনুশীলন করতে করতে শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে নিজের দলের মধ্যে বা অন্যান্য দলের সঙ্গে লিখিত পাঠ বা ব্যাখ্যা বা দুটোকেই কাজে লাগিয়ে নিজেদের ব্যাখ্যার পক্ষে যুক্তি দেবে ও যুক্তি প্রমাণে তথ্যসহ ব্যাখ্যা দেবে। উত্তর সন্ধানে বিভিন্ন উপায়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নৌকা কেন জলে ভাসে, নৌকার বিশেষ গড়নও যে নৌকার জল কেটে চলার উপযোগী তা তারা বুঝবে এবং নৌকার গড়ন এর সঙ্গে মাছ-এর দেহের আকৃতিরও বেশ কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাবে যা কিনা মাছকে জল কেটে সামনের দিকে এগোতে সাহায্য করে এবং এর থেকে তারা মানুষের সাঁতার কাটার পদ্ধতিটিকে ব্যাখ্যা করতে শিখবে এবং মানুষের দেহের গঠন সৌষ্ঠবকে সাঁতার কাটার উপযোগী করে তুলতে উৎসাহী হয়ে উঠবে।

১.৮ সারসংক্ষেপ (Let us sum up)

এই অধ্যায়ে নাটক, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, পাপেট, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা-র সম্পর্কে ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই শিল্পগুলি কিভাবে করব তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১.৯ অনুশীলনী (Excercises)

(ক) দুইজন গ্রীক নাট্যকারের নাম লিখুন।

(খ) একজন প্রথিতযশা বাদ্যযন্ত্র শিল্পীর সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(গ) একজন বাংলার প্রথিতযশা সংগীতজ্ঞের অবদান সম্পর্কে লেখ।

(ঘ) বিভিন্ন আঙ্গিকের থিয়েটার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ঙ) প্রাথমিক থেকে উচ্চপ্রাথমিকে নৃত্যশিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১.১০ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-এর উত্তর - ১ (Answer check your progress - 1)

(ক) চারটি অংশ। স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ।

(খ) কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

(গ) বাউল, ছৌ, ঝুমুর, রায়বেঁশে।

(ঘ) সমপদী তাল— দাদরা

বিষমপদী তাল— ঝাঁপতাল

পাঠ একক — ২
চারুশিল্প (Visual Art)

২.১ সূচনা: **(Introduction)**

২.২ উদ্দেশ্য **(Objectives)**

২.৩ ড্রয়িং ও পেন্টিং **(Drawing and Painting)**

- ২.৩.১ বিভিন্ন বস্তুর ত্রিমাত্রিক আকার
- ২.৩.২ কম্পোজিশন **(Composition)**
- ২.৩.৩ চারুশিল্পের বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপাদানের ব্যবহারিক প্রয়োগ
- ২.৩.৪ বিভিন্ন ধরনের বাংলা ও ইংরাজী অক্ষর লিখন

২.৪ কোলাজ

২.৫ কাগজের কাজ

- ২.৫.১ কাগজ কাটা **(Paper cutting)**
- ২.৫.২ অরিগামি
- ২.৫.৩ পেপার ম্যাসে **(Paper Mache)**
- ২.৫.৪ কাগজ ও কার্ডবোর্ডের কাজ

২.৬ মাটির কাজ

- ২.৬.১ ত্রিমাত্রিক বস্তু তৈরি
- ২.৬.২ রিলিফের কাজ বা মাটির ফলকের কাজ
- ২.৬.৩ মাটির খেলনা, ফল, পশু ইত্যাদি তৈরি

২.৭ ছাপাচিত্র **(Graphics)**

- ২.৭.১ উডকাট বা লিনোকাট
- ২.৭.২ আলু বা ঢেঁড়সের ছাপ
- ২.৭.৩ স্টেনসিল
- ২.৭.৪ আঙুলের ছাপ ও হাতের ছাপ
- ২.৭.৫ মনোপ্রিন্ট

২.৮ সারসংক্ষেপ **(Let us sum up)**

২.৯ অনুশীলনী **(Exercise)**

২.১০ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—এর উত্তর **(Answer to check your progress)**

২.১ সূচনা (Introduction) ঃ

মানুষের মনের অন্তরালে ফুটে ওঠা রসানুভূতির বর্হিঃপ্রকাশ হল শিল্প। যা ভাবানুভূতির রূপ, রঙ, ছন্দ ভারসাম্যের সমন্বয়ে নান্দনিক রূপ নিয়ে থাকে। হৃদয়গহ্বরে যে রূপ, রঙ, আনন্দ, বেদনা ইত্যাদি ভাবনা অনুভূতির ফল্গুধারা প্রবাহমান তাকে তরঙ্গায়িত করে সকলের সামনে উপস্থাপিত করে শিল্প।

আমরা যখন 'শিল্প' শব্দটি উচ্চারণ করছি, তখন নির্দিষ্টভাবে শিল্পের কোন একটি বিশেষ মাধ্যমকে ধরে নিলে ভুল হবে। শিল্প বলতে ব্যাপক বিষয়কেই বোঝায়। শিল্প রুচি ও শিল্পবোধের ব্যবহার আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান। প্রকৃতি ও বাস্তবতা শিল্পের উৎস এবং শিল্পবোধ ও শিল্পসৃষ্টি করার ক্ষমতা মানুষের স্বাভাবিক ও জন্মগত। শুধুমাত্র প্রকাশ করার মাধ্যমগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তা সাহিত্য, চারুশিল্প, নাটক, কবিতা ইত্যাদি হয়।

চিত্র কাকে বলে ?

এক কথায় চিত্র অর্থে আমরা বুঝি নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যে চিত্রিত করা কোনো একটি ধারণার দ্বিমাত্রিক রূপকল্প। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'চিত্র একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, ততই সে হয় একান্ত। ততই সে হয় ভালো। তার (ছবি) ভাল মন্দের অপর কোন যাচাই হতে পারে না।'

চিত্র বলতেই দ্বিমাত্রিক বস্তুকেই বোঝায়। চিত্র মাত্রেই কোন কোন দৃশ্য বস্তুর পুনঃ নিয়ন্ত্রণ বা পুনঃ সংগঠন ক্রিয়া (re-arrangement and re-organisation) কে বোঝায়। একই সঙ্গে দৃশ্যবস্তুর নির্দিষ্ট সীমায়নে, সমগ্র পরিধিকে একটি নির্দিষ্ট frame-এর মধ্যে আবদ্ধ করে। চিত্র মাত্রেই সাধারণত একটি মূল কেন্দ্রবিন্দু (focal point) থাকবে এবং সেই কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে অন্যান্য উপাদানগুলির সমাবেশ ঘটবে। সর্বোপরি বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সু-সংহত ঐক্য (unity/Harmony) সৃষ্টি হবে।

সাধারণ রেখা চিত্র থেকে জল রঙ, প্যাস্টেল, টেম্পারা, তেল রঙ প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমে, বিভিন্ন (surface)-চিত্রাঙ্কন হয়ে থাকে। মাধ্যমগত তারতম্যের উপর স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

ভাস্কর্য ঃ

ভাস্কর্য একটি ত্রিমাত্রিক বস্তুচিত্র অপেক্ষা শ্রমসাধ্য সৃষ্টি হলেও, একটি ভাস্কর্য অনেক বেশী concrete imagery এবং দর্শক মনে বস্তু সদৃশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। কেবল তাই নয়, ভাস্কর্য কলার ত্রিমাত্রিক গুণের দরুণ দর্শক মনে তা স্থায়ী impact তৈরী করে। ভাস্কর্য দৃশ্যত চিত্র অপেক্ষা গতিশীল। স্থায়ীত্ব অনেক গুণ বেশী। চিত্রের আকর্ষণ একদিকে ভাস্কর্যের আকর্ষণ ও শিল্প গুন চতুর্দিক থেকে। ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রিকতা, surface values, বস্তুর গঠন ও গড়ন, plasticity, বস্তু সদৃশ textual quality, প্রাণবন্ততা চিত্র অপেক্ষা বেশী।

স্থাপত্য ঃ

একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে কার্যকরী ও প্রয়োজন উপযোগী ত্রিমাত্রিক রূপ সৃষ্টি করা। স্থাপত্যকলার দ্বৈত শর্ত সৌন্দর্য্য ও ব্যবহারিক দিক। অর্থাৎ স্থাপত্যের দুটি স্তর আছে। একটি তার নক্সার দিক, অন্যটি তার নির্মাণের দিক।

চারুশিল্প ও কারুশিল্প ঃ

এ দু'ধরনের শিল্প কতকগুলি বস্তু অর্থাৎ রঙ, কাগজ, ক্যানভাস, তুলি, কাপড়, মাটি, কাঠ, পাট, বোর্ড ইত্যাদির মধ্যে আবদ্ধ। চারুশিল্প মনের তাগিদে তৈরি হয়, কিন্তু কারুশিল্প বাজারে বিক্রীর চিন্তা করে তৈরি হয়। Idea ও Skill -ই এ দু'টি শিল্পে উপস্থিত। আদিমযুগে চারু ও কারুশিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। একটা সময়ের পরে এই পার্থক্য প্রকট হল। চারুশিল্প বলতে চিত্র, ভাস্কর্য, ছাপাইচিত্র প্রভৃতি বোঝায়। আবার কারুশিল্প বলতে পটচিত্র, পটশিল্প, টেরাকোটা প্রভৃতিকে বোঝায়।

চারু বা কারু যাই করি না তাতে হাতে কলমে কাজ করা জরুরী। যেমন টেরাকোটা অর্থাৎ পোড়ামাটির শিল্প চারুশিল্পে ব্যবহৃত হয়, আবার অন্যদিকে কারুশিল্পেও ব্যবহৃত হয়। এরজন্য কতকগুলি বিশেষ করণকৌশলের প্রয়োজন হয়। হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে এই করণকৌশল শেখা যায়।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

- হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে চারু ও কারুশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- চারু ও কারু শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধি।
- প্রত্যেকটা কাজের আলাদা করণকৌশল ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- চারু ও কারুশিল্পের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার।

২.৩ (Drawing and Painting) ঃ

ছবি আঁকতে গেলে তার প্রাথমিক ধারণা থাকা অবশ্যই জরুরী। প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে ছবি আঁকা যায় না। যেমন ছবিতে পরিপ্রেক্ষিতের (perspective) ধারণা ছাড়া বস্তুর কাছে দূরে বোঝানো যায় না। ছবিতে ঘনত্ব বোঝাতে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) প্রয়োজন। ছবির বিন্যাস (composition) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ছবি আঁকতে নিম্নলিখিত চারটি ধারণা থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

(ক) অনুপাত (Scale and Proportion)

(খ) পরিপ্রেক্ষিত (Perspective)

(গ) আলো-ছায়া (Light and Shade)

(ঘ) বিন্যাস (Composition)

(ক) অনুপাত (Scale and Proportion)

ছবিতে এক বস্তুর সঙ্গে অন্যবস্তুর অনুপাতের সম্পর্কে জানা অবশ্যই দরকার। যেমন একটা বোতলের সঙ্গে গ্লাসের অনুপাতের সম্পর্ক। বোতলের পরিমাপ হওয়া উচিত মোটামুটি দুটি গ্লাসের সমান। অনুপাত ছাড়া ভালো ছবি আঁকা যায়

না। একটা কুকুরের যে পরিমাপ হবে, একটা বেড়ালের পরিমাপ তার থেকে কম হবে। আবার একটা ইঁদুর তার থেকে আরও ছোট হবে। এইভাবে অনুপাত ছবিতে প্রয়োজন হয়।

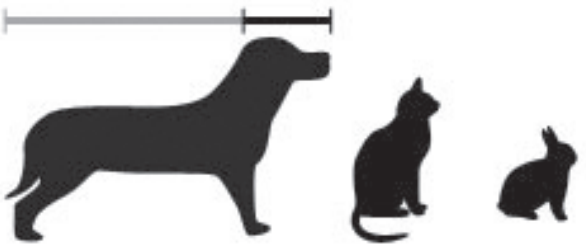

(খ) পরিপ্রেক্ষিত (Perspective)

ছবিতে পরিপ্রেক্ষিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও অনেকে অনুপাতের সঙ্গে পরিপ্রেক্ষিত এক করে ফেলে। এই দুটি সম্পূর্ণ আলাদা। পরিপ্রেক্ষিত বলতে সামনের বস্তু বড় এবং দূরের বস্তু ছোট। একটা বস্তুকে সামনে যত বড় দেখাবে, যত দূরে যাবে তত ছোট হতে থাকবে। বিশেষকরে ছবিতে ঘনত্ব আনতে পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার করতে হবে। নিচের ছবিতে কয়েকটা বাড়িতে সামনে থেকে দূরে দেখানো হল।

পরিপ্রেক্ষিতের ক্ষেত্রে দিগন্তরেখা (Horizontal line), বিলীয়মান বিন্দু (Vanishing point), eye-level এসবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন নিচে একটা বাক্সকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখানো হল।

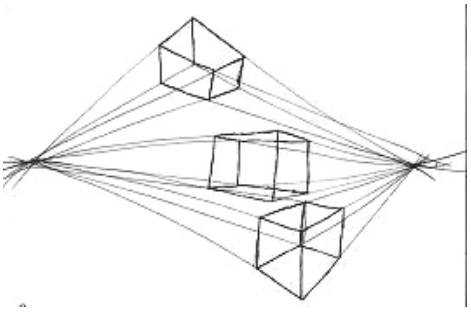

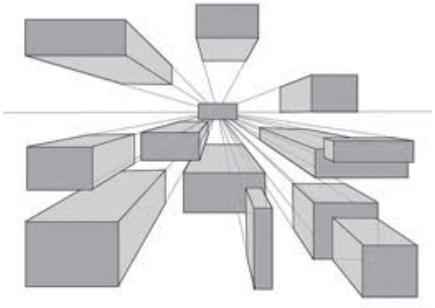

একটা বস্তুকে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন রকম দেখায়। বস্তুটিকে উপর থেকে দেখলে যে রকম দেখাবে, নীচ থেকে আরেক রকম। দেখার জায়গা পাল্টে গেলে বক্সের দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়।

(গ) আলো-ছায়া (Light and Shade)

আলো-ছায়া (Light and Shade) ছবি আঁকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা যখন কোন বস্তু দেখি তার মধ্যে আলোছায়া অবশ্যই থাকবে। আলোর উৎস যদি সূর্য হয়। তাহলে সূর্য যেদিকে থাকবে সেই অংশে আলো থাকবে। উল্টোদিকের অংশে ছায়া থাকবে। ড্রইংয়ের পাশাপাশি আলোছায়ার মাধ্যমে ছবির ঘনত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আলোছায়ার মাধ্যমেই ছবির দৃশ্যগত বিভ্রম তৈরি করা হয়। নিচে আলোছায়াযুক্ত একটি বস্তুর ছবি দেওয়া হল।

(ঘ) বিন্যাস (Composition)

ছবির ক্ষেত্রে বিন্যাস (Composition) -এর গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনো ভালো ছবি আঁকতে গেলে ছবিটাকে ঠিকভাবে সাজানো দরকার। এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে। (১) ভারসাম্য (Balance) (২) কেন্দ্রবিন্দু (focus) (৩) সমন্বয় (Unity)

উপরোক্ত, তিনটি বিষয় ছবির বিন্যাস বা Composition-এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

ভারসাম্য (Balance) ঃ ছবির মধ্যে form বা আকার, রঙ, বিষয়ের ভারসাম্য (Balance) থাকা জরুরী। ছবিতে ভারসাম্য ছাড়া ছবির বাঁধন অসম্পূর্ণ থাকে। নীচের চিত্রটিতে ভারসাম্য (Balance) দেখানো হয়েছে।

কেন্দ্রবিন্দু (focus) ঃ প্রত্যেক ছবিতে নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু থাকে। যখন কোনো ছবি দেখি তাতে নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে চোখ আটকে যায়। একে ঘিরে সমস্ত ছবি আবর্তিত হয়।

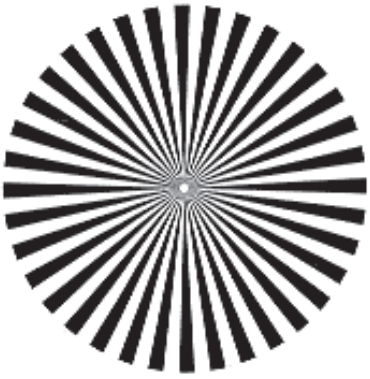

সমন্বয় (unity) ঃ ছবিতে ভারসাম্য, কেন্দ্রবিন্দুর পাশাপাশি সমন্বয় বা (unity) খুবই প্রয়োজনীয়। একটা রঙ, আকার, বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় (unity) অবশ্যই থাকবে।

২.৩.১ বিভিন্ন বস্তুর ত্রিমাত্রিক আকার

উপকরণ ঃ আর্টপেপার, পেন্সিল, রবার, ড্রইংবোর্ড, ক্লীপ, রঙ (প্যাস্টেল, বিভিন্ন শেডের পেন্সিল, পোষ্টার রঙ)

পদ্ধতি ঃ একটা আর্টপেপারের ১/৪ ভাগ অংশ নিয়ে তার উপর যে কোনো একটি বস্তুর ত্রিমাত্রিক ড্রইং করতে হবে। সেই বস্তুকে আলোছায়া ধরে পেন্সিল শেড বা রঙ ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক রূপ প্রকাশ করা। ছবির মধ্যে Light and shade, Perspective ইত্যাদি ব্যবহার করে বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপ পরিস্ফুট করতে হবে। যেমন কোন ফল আঁকলে তার রঙ, আলোছায়া ধরে আঁকতে হবে। প্রয়োজনে বস্তু সামনে বসিয়ে দিয়ে তা দেখে ছবি আঁকতে হবে। যাকে ছবির ভাষায় Still life বলা হয়। এতে রঙ, আলোছায়া, বিন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে।

উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন বস্তু অর্থাৎ ফল, ফুল, জ্যামিতিক আকার, ফুলদানি, গ্লাস, পাখি, মাছ, মানুষ ইত্যাদি সম্পর্কে আঁকার ধারণা।
- আলোছায়া ব্যবহার করে ত্রিমাত্রিক ধারণা।

২.৩.২ কম্পোজিশন (Composition)

উদ্দেশ্য ঃ

- প্রাকৃতিক দৃশ্যকে আঁকার মাধ্যমে রপ্ত করা।
- ছবির সামনে, পেছনে বিভিন্ন গভীরতা সম্পর্কে ধারণা।
- ছবির বিন্যাস (Composition) সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

উপকরণ ঃ আর্টপেপার, তুলি, রঙ, প্যালেট, জলের পাত্র, বোর্ড, পেন্সিল, রবার, ক্লীপ ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ একটি ১/৪ ভাগ আর্টপেপারে পেন্সিল দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য বা নদী নিয়ে দৃশ্য বা পাহাড়ের দৃশ্য এঁকে নিতে হবে। তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী রঙ ব্যবহার করতে হবে। প্যাস্টেল বা জল রঙ যে কোনো রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার অস্বচ্ছ রঙ ব্যবহার করে ছবিগুলি রঙ করা যেতে পারে।

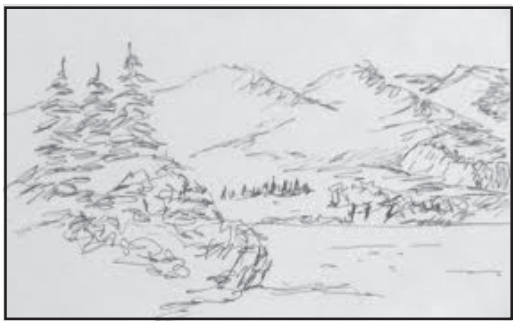

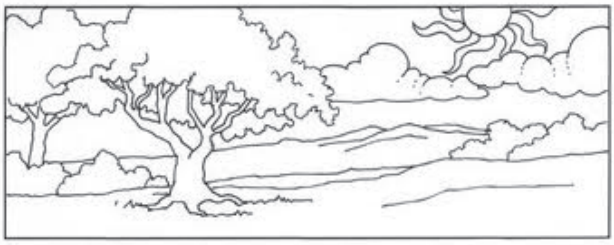

রঙের প্রয়োগ

উপরোক্ত ছবি আঁকার ক্ষেত্রে রঙ ব্যবহার করলে রঙ সম্পর্কে জানা দরকার। রঙ দুই প্রকারের হয়।

(১) প্রাথমিক বা মৌলিক রঙ

(২) মিশ্র বা যৌগিক রঙ

প্রাথমিক রঙ ঃ যে রঙ অন্য কোনো রঙের দ্বারা প্রভাবিত নয় এবং নিজস্বতা আছে, তাকে প্রাথমিক রঙ বলে। প্রাথমিক রঙ তিনটি — লাল, নীল, হলুদ।

মিশ্র রঙ ঃ দুই বা ততোধিক রঙের মিশ্রণে যেসব রঙ উৎপন্ন হয় তাকে যৌগিক বা মিশ্র রঙ বলে। যেমন — কমলা, সবুজ, বেগুনী ইত্যাদি।

বর্ণচক্র

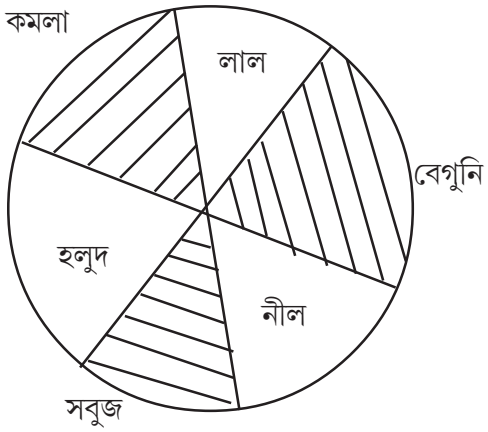

বর্ণচক্রে তিনটি প্রাথমিক রঙের সংমিশ্রণে মিশ্র রঙগুলি তৈরি হয়েছে।

যেমন — লাল + নীল = বেগুনী

নীল + হলুদ = সবুজ

লাল + হলুদ = কমলা

এছাড়া কিছু মিশ্র রঙ নিচে দেওয়া হল—

নীল + সাদা = আকাশি

লাল + সাদা = গোলাপি

লাল + কালো = খয়েরি

কালো + সাদা = ধূসর

নীল + কালো = কালচে নীল

নীল + সবুজ = গাঢ় সবুজ

লাল + খয়েরি = বাদামি

এইভাবে রঙগুলির সঙ্গে সাদা মেশালে হাল্কা এবং কালো মেশালে গাঢ় রঙ পাওয়া যায়।

পরিপূরক রঙ বা বিপরীত রঙ

বর্ণচক্রে দুটি প্রাথমিক রঙের সংমিশ্রণে একটি মিশ্র রঙ উৎপন্ন হচ্ছে। ঐ দুটি প্রাথমিক রঙ বাদে তৃতীয় প্রাথমিক রঙটি উৎপন্ন রঙের পরিপূরক বা বিপরীত রঙ। যেমন—

লাল ⟶ সবুজ (নীল + হলুদ)

হলুদ ⟶ বেগুনী (লাল + নীল)

নীল ⟶ কমলা (লাল + হলুদ)

উষ্ণ রঙ (Warm colour)

যে রঙগুলি উজ্বল এবং চোখের পীড়াদায়ক সেগুলিকে উষ্ণ রঙ বলা হয়।

যেমন — লাল, হলুদ, কমলা ইত্যাদি রঙ।

শীতল রঙ (Cool colour)

যে রঙগুলি অপেক্ষাকৃত কম উজ্বল এবং চোখের পক্ষে আরামদায়ক সেগুলি শীতল রঙ বলা হয়। যেমন— নীল, সবুজ ইত্যাদি রঙ।

ছবি আঁকতে হলে বর্তমান বাজারে যে সব রঙ পাওয়া যায়। তার সঠিক নাম জানলে সঠিক রঙ পাওয়া যাবে। এইসব রঙের নাম বেশিরভাগ রঙের উৎস অনুযায়ী হয়েছে অর্থাৎ পাথর, ধাতু যেখান থেকে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন রঙের নাম নীচে দেওয়া হল।

লাল ঃ ভারমিলিয়ন,স্কারলেট, ক্রিমসন, রোজ ম্যাটার, কারমাইন।

নীল ঃ ইন্ডিগো, কোবাল্ট ব্লু, আলট্রামেরিন ব্লু, প্রুশিয়ান ব্লু, সেলুলীয়ন ব্লু।

হলুদ ঃ লেমন ইয়েলো, ক্রোম ইয়েলো, ক্যাডমিয়াম ইয়েলো, ইয়েলো অকার, গ্যামবোজ, নেপেলস্ ইয়েলো।

সবুজ ঃ ভিরিডিয়ন গ্রীন, স্যাপ গ্রীন, হুকারস্ গ্রীন, ক্রোম গ্রীন, টেরাভার্ট।

খয়েরি ঃ বার্ন আম্বার, র আম্বার, বার্ন সিয়েনা, র সিয়েনা, সিপিয়া, ইন্ডিয়ান রেড, লাইট রেড।

রঙের গুঁড়ো (pigment) সংগ্রহ করে আঠা মিশিয়ে রঙ তৈরি করে নেওয়া যায়।

তুলির ব্যবহার

তুলি বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায়। তেল রঙের ছবি আঁকার জন্য Hog hair। আবার জলরঙ করার জন্য Sabale hair। আমরা এখানে Sabale hair-এর তুলিই ব্যবহার করব। Sabale hair-এর মধ্যে দু'রকম তুলি পাওয়া যায় (১) Round hair (২) Flat hair । Round hair-এর ক্ষেত্রে সরু লাইন টানার জন্য ডাবল বা ট্রিপল জিরো লাগবে এবং যত উপরেরদিকে উঠব তত মোটা হবে যেমন ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ইত্যাদি। Flat hair-এর ক্ষেত্রে দু'রকম তুলি পাওয়া যায় — (১) লম্বা হাতল (২) ছোট হাতল। লম্বা হাতল Flat hair-এর ক্ষেত্রে ১ থেকে ১৮ বা ২০ অবধি তুলি পাওয়া যায়। ছোট হাতল Flat hair-এর ক্ষেত্রে তুলি ১/৪ ইঞ্চি থেকে ৩ ইঞ্চি অবধি পাওয়া যায়।

২.৩.৩ চারু শিল্পের বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপাদানের ব্যবহারিক প্রয়োগ (Experementation with diffrent methods and materials of visual arts)

চারু ও কারু শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যবহার দেখা যায়। মাধ্যমের তারতম্যের জন্য ছবি বা হস্তশিল্পেরও রকমফের ঘটে। যেমন একটি ঘোড়া কাঠ দিয়ে তৈরি হলে তার যেরকম সংবেদনশীলতা পাওয়া যায়, অন্যদিকে মাটি দিয়ে তা তৈরি করলে তা আরেকরকম। মাধ্যম চারু ও কারু শিল্পের ক্ষেত্রে এক অন্যতম হাতিয়ার। নিচে বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

প্যাস্টেল (Pastel)

প্যাস্টেল একটি অস্বচ্ছ মাধ্যম। এটি খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। প্যাস্টেল দেখতে চকের মতো হয়। মাত্র ২০০ বছর আগে থেকে এর ব্যবহার শুরু হয়। অষ্টাদশ শতকে প্রতিকৃতি আঁকার জন্য প্যাস্টেল ব্যবহৃত হত। এই রং মাখনের মতো মসৃণ, নরম এবং উজ্জ্বল হয়। রঙের গুঁড়োকে রেজিন বা আঠার (weak gum) সঙ্গে মিশিয়ে লেই তৈরি করা হয়। তারপর তা চকের আকারে তৈরি করে রাখা হয়। প্যাস্টেল শিল্পীদের খুব জনপ্রিয় মাধ্যম। তুলোস, লোত্রেক, দ্যেগাঁ, রেনোয়াঁ সেঁজান প্রমুখ শিল্পী এই মাধ্যমে ছবি এঁকেছেন। অনেক রকম রঙের shade প্যাস্টেলে পাওয়া যায়। বর্তমানে বাজারে ১২, ২৪ ও ৪৮ shade-এর প্যাস্টেল পাওয়া যায়। প্যাস্টেল রং তিন ধরনের পাওয়া যায়—

(১) Soft Pastel বা Dry Pastel

(২) Medium Pastel

(৩) Hard Pastel

প্যাস্টেল ব্যবহারের পদ্ধতি

- প্যাস্টেল দিয়ে ছবি আঁকতে গেলে সঠিক কাগজ নির্বাচন প্রয়োজন। অমসৃণ বা খসখসে কাগজই সব থেকে প্যাস্টেল রং করার পক্ষে উপযুক্ত। এ ধরনের কাগজে রং ভালোভাবে ধরে। বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন রঙের প্যাস্টেল পেপার কার্টিজ কাগজ প্যাস্টেল রঙের পক্ষে সবথেকে ভালো।
- যে-কোনো বিষয় সরাসরি প্যাস্টেল রং দিয়ে ড্রয়িং করা যায়। পেনসিল দিয়ে ড্রইং প্রয়োজনে করা হয়।
- বিভিন্ন রকম Stroke প্যাস্টেলে ব্যবহার করা হয়। যেমন— cross stroke, alternating stroke, Diagonal stroke প্রভৃতি।
- Dry প্যাস্টেলে আঙুল দিয়ে মিশিয়ে ছবি আঁকা হয়।
- Dry প্যাস্টেলে fixative ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। না হলে ছবির রং নষ্ট হয়ে যাবে।
- ছবি সংরক্ষণ করতে হলে কাচ দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলা ভালো।

প্যাস্টেলের বৈশিষ্ট্য

- রং সুন্দরভাবে মেশানো যায়।
- তাৎক্ষণিক পোট্রেট আঁকার ক্ষেত্রে Dry pastel সব থেকে উপযুক্ত।
- জলরং, টেম্পার প্রভৃতি মাধ্যমের ওপর প্যাস্টেল সহজেই ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ Mix-media হিসেবে প্যাস্টেল সব থেকে ভালো।
- Oil painting ছবি আঁকার আগে Dry pastel দিয়ে ড্রয়িং করা যায়।
- এক্ষেত্রে লাইট টু ডার্ক এবং ডার্ক টু লাইট দুটোই ব্যবহার করা যায়।

প্যাস্টেলের সুবিধা

- স্বল্প খরচে ছবি আঁকা যায়।
- দ্রুততার সঙ্গে ছবি আঁকা যায়।
- ড্রয়িং-এর ক্ষেত্রে ভুল হয়ে গেলে ব্যবহৃত Dry pastel মুছে ফেলা যায়।
- আউটডোর স্টাডি করতে হলে শুধুমাত্র প্যাস্টেলের বাক্স নিলেই রঙের কাজ করা যায়।
- শিশুরা সহজেই প্যাস্টেল ব্যবহার করতে পারে।

প্যাস্টেলের অসুবিধা

- কাগজে Texture একবার প্যাস্টেল রঙে আটকে গেলে তারপর আর রং ধরতে চায় না।
- সংরক্ষণ করতে অসুবিধা হয়।

- দীর্ঘদিন ছবি অবিকৃত অবস্থায় থাকে না। অন্যমাধ্যমের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী।
- Dry pastel-এ fixative ঠিকমতো ব্যবহার না করলে ছবি নষ্ট হয়ে যায়।

যদি fixative বেশি হয়, তাহলে প্যাস্টেলে pigment এলোমেলো হয়ে যাবে। কম হলে হাত বা কিছুর সাহয্যে ঘষা লাগলে উঠে যাবে।

প্যাস্টেলে উল্লেখযোগ্য ছবি

তুঁলোস লোত্রেকের 'Jane Avril Dancing'.

জল রং (Water Colour)

জলরং বলতে জলের সঙ্গে রং মিশিয়ে ছবি আঁকা বোঝায়। সেক্ষেত্রে টেম্পারা, গোয়াশ, পোস্টার কালার জলরঙের মধ্যে পড়ে যায়। কারণ এইসব মাধ্যমের ক্ষেত্রে জল ব্যবহার করা হয়। জল ব্যবহার করে দু-রকম ছবি করা হয়।

(১) স্বচ্ছ জলরং অর্থাৎ Transparent water colour

(২) অস্বচ্ছ জলরং অর্থাৎ Opaque water colour

জলরঙের সংজ্ঞা :

যে রং জলের সাথে মিশিয়ে স্বচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়, তাকেই জলরং বলে অর্থাৎ জলরং বলতে Transparent বা স্বচ্ছ জলরংকে বুঝি। বাজারে দুধরনের জলরং পাওয়া যায়। (১) কেক (২) টিউব।

জল রং ব্যবহারের উপকরণ :

রং, কাগজ, বোর্ড, ক্লিপ, প্যালেট, জলের পাত্র, তুলি, জলরঙের ইজেল, পেনসিল, রবার, কাপড় ইত্যাদি।

জল রং ব্যবহারের পদ্ধতি :

জলরঙে ছবি আঁকতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবি আঁকলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

- জলরঙের ছবিতে কাগজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘক্ষণ জল ধারণ করতে পারবে, এরকম কাগজ বাছাই করা দরকার। সেক্ষেত্রে হ্যান্ডমেড পেপার (Handmade paper) সব থেকে ভালো জলরঙের কাজ করার কাগজ। হ্যান্ডমেড পেপারের মধ্যে ডেভিড কক্স, ওয়াটম্যান কাগজ সব থেকে ভালো। এছাড়া ভালো কার্টিজ পেপারেও জল রং করা যায়। অ্যাসিড মুক্ত কাগজ ব্যবহার না করলে রঙের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়।
- জলরঙের ছবির জন্য কাগজটাকে ড্রয়িংবোর্ডের ওপর ভিজিয়ে রেখে চারিদিকে ব্রাউন টেপ দিয়ে মাউন্ট করে নিতে হবে। তাতে কাগজটা টান টান থাকে।
- পেনসিল দিয়ে হালকাভাবে ড্রয়িং করা প্রয়োজন, নাহলে রঙের স্বচ্ছতার জন্য পেনসিল ড্রয়িং ফুটে উঠবে।
- জলরং শুরুর আগে ড্রয়িং বোর্ডের ওপরের দিকটা অল্প একটু উঁচু করে রাখতে হবে। যাতে জলের মধ্যে রঙের pigment সমানভাবে ছড়াতে পারে।

- বোর্ডটিকে একজায়গায় একভাবে রেখে জলরঙের ছবি আঁকা সম্পূর্ণ করতে হবে। বোর্ড এদিক-ওদিক নড়ালে রঙের pigment গুলি জলের সাথে এদিক-ওদিক নড়ে ছবিটিকে নষ্ট করে দেবে।
- ছবির ওপর থেকে রং ব্যবহার করে নীচের দিকে আসতে হবে।
- হালকা থেকে গাঢ় রং অর্থাৎ light to dark পদ্ধতিতে জলরং করতে হয়।
- পাতলা রং ব্যবহার করে জলরং করা হয়।
- সমস্ত কাগজ ভিজিয়ে রং দেওয়ার চিনা পদ্ধতি বর্তমানে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এতে ছবি খুব soft থাকে।
- জলরঙের ছবি আঁকতে গেলে ভুল হয়ে গেলে শোধরানো যায় না।
- ছবিতে Highlight রাখতে হলে, কাগজে সাদা অংশ ছেড়ে যেতে হয়।
- তুলি চালনায় ক্ষিপ্রতা থাকা প্রয়োজন। নাহলে ছবির একদিকে রং করতে করতে আরএক দিক শুকিয়ে গেলে ছবিতে রঙের দাগ থেকে যায়।
- ছবির টোন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার অর্থাৎ আলোছায়ার ব্যবহারের কৌশল ভালোভাবে রপ্ত করা প্রয়োজন।
- জলরঙের প্রচুর অনুশীলন প্রয়োজন। প্রথমে মোটা তুলির ব্যবহার এবং পরে সরু তুলির ব্যবহার করতে হয়।

জলরং ব্যবহারের সুবিধা

- জলরঙের খরচ অপেক্ষাকৃত কম।
- স্বল্প সময়ে ছবিটি সম্পূর্ণ করা যায়।
- তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।
- জলরঙে শিক্ষানবিশ থেকে শিশু প্রত্যেকেই কাজ করতে পারে।
- আউটডোর স্টাডির ক্ষেত্রে জলরং সবথেকে উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

জলরং-এর অসুবিধা

- জলরঙে ছবি আঁকতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সেজন্য সব শিল্পী জলরং ব্যবহার করেন না।
- ক্ষিপ্রতার সাথে কাজ না করলে জলরঙে ছবি আঁকা সম্ভব নয়।
- জলরঙের ছবি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।
- ছবির রং পোকামাকড় খেয়ে নষ্ট করে দেয়।
- দীর্ঘদিন পরে ছবির ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়।
- ছবি সংরক্ষণ করতে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

- ছবির কাগজ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।
- ছবি আঁকতে ভুল হয়ে গেলে সংশোধন করা যায় না।

জলরঙের উল্ল্যেখযোগ্য ছবি

টার্নারের আঁকা 'The red Rigi', উইস্লো হোমারের 'Rowing Home'.

জলরঙের বৈশিষ্ট্য

- জলরঙ বলতে স্বচ্ছ অর্থাৎ Transparent জলরংকে বোঝায়।
- লাইট টু ডার্ক পদ্ধতি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- পাতলা রং এবং কাগজের সাদা অংশ ছেড়ে Highlight বোঝানো হয়।
- ছবির প্রত্যেকটা টোন পরিষ্কার বোঝা যায়।
- খুব তাড়াতাড়ি ছবি সম্পন্ন হয়।
- কাগজ ভিজিয়ে ভেজা অবস্থায় জলরং ব্যবহার ছবির কমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে।

পোস্টার রং বা অস্বচ্ছ জলরং (Poster Colour or opaque water colour) ঃ

Poster Colour একটি অস্বচ্ছ মাধ্যম। বর্তমানে এই রং বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পোস্টার রং দিয়ে ওপেক পদ্ধতিতে ছবি আঁকা যায়। বিভিন্ন কারুশিল্প, graphic design সবক্ষেত্রে এই রঙের ব্যবহার দেখা যায়। পটুয়া থেকে কমার্শিয়াল শিল্পী সকলেই এই রং ব্যবহার করেন।

পোস্টার রং ব্যবহারের পদ্ধতি

- Opaque পদ্ধতিতে ছবি আঁকা যায়।
- যে-কোনো ক্ষেত্রে পোস্টার রং ব্যবহার করা যাবে।
- ডার্ক টু লাইট বা লাইট টু ডার্ক যে-কোনো পদ্ধতিতে ছবি আঁকা যায়।
- রঙের সাথে সাদা মিশিয়ে কাজ করলে ভালো হয়।
- সুবিধে অনুযায়ী তুলি ব্যবহার কার যায়।

পোস্টার রঙের বৈশিষ্ট্য

- একটা রঙের ওপর আর একটা রং ব্যবহার করা যায়।
- যে-কোনো কাজ তা craft হোক, বা পোস্টার, বইয়ের প্রচ্ছদ, ছবি ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই এই রং ব্যবহার করা যায়।
- যে-কোনো Lay out-এর ক্ষেত্রে এই রং ব্যবহার করা হয়।
- বর্তমানে বাজারে অস্বচ্ছ রং বলতে পোস্টার রং-ই সহজে পাওয়া যায়।

পোস্টার রঙের সুবিধা

- যে-কোনোভাবে এই রং ব্যবহার করা যায়।
- ছবির ক্ষেত্রে ভুল হলে শুধরে নেওয়া যায়।

পোস্টার রঙের সুবিধা

- যে-কোনোভাবে এই রং ব্যবহার করা যায়।
- ছবির ক্ষেত্রে ভুল হলে শুধরে নেওয়া যায়।
- পোস্টার, প্রচ্ছদ, Illustration ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই রং আদর্শ রং।

পোস্টার রঙের অসুবিধা

- এই রং দীর্ঘস্থায়ী নয়।
- ছবিতে জল পড়লে এই রং উঠে যায়।
- তুলি ঠিকমতো ব্যবহার না করলে ছবিতে তুলির দাগ থেকে যায়।

কালি ও কলম (Pen & Ink) ঃ

কালি ও কলম বলতে চাইনিজ ইংক ও তার পেনকে বুঝি। চাইনিজ ইংকে কলম ডুবিয়ে যে ছবি আঁকা হয়, তাকে কালি-কলমের ছবি বলে। Pen & Ink ও শিল্পীদের একটি ছবি আঁকার মাধ্যম। চিনে Pen & Ink ব্যবহার প্রথম শুরু হয়। এই কালি আবিষ্কার করেন চিনা দার্শনিক Tien-Lcheu। চিনে আবিষ্কার হয় বলে এই কালির নাম চাইনিজ ইংক। পূর্বে মিশর, গ্রিস ও রোমেও কালি ব্যবহার করে লেখা হতো। প্রথম দিকে হাঁস বা পাখির পালক দিয়ে কলমের কাজ চলত। পাশাপাশি বাঁশ, খাগ প্রভৃতি ব্যবহার করে কলমের কাজ চলত। ভারতবর্ষে তালপাতার ওপর এ ধরনের কলম ব্যবহারের প্রচলন ছিল। রেঁনেসার সময় থেকে বা তার কিছু পূর্বে ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে Pen & Ink জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শিল্পী রুবেনস এবং ভ্যান ডাইক (Van Dyek) এই মাধ্যমকে জনপ্রিয় করে তোলেন। রেমব্রান্টেরও বেশ কিছু Pen & Ink-এ ড্রয়িং আছে। স্থাপত্য শিল্পেও ড্রয়িং-এর কাজে এই মাধ্যম খুব ব্যবহার হতো। যে-কোনো বড়ো আঁকার আগে খসড়া ড্রয়িং-এর জন্য Pen & Ink ব্যবহার হতো।

চাইনিজ ইংক শুধু মাত্র কালো রঙের হয় তা নয়, বিভিন্ন রঙের চাইনিজ ইংক পাওয়া যায়। পূর্বে কালো এবং খয়েরি চাইনিজ ইংকের ব্যবহার বেশি হতো। চাইনিজ ইংকের কাজ মানেই কালো-সাদা ছবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রঙিন ছবিগুলির মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন রঙের চাইনিজ ইংক ব্যবহার করে আঁকা হয়েছে। বিভিন্ন রকমের কলম পাওয়া যায়। যেমন—বাঁশের কলম, খাগের কলম, পালকের কলম, তুলি কলম, নিবের কলম ইত্যাদি।

বাঁশের কলম বা খাগের কলম—বাঁশ বা খাগ কেটে এই কলমগুলি তৈরি করা হয়। যে অংশ দিয়ে আঁকা বা লেখা হয় তা ছুঁচোলো হয়।

তুলি কলম—Handle গুলি বাঁশ বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে তৈরি অর্থাৎ চন্দন কাঠ, সোনা, রুপা বা হাতির দাঁতের হত। লেখার অংশ বিভিন্ন লোমের হত।

পালকের কলম—এই কলমের নিবের অংশ ধাতুর তৈরি। বাকি অংশ সোনা, কাঠ প্রভৃতি মাধ্যমে তৈরি করা হত।

Pen & Ink ব্যবহারের পদ্ধতি

- Pen & Ink ব্যবহার করতে হলে ভালো নিবের প্রয়োজন হয়।
- সরু, মোটা বা মাঝারি লাইনের জন্য আলাদা আলাদা নিবের প্রয়োজন হয়।
- বিভিন্ন রকম stroke অর্থাৎ cross stroke, Diagonal প্রভৃতি ব্যবহার করে ছবি আঁকা যায়।

Pen & Ink ব্যবহারের পদ্ধতি

- চাইনিজ ইংক সহজে উঠে যায় না। যতক্ষণ না কাগজ নষ্ট হয়ে যায়, ততক্ষণ এই কালি অপরিবর্তিত থাকে।
- Line drawing-এর কাজ করার ক্ষেত্রে সব থেকে ভালো মাধ্যম।
- Lay out drawing, Sketch-এর জন্য চাইনিজ ইংক সব থেকে ভালো।

২.৪.১ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন (Check your progress)

নির্দেশ : (ক) আপনার উত্তর নীচের প্রদত্ত জায়গায় লিখুন।

(খ) এককের শেষে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

(ক) প্রাথমিক রঙ বলতে কি বুঝি?

_____

_____

_____

(খ) বাজারে পাওয়া যায় এমন তিনটি হলুদ রঙের নাম লিখুন।

_____

_____

(গ) বর্ণচক্র এঁকে দেখান।

_____

_____

(ঘ) সবুজ কোন কোন রঙের সংমিশ্রণে পাওয়া যায়।

_____

(ঙ) স্বচ্ছ জলরঙে ছবি আঁকার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

_____

_____

২.৩.৪ বিভিন্ন ধরনের বাংলা ও ইংরাজী অক্ষর লিখন

বিভিন্ন ধরনের অর্থাৎ শৈলিতে অক্ষর লিখনকে ক্যালিগ্রাফি (calligraphy) বলা হয়। গ্রীক শব্দ kallos কথার অর্থ সুন্দর এবং graphe কথার অর্থ লেখা, অর্থাৎ সুন্দর লেখা বলতে calligraphy-কে বোঝায়। বিভিন্ন রকমের কার্ড, বইয়ের মলাট, পোষ্টার ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমরা ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখি।

ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্বে ক্যালিগ্রাফিই ছিল বই, ধর্মীয় স্থান, প্রচার পত্র অলংকরণ করার একমাত্র পদ্ধতি। ঐ সময় পালক বা ঐ ধরনের লেখার সরঞ্জাম ব্যবহার করে প্রাচীন বইগুলি লেখা হত। ক্যালিগ্রাফির প্রধান সরঞ্জাম হল কলম। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পেনের নিব পাওয়া যায়।

প্রধানতঃ, তিনরকম শৈলির ক্যালিগ্রাফি পাওয়া যায়।

(১) রোমান বা পাশ্চাত্য

(২) আরবি

(৩) চৈনিক বা প্রাচ্য

রোমান ক্যালিগ্রাফি—৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে রোমে ক্যালিগ্রাফি শুরু হয়। পরবর্তী কালে খ্রীষ্টান মঠ ক্যালিগ্রাফির উন্নতিসাধনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন অক্ষর শৈলির প্রচলন ও নাম করণ তখন থেকেই শুরু হয়।

আরবি ক্যালিগ্রাফি—৫০০ থেকে ৬০০ খৃষ্ট পূর্ব আরবি ক্যালিগ্রাফি শুরু হয়। আরবি ক্যালিগ্রাফির মূল বৈশিষ্ট্য হল জ্যামিতিক ইসলাম শিল্প (Islamic Art)।

চৈনিক ক্যালিগ্রাফি—প্রাচীন চীনে কচ্ছপের খোলের উপর বা ষাঁড়ের হাড়ের উপর তুলি দিয়ে লেখা পাওয়া গেছে। ২২০ খৃষ্ট পূর্ব কিন শি হুয়াং (Qin shi Huang) সম্রাটের সময় বিভিন্ন অক্ষর শৈলি পাওয়া গেছে।

এছাড়া ভারতীয় ক্যালিগ্রাফি ২৬৫-২১৮ খৃঃ পূর্বে অশোকের সময় পাথরের উপর পাওয়া গেছে। এখানে দুটি শৈলির লিপি পাওয়া গেছে। (১) খারোষ্টি (২) ব্রাহ্মি

উদ্দেশ্য ঃ

- বিভিন্ন অক্ষর লিখনের শৈলি সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- অক্ষর লিখনের মাধ্যমে পোষ্টার, চার্ট, বিভিন্ন রকমের কার্ড তৈরি করতে শেখা।
- লেখার মধ্যে দিয়ে অলঙ্করণ করতে শেখা।

পদ্ধতি ঃ অক্ষর লিখতে হলে নিচের ধাপগুলি অনুসরণ করে লিখতে হবে।

(ক) জায়গা বা Space

(খ) পরিমাপ (Size)

(গ) শৈলি (Style)

(ক) জায়গা (Space) ঃ প্রথমে ঠিক করতে হবে অক্ষর লিখন কোথায় হবে এবং যে কাগজে লেখা হবে তার পরিমাপ কতখানি হবে। অক্ষর লিখন নির্ভর করে বিষয়ের উপর। তারপর দেখতে হবে সেটা চার্ট না পোষ্টার অথবা কার্ড কী হবে। কোন কোন লেখার গুরুত্ব বেশি বা কোনটার গুরুত্ব কম সব নিয়ে ভাবতে হবে।

(খ) পরিমাপ (Size) ঃ অক্ষরের পরিমাপ (Size) অক্ষর লিখনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা অক্ষর লিখতে গেলে প্রথমে দুদিকে দুটো লাইন পেন্সিল দিয়ে টেনে নিতে হবে। যাতে লেখাগুলির পরিমাপ কম বেশি না হয়ে যায়। তারপর দেখতে হবে দুটো অক্ষরের মধ্যে সমপরিমাণ ফাঁক থাকে। নিচে কয়েকটি অক্ষর দেওয়া হল।

উপরে A-র সাথে B বা B-এর সাথে C-এর মধ্যে যে ফাঁক রয়েছে তার পরিমাপ সমান হওয়া দরকার। বাংলা অক্ষরের ক্ষেত্রেও ক, খ, গ -এর মধ্যে সমান ফাঁক থাকতে হবে। যদি কোনো অক্ষরের উপর বা নীচ গোল হয়। তবে তা মাত্রা থেকে অল্প একটু বেশি করতে হয়। ইংরেজী অক্ষর S, O, Q, ইত্যাদির ক্ষেত্রে এরকম লেখা লিখতে হবে। শব্দের সঙ্গে শব্দের ফাঁক, লাইনের সঙ্গে লাইনের ফাঁক সমান হবে।

যেমন :

জল পড়ে
পাতা নড়ে

২.৪ কোলাজ

ফরাসি শব্দ ''কোলার'' থেকে কোলাজ কথাটার উৎপত্তি। কোলার কথার অর্থ কোন কিছু সাঁটা বা আঠা দিয়ে আটকানো।

কোনো সমতলক্ষেত্র অর্থাৎ কাগজ, বোর্ড বা ক্যানভাসের ওপর টুকরো কাগজ, কাপড় বা বিভিন্ন ফেলে দেওয়া বস্তু আটকে যে চিত্র তৈরী করা হয় তাকে কোলাজ বলে।

মনে করা হয় ২০০ খ্রিস্টাব্দে চিন দেশে কোলাজ শুরু হয়। দশম শতাব্দীতে জাপানে কবিতার মধ্যে কোলাজের ব্যবহার ছিল। আর ইউরোপে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গথিক শিল্পে কোলাজের ব্যবহার দেখা যায়। উনবিংশ শতকে কোলাজ শিল্প বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যায়। বিশেষভাবে মানুষ তাদের পরিবারের ছবি দেওয়ালে সেঁটে রাখত। উনবিংশ শতকে scrape book, ছবির অ্যালবাম, ল্যাম্পশেড প্রভৃতির ক্ষেত্রে কোলাজের ব্যবহার পাওয়াগেছে। কিছু শিল্পীও বইয়ের illustration-এর ক্ষেত্রে কোলাজের ব্যবহার করেছেন।

আধুনিক কোলাজ বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইউরোপে শুরু হয়। সেই সময় ফ্রান্সে শিল্পীরা একসাথে ছবি আঁকার জন্য থাকত ও বিভিন্ন form নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতো। বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো ও জর্জ ব্রাক একসাথে কিউবিজম নিয়ে চর্চা করছিলেন। হঠাৎ একদিন ব্রাক চারকোল ড্রয়িং-এর মধ্যে কাগজ সেঁটে experiment শুরু করেন। পিকাসো তেলরঙে বিভিন্ন কাগজ সেঁটে নতুন ছবি তৈরী করেন। সেজন্য পাবলো পিকাসো ও জর্জ ব্রাককে কোলাজের জনক বলা হয়। কোলাজকে স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে এঁরা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে আঁকা পিকাসোর বিখ্যাত ছবি ''still life with chair caning'' কোলাজের দ্বারা রচিত। পরবর্তীকালে সদবাস্তববাদী শিল্প (surrealist), পপ শিল্পে (Pop Art) কোলাজের ব্যবহার দেখা গেছে। বিভিন্ন রকম কোলাজের কাজ রয়েছে, যেমন — Wood collage, Decoupage, Photomontage, Digital collage প্রভৃতি।

কোলাজ ব্যবহারের পদ্ধতি

- ▲ কোলাজ করতে গেলে surface নির্বাচন করা জরুরি। তা ক্যানভাস, বোর্ড, কাগজ ইত্যাদি যে-কোনো surface নেওয়া যেতে পারে।
- ▲ surface-এর উপর নির্ভর করে আঠা নির্বাচন করা দরকার। কাগজের ওপর gum ভালো, আবার অন্য ক্ষেত্রে ফেভিকল, ড্রেনড্রাইট জাতীয় আঠা নেওয়া যায়।
- ▲ কোলাজে কোন Materials ব্যবহার করব তা ঠিক করতে হবে। এমন কোনো Materials ব্যবহার করব না যা ছবি নষ্ট করে দেবে।
- ▲ ছবির চরিত্র অনুযায়ী Materials ব্যবহার করব। যেসব Materials কোলাজ করতে লাগে তার তালিকা নীচে দেওয়া হলো—

(১) ম্যাগাজিনের কাগজ (২) টুকরো রঙিন কাপড় (৩) দড়ি (৪) খড় (৫) কাঠ (৬) শুকনো পাতা (৭) কাঠের গুঁড়ো (৮) বালি (৯) মাছের আঁশ (১০) গাছের ছাল (১১) গমের কাঠি (১২) কাঠের ছিলকা (১৩) কার্বন পেপার (১৪) খবরের কাগজ (১৫) ট্রেসিং পেপার প্রভৃতি।

- ▲ প্রথমে surface-এর ওপর ড্রয়িং করে নিতে হবে।
- ▲ ড্রয়িং অনুযায়ী কোলাজের Materials আটকাতে হবে। তবে আটকানো ঠিকভাবে না হলে ছবির চরিত্র ঠিকভাবে ফুটবে না।
- ▲ কোন texture রং ব্যবহার করবো তা ঠিক করে নিতে হবে।
- ▲ কোলাজে প্রয়োজন অনুযায়ী রং ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ▲ কোলাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

কোলাজের বৈশিষ্ট্য

- ▲ কোলাজ শিল্পক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র মাধ্যম।
- ▲ রঙের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- ▲ অনেক রকম মাধ্যমে কোলাজের কাজ করা যায়
- ▲ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোলাজের কাজ করা যায়।
- ▲ ফেলে দেওয়া বস্তু দিয়ে কাজ করা যায় অর্থাৎ কোনো বস্তুকে নতুনভাবে ব্যবহার করা

প্রাথমিক শিক্ষায় কোলাজের কাজের গুরুত্ব

কোলাজ একটি সৃজনাত্মক কাজ। প্রাথমিক শিক্ষায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে কোলাজের কাজকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নিম্নলিখিত কারণে কোলাজের কাজ প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পেয়েছে

(১) ফেলে দেওয়া বস্তুর প্রতি মমত্ববোধ — আমরা অনেক বস্তু ফেলে দিই যেমন খবরের কাগজ, পুরোনো ম্যাগাজিন, ঠোঙা, ডিমের খোলা, মাছের আঁশ, পোস্টকার্ড, ব্যবহৃত কার্বন পেপার ইত্যাদি। আবার প্রকৃতির মধ্যে অনেক বস্তু পড়ে থাকে যা আপাতভাবে কোনো কাজে লাগে না, যেমন — শুকনো পাতা, গাছের শুকনো ছাল, কাঠের গুঁড়ো, পাট কাঠি, খড় ইত্যাদি। এ ধরনের বস্তু দিয়ে কোলাজের কাজ করা যায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যদি দেখে এ ধরনের ফেলে দেওয়া বস্তু দিয়ে কোনো সৃষ্টিশীল কাজ করা যায় তাহলে তারাও এ সমস্ত ফেলে দেওয়া বস্তুর প্রতি আগ্রহ দেখাবে। কোনো বস্তুই যে ফেলে দেওয়ার নয়—বিশেষভাবে আজকের দিনে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব যেখানে আগামী প্রজন্মের ওপর নির্ভর করে। এর মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বাড়ানো দরকার বলে মনে করা হয়। সুতরাং ফেলে দেওয়া বস্তুকে পুনরায় ব্যবহার করা জরুরি এবং তার প্রতি মমত্ববোধ খুবই প্রয়োজন।

(২) রঙের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার — কোলাজের কাজে ফেলে দেওয়া কাগজ, কাপড় ইত্যাদির রং ব্যবহার করে কোলাজ করা হয়। বাজারে রঙের দাম যথেষ্ট, ফলে ওইসব রং অনেক শিশুই কিনতে পারে না। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে যেসব অঞ্চলে পিছিয়ে রয়েছে, সেখানে রঙের বিকল্প হিসেবে কোলাজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রঙ কিনতে পারে না, কিন্তু শিল্প সৃষ্টি করার আগ্রহ আছে। তখন কোলাজের কাজের মাধ্যমে মনের এই চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়। কাগজ, ম্যাগাজিন বা কাপড়ের রঙিন অংশ , বালি, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি রঙের বিকল্প হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। রঙিন ছবি কোলাজের মাধ্যমে করা যায়।

(৩) স্বল্পমূল্যে শিল্পসৃষ্টি — অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে কোলাজের কাজ করে শিশুরা শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হবে। কোলাজের কাজের যেহেতু খরচ কম, তাতে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে এ ধরনের কাজ খুব উপযোগী হয়ে উঠবে। রং ,তুলি, কাগজ, প্যালেট প্রভৃতির দাম অনেক বেশি এবং একজন পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের শিশুর কাছে অকল্পনীয়। তাই খুব কম খরচে কোলাজ করা তাদের কাছে সহজ সাধ্য।

(৪) সৃজনশীল মানসিকতার বিকাশ — কোলাজ এক ধরনের শিল্পমাধ্যম। শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমে প্রতিভার যে স্ফুরণ ঘটে, কোলাজেও তা ঘটে। শিশুশিক্ষায় যে-কোনো সৃজনশীল কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছোটোবেলায় মনকে যদি নতুন নতুন সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা যায়, তাহলে পরে শিশুর কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়। কোলাজের কাজের মাধ্যমে শিশুর সৃজনশীল মানসিকতার বিকাশ ঘটে।

২.৫ কাগজের কাজ

খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে চীনদেশে কাগজ আবিষ্কারের পর কাগজকে ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ করা হতে থাকে। যেমন : কাগজের মন্ড (Paper Pulp), কাগজের ম্যাসে (Paper Mache), অরিগামী, কাগজ কাটা ইত্যাদি।

২.৫.১ কাগজ কাটা (Paper cutting)

দুদিকে সমানভাবে (symmetrical) কাগজ কাটা চীন দেশে ষষ্ঠ শতকে শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা মধ্যএশিয়া হয়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। চীনে লোকসংস্কৃতি জড়ানো যে কাগজ কাটা তাকে Zianzhi বলা হয়। প্রধানত, স্বাস্থ্য উন্নতি বা বাড়ি সাজানোর জন্য Zianzhi ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে কাগজকেটে মেঝেতে আটকে তারমধ্যে রঙগলি ব্যবহার করা হয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

- সহজভাবে যে কোনো স্থান অলংকরণ করা যায়।
- অল্প সময়ে কাগজ কেটে সাজানো যায়।
- কম উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

উপকরণ ঃ কাঁচি, ব্লেড, আঠা যে কোনো কাগজ অর্থাৎ মার্বেল পেপার, কাইট পেপার, তুলোট কাগজ, হ্যান্ডমেড, ব্রাউন পেপার ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ

- ➢ কাগজ কাটার ক্ষেত্রে কাগজ ভাঁজ করা জরুরী। বিভিন্ন ভাবে ভাঁজ করে কাটলে নানারকম আকারের অলংকৃত কাগজ পাওয়া যাবে।
- ➢ যে কোনো ডিজাইনে বা অলংকারে দুটি দিক আছে (ক) তার বাইরের আকৃতি (খ) তার ভিতরের শৃঙ্খলা
- ➢ কোনখানে অলংকরণ করা হবে তার উপরে ডিজাইনের মোটিফ নির্ভর করে। প্রয়োজনে একই ডিজাইন একাধিকবার কাটতে হবে।
- ➢ একটা কাগজকে একভাঁজ করে কাটলে দুটো symmetrical ডিজাইন হবে। আবার ঐ কাগজকে দুভাঁজ করলে চারটে ডিজাইন হবে।

২.৫.২ অরিগামি

অরিগামি শব্দটা জাপানী শব্দ অর্থাৎ শুধুমাত্র কাগজে ভাঁজ করে যে শিল্প করা হয় তাকে অরিগামি বলে। কাগজের নৌকা, এরোপ্লেন ইত্যাদি অরিগামি শিল্প।

বৈশিষ্ট্য ঃ

- ➢ কাগজ ভাঁজ করে অরিগামি করা হয়।
- ➢ বিশুদ্ধ অরিগামিতে কাঁচি, আঠা এগুলি ব্যবহৃত হয় না।
- ➢ খুব সহজে সাধারণ কাগজ ব্যবহার করে এই কাজ করা হয়।

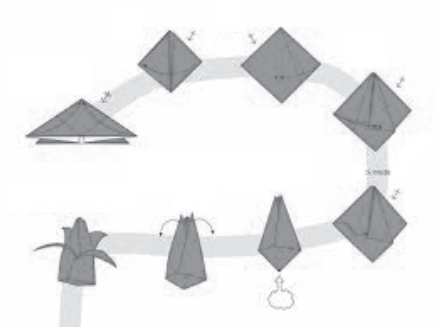

পদ্ধতি ঃ

- ➢ অরিগামির ক্ষেত্রে চৌকো কাগজ নেওয়া হয়ে থাকে।
- ➢ কাগজকে বিভিন্ন ভাঁজ করে পাখি, নৌকা, পশু ইত্যাদি করা যায়।
- ➢ ঠিকমতো কাগজ ভাঁজ করা জরুরী। নাহলে পরবর্তী ভাঁজ বা আকারের ক্ষেত্রে অসুবিধে হবে।

২.৫.৩ পেপার ম্যাসে (Paper Mache)

Paper Mache কাগজের কাজের আর একটা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিও অনেক প্রাচীন। বিশেষকরে আঞ্চলিকভাবে বিভিন্ন মুখোশ, খেলনা ইত্যাদি তৈরিতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। পুরুলিয়ার ছৌ-এর মুখোশে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

- ➢ যে কোনো ধরনের ত্রিমাত্রিক রূপ পেপার ম্যাসেতে দেওয়া যায়।
- ➢ ফাঁপা ও হাল্কা বস্তু তৈরি করা যায়।
- ➢ কম খরচে যে কোন জিনিস তৈরি করা যায়।
- ➢ নাটক, নাচ ইত্যাদিতে Paper Mache-এর কাজ ব্যবহার করা যায়।

উপকরণ ঃ মাটি, মাটির কাজের সরঞ্জাম, খবরের কাগজ, রঙ, আঠা, তুলি, বার্নিশ ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ

- প্রথমে মাটি দিয়ে বস্তুর ছাঁচ তৈরি করে নিতে হবে।
- এরপর মাটি শুকিয়ে গেলে ছোট ছোট কাগজ ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে মাটির তৈরি ছাঁচের উপর লাগাতে হবে। যাতে ছাঁচটি পুরোপুরি ঢেকে যায়।

- পরবর্তীধাপে কাগজের টুকরো আঠার সাহায্যে মডেলের উপর লাগাতে হবে। যত বেশি কাগজের স্তর লাগানো যাবে, তত মোটা হবে।
- এরপর কাগজটি রোদে ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে।
- শেষে আস্তে আস্তে ছাঁচ থেকে Paper Mache -এর কাজটি খুলে নিতে হবে।
- এরপর সাদা রঙ করে শুকিয়ে ইচ্ছে অনুযায়ী রঙ করতে হবে।
- শেষে বার্নিশ ব্যবহার করতে হবে।

২.৫.৪ কাগজ ও কার্ডবোর্ডের কাজ

কাগজের সাথে কার্ডবোর্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন মডেল তৈরি করা যায়। বিশেষ করে T.L.M. তৈরিতে এধরনের কাজ খুব কাজে লাগে।

বৈশিষ্ট্য ঃ

- ত্রিমাত্রিক বস্তু খুব সহজে তৈরি করা যায়।
- প্রয়োজনীয় বস্তু অর্থাৎ খাম, ফাইল, কলমদানী সহজে তৈরি করা যায়।

উপকরণ ঃ মাউন্টবোর্ড, কাগজ, কাঁচি, ছুরি, আঠা, স্কেল, পেন্সিল, রঙ, তুলি ইত্যাদি।

নীচে দুটি কাগজ ও কাডবোর্ডের কাজের নমুনা দেওয়া হল

কলমদানি তৈরি

প্রথমে ৮ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি ৭ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি মাউন্ট বোর্ড কেটে নিতে হবে। এরপর ৮ ইঞ্চি অংশটাকে ২ ইঞ্চি করে চারটি ভাগে ভাগ করতে হবে। শেষে $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি অবশিষ্ট থাকবে। এই অংশগুলি প্রথমে স্কেলের সাহায্যে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে হবে। ছবির ড্রইং অনুযায়ী আড়াআড়ি ভাবে ৫ ইঞ্চির মাত্রায় একটি দাগ দিতে হবে।

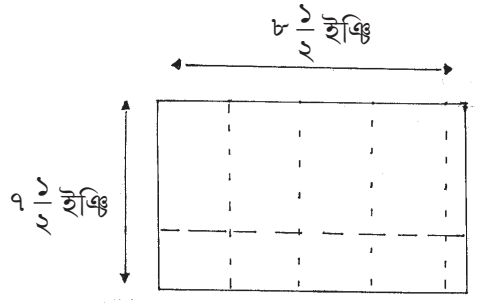

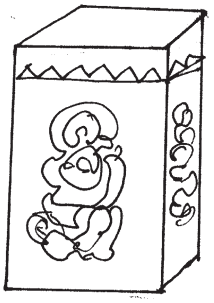

১ নং দাগ দিয়ে ২ $\frac{১}{২}$ একটা অংশকে রেখে দিয়ে ৫-র উপরে বাকি অংশ কেটে ফেলতে হবে । ২ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চির অংশে ২ ইঞ্চিতে আরেকটা দাগ টানতে হবে। এরপর এই দাগগুলিতে ছুরি দিয়ে হাল্কাভাবে দাগদিতে হবে। যাতে মাউন্টবোর্ডকে সহজেই ভাঁজ করা যায়। প্রয়োজনে মারবেল কাগজ বা রঙীন হ্যান্ডমেড কাগজ কলমদানি উপর লাগানো যায়। যাতে কলমদানি দেখতে সুন্দর লাগে। প্রয়োজনমতো ভাঁজ করে ৩ নং চিত্রের মত কলমদানি তৈরি করা যাবে। কলমদানিতে ইচ্ছেমতন অলংকরণ করে নেওয়া যাবে যাতে কলমদানিটি দেখতে আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

অফিসখাম তৈরি

অফিসের জন্য ব্রাউন পেপারে তৈরি খামই উপযুক্ত। তাই একটা ব্রাউন পেপার নিয়ে পেন্সিল ও স্কেলের সাহায্যে ৩০ সেমি লম্বা ও ২৪ সেমি চওড়া অংশ কেটে নিতে হবে। এবার লম্বার দিকে ৬ সেমি, ২১ সেমি ও ৩ সেমি-এ দাগ দিতে হবে। আবার চওড়ার দিকে ৭ সেমি, ৯ সেমি ও ৮ সেমি দাগ দিতে হবে।

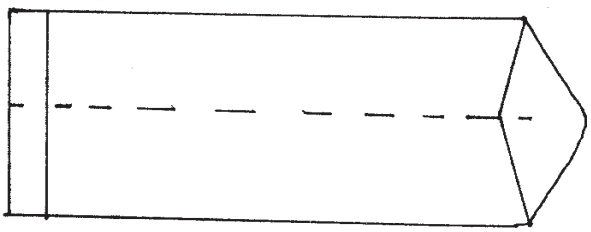

২১ সেমি দুদিকের অংশ থেকে চিত্র -১ অনুযায়ী কেটে নিতে হবে। শেষে ৯ সেমি ও ৩ সেমি-র অংশে চিত্র-১ অনুযায়ী কাটতে হবে। এবার দাগ অনুযায়ী ভাঁজ করে আঠা দিয়ে কাগজটাকে জুড়ে দিতে হবে। ৯ সেমি ও ২১ সেমি সুন্দর একটি অফিস খাম তৈরি হয়ে গেল।

২.৬ মাটির কাজ

মাটি হল পৃথিবীর সবথেকে পুরনো শিল্পমাধ্যম। পুরনো সভ্যতায় বিভিন্ন ধরনের মাটির খেলার সামগ্রী, তেজসপত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে। মাটির সহজলভ্যতা ও নির্মাণের সারল্য একে এতখানি জনপ্রিয় মাধ্যম করে তুলেছে। মাটির প্রধান রাসায়নিক উপাদান অ্যাল্যুমিনিয়াম হাইড্রোসিলিকেট। সঙ্গে অল্পাধিক মাত্রায় অন্যান্য পদার্থও মিশ্রিত থাকে। যেমন বালি, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট, ঈষৎ মাত্রায় লৌহ পটাশিয়াম, সোডিয়াম ম্যাঙ্গানিজ, গন্ধক, ক্লোরিন, ফসফরাস, নাইট্রোজেন এবং খুব স্বল্প মাত্রায় তামা, বোরন, আয়োডিন, প্রভৃতি। এছাড়া মাটির সঙ্গে মিশ্রিত থাকে গলিত জৈব পদার্থ।

সাধারণত মাটির প্রকৃতি ও উপাদানের উপর নির্ভর করে মাটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়-primary clay ও secondary clay। সাধারণতঃ প্রাইমারী মৃত্তিকা বলতে বোঝানো হয় এমন মৃত্তিকাকে যা সেই স্থানেই জন্ম নিয়েছে। জল বা বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে অন্য কোন স্থান হতে আসেনি, যেমন কৃষ্ণ মৃত্তিকা।

সেকেন্ডারী মৃত্তিকা সাধারণতঃ জল বাহিত হয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিবাহিত আসে। এই পরিবহনের সময় মাটির চরিত্রের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন মাটির কণাগুলি জলের স্রোতের ধাক্কায় মিহি গুড়ো হয়ে যায়। আর ভারী কণাগুলি থিতিয়ে যায়। এই মাটির কণার সঙ্গে নানা ধরণের জৈব বস্তু যুক্ত হয়ে মাটিকে আরও নমনীয় করে তোলে। সাধারণত ঃ এই ধরণের মাটিকে Ball clay নামে পরিচিত। Ball clay এর নমনীয়তা বা প্লাস্টিসিটি (plasticity) অত্যন্ত বেশী। তাই এই ধরণের মাটি শুকিয়ে গেলে বা পোড়ালে তার সংকোচনের হারও বেশী। কারণ যে মাটি যত বেশী নমনীয় সে মাটি শুকিয়ে গেলে তত বেশী সংকুচিত হয়। সাধারণতঃ মাটির সংকোচনের হারও তার নমনীয়তা বা প্লাস্টিসিটির উপর নির্ভর করে। এই ধরণের প্লাস্টিক মাটি মূর্তিনির্মানের উপযুক্ত হলেও টেরাকোটা কাজের জন্য উপযুক্ত নয় কারণ এরকম মাটি পোড়ালে বেশী সংকুচিত হয় বলে এর গড়নে বিকৃতি দেখা দেয়। এই কারণে টেরাকোটা নির্মানের জন্য বিশেষ ধরণের মাটি প্রস্তুত করে নিতে হয়। মাটির কাজ করতে গেলে মাটি নির্বাচন ও মাটি তৈরি খুবই জরুরী।

মাটি নির্বাচন করা

মাটির কাজ করতে হলে প্রথমে মাটি নির্বাচন করা প্রয়োজন। সব মাটিতে মাটির কাজ ভালো হয় না। এঁটেল মাটিতে মাটির কাজ সবথেকে ভালো হয়। দক্ষিণবঙ্গে গঙ্গার পলি পড়া যে এঁটেল মাটি পাওয়া যায়, তাতে বালি কাঁকর থাকে না। এই মাটি মাটির কাজের পক্ষে উপযুক্ত। আবার বীরভূম, বাঁকুড়ার রাঙা এঁটেল মাটিও কাজের পক্ষে উপযুক্ত।

মাটি প্রস্তুত করার পদ্ধতি

একটি বড় গামলায় গরমজল নিয়ে তাতে কিছু মাটি দিয়ে ভালো করে চটকে ভিজিয়ে রাখতে হবে। যাতে মিশ্রণটি ঘোলের মত হয়। এরপর মিশ্রণটিকে সরু তারের জালে চেলে ছেঁকে নিতে হবে। যাতে মোটা দানা, কাঁকর, কাঠি ইত্যাদি মাটির মিশ্রণ থেকে আলাদা হয়। এরপর মিশ্রণটিকে একখানি চটের উপর ঢেলে দিতে হবে। এই মিশ্রণটি চটের একদিন রেখে রৌদ্রে দিলে জল কিছুটা শুকিয়ে যাবে। মাটিটাকে নিয়ে ময়দা ঠাসার মত করে মাখতে হবে। যাতে মাটির ভেতর কোনো বাতাস না থাকে এবং ছোট দানা, কাঁকর থাকলে বের করে দিতে হবে, যখন মাটিটা হাতের তালুতে নিয়ে দলা করে পাকালে, যদি দেখা যায় মাটি হাতে না লাগে। তাহলে বোঝা যাবে মাটি কাজের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

মাটি সংরক্ষণ ঃ

মাটি প্রস্তুত করার পর সংরক্ষণ করা জরুরি। প্রস্তুত মাটি সবটাই একদিনের কাজে নাও লাগতে পারে। প্রয়োজনে বেশ কয়েকদিন ধরে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেজন্য মাটি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রস্তুত মাটিকে ভেজা সুতির কাপড় চারিদিক দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে। অবশ্য এজন্য মাটিকে বড়ো আকারের তালের মাপ করে নিতে হবে। এতে ভেজা কাপড় চারিদিক দিয়ে মোড়া যাবে। এরপর একটা পলিথিন সিট দিয়ে মুড়ে দিতে হবে মাটিটাকে দড়ি দিয়ে ভালোকরে বেধে রাখতে হবে, যাতে মাটির গায়ে কোনো হাওয়া না লাগে। এইভাবে মাটি রেখে দিলে দীর্ঘদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

মাটির কাজের যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঃ

মাটির কাজ করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম প্রয়োজন, সাধারণভাবে মৃৎশিল্পীরা নিজেদের মাটির কাজের সরঞ্জাম নিজেরা তৈরি করে নেয়। বর্তমানে বাজারে এ ধরনের যন্ত্রপাতি কিনতে পাওয়া যায়। যথা — মডেলিং টুলস (Modelling tools), তারকাঠি, স্ক্র্যাপার (Scrapper), রিভলভিং টেবিল, কাঠের স্ট্যাম্প সাপোর্টার (Wood stamp supporter), কাঠের হাতুড়ি (Solid wood mallet), আপ্রোন (Apron), ছুরি, স্পঞ্জ, কাপড়ের টুকরো বা টাওয়েল, স্প্রে মেশিন, কাঠের পাটাতন, তুলি, ছাঁকনি, রং, বার্নিশ প্রভৃতি।

মাটির কাজ করার বিভিন্ন পদ্ধতি

মাটির কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন — কয়েলিং, স্কুপিং, ছাঁচ, আর্মেচার, মডেলিং, কারভিং।

কয়েলিং — মাটির কাজের প্রাচীনতম প্রক্রিয়া হল কয়েলিং বা কুণ্ডলীকৃত প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে মাটিকে সরু দড়ির আকারে পাকিয়ে নিতে হয়। এরপর এই মাটির সরু রিবনটিকে পেঁচিয়ে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে

চাক প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে এই পদ্ধতিতে পাত্র বানানো হত। এই পদ্ধতির বিশেষ সুবিধে হল এটি অত্যন্ত সরল ও কম দক্ষতাসাপেক্ষ। এছাড়া এই পদ্ধতির সরলতার জন্য এটিতে যে-কোন আকারের, যে-কোন মাপের পাত্র বানানো সম্ভব। বর্তমান ভাস্কররা এই পদ্ধতিটি বহুলভাবে ব্যবহার করেন। বিশেষ করে ভেতরে ফাঁপা ও বড়ো মাপের অবয়বের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ভেতরে ফাঁপা হওয়ার কারণে এগুলি সলিড মূর্তির থেকে হালকা হয় যা পরিবহণের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। এছাড়া এই ধরনের ফাঁপা মূর্তি শুকিয়ে পুড়িয়ে টেরাকোটা বানানো অনেক বেশি সুবিধাজনক। বড়োমাপের মূর্তির ক্ষেত্রে আর্মেচার দরকার হয়। কিন্তু কয়েলিং পদ্ধতিতে তা দরকার হয় না।

স্কুপিং — স্কুপিং পদ্ধতিতে নিরেট মূর্তি তৈরি করে নীচের দিক থেকে আস্তে আস্তে কুরে ভেতরটা ফাঁপা করা হয়। এই কাজ অত্যন্ত সাবধানে করতে হবে। সবজায়গায় দেওয়ালের বেধ যেমন সমান থাকে। কোথাও বেশি মোটা বা কোথাও খুব পাতলা না থাকে। তাতে শুকোনোর হারের তারতম্য ঘটে। মূর্তি ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ছোটো মূর্তির দেওয়াল ১/২ ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি রাখা হয় এবং বড়ো মূর্তির দেওয়াল ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি রাখা হয়। ছোটো মাপের নিরেট মূতির টেরাকোটা সহজে করা গেলেও, বড়ো মাপের মূর্তির টেরাকোটা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন স্কুপিং পদ্ধতি ব্যবহার করলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ছাঁচ (Mould) — মাটির কাজের ক্ষেত্রে ছাঁচ সবথেকে জনপ্রিয়। মূল মূর্তির ছাঁচ তৈরি করা থাকলে, তার থেকে একাধিক মূর্তি নির্মাণ সম্ভব। চারুশিল্পী থেকে কারুশিল্পী সবার কাছে ছাঁচ খুব জনপ্রিয়। ফাঁপা বা নিরেট যে-কোনো মূর্তির ছাঁচ ব্যবহার করা হয়। ছাঁচ দু রকমের হয় (১) Waste Mould (২) Piece Mould.

আর্মেচার — ছোটো মাপের মূর্তির ক্ষেত্রে আর্মেচার বা অভ্যন্তরীণ কাঠামো দরকার হয় না। কিন্তু বড়ো মূর্তি নির্মাণ করতে আর্মেচারের প্রয়োজন। আর্মেচার এক্ষেত্রে মূর্তিটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। ভারতবর্ষে বড়ো ধরনের মূর্তির ক্ষেত্রে একটি বা একাধিক কাঠের দণ্ডকে অবলম্বন করে কাঠামো তৈরি হয়। মূলত খড় দড়ি দিয়ে বেঁধে মূর্তির আদল আনা হয়। এই কাঠামো নির্মাণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করতে হয়। কাঠামো যদি ঠিক না হয়, তাহলে মূর্তি ভেঙে যেতে পারে বা ভারসাম্য হারিয়ে যেতে পারে । এই খড়ের কাঠামোর উপর মাটি লাগিয়ে মূর্তির রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়। আমাদের দেশে প্রতিমা শিল্পীরা এইভাবে আর্মেচার তৈরি করে কাজ করেন।

আধুনিক ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তার, সুতলি, লোহার রড প্রভৃতি ব্যবহার করে আর্মেচার বাঁধা হয়। সাধারণত, মূর্তি যে মাপের হয় আর্মেচার তার থেকে একটু ছোটো হয়। আর্মেচার পদ্ধতি ত্রিমাত্রিক মূর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

মডেলিং (Modelling) — মডেলিং হচ্ছে উপর থেকে মাটি চাপিয়ে যে কাজ করা হয়। এক্ষেত্রে আর্মেচারের উপরে মাটি চাপিয়ে মডেলিং করা হয়। এই পদ্ধতি ভাস্করদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। আর্মেচারের উপর মাটি দিয়ে কাজ হয়ে গেলে ছাঁচ তৈরি করা হয়। ছোটো কাজের ক্ষেত্রে আর্মেচার ছাড়া মাটি চাপিয়ে কাজ করা হয়।

কার্ভিং (Curving) — মডেলিং-এর উলটো পদ্ধতি হচ্ছে কার্ভিং। মাটি কেটে বার করে কাজটা করা হয়। রিলিফের কাজের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

মাটির কাজের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হল। তবে দু-তিনরকম পদ্ধতি মিলেও মাটির কাজ করা হয়। মাটির কাজের মূর্তি থেকে ছাঁচ তৈরি করে ব্রোঞ্জ, ফাইবার, প্লাস্টার ইত্যাদি মাধ্যমে পরিবর্তিত করা হয়।

২.৬.১ ত্রিমাত্রিক বস্তু তৈরি

বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির আকার তৈরি। যেমন- গোল, শঙ্কু, সিলিন্ডার, পিরামিড, ঘনক তৈরি। মাটি দিয়ে এই বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারগুলি তৈরি করতে হবে। পরে একদম শুকিয়ে গেলে সাদা রঙ করতে হবে। তরপর ইচ্ছে অনুযায়ী রঙ করতে হবে।

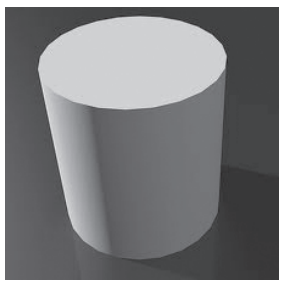

২.৬.২ রিলিফের কাজ বা মাটির ফলকের কাজ

মাটির রিলিফের কাজ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মন্দির, মসজিদ স্থাপত্যে শিল্পে দেখা যায়। বিশেষভাবে বাংলা বা অবিভক্ত বঙ্গদেশে পোড়া মাটির রিলিফের কাজ বিখ্যাত। দু'ধরনের রিলিফ দেখা যায়।

(ক) High Relief অর্থাৎ বেশি গভীরতাযুক্ত মাটির কাজ

(খ) Low Relief অর্থাৎ কম গভীরতাযুক্ত মাটির কাজ

পদ্ধতি

- ➢ প্রথমে মাটির চৌকো প্লেট তৈরি করতে হবে। যার পরিমাপ হল ৬ ইঞ্চি লম্বা, ৪ ইঞ্চি চওড়া এবং ১ ইঞ্চি গভীরতা।
- ➢ মাটির প্লেটের উপর কাঠি বা তার দিয়ে ড্রইং করে নিতে হবে।

- ➢ কোন অংশ উচু থাকবে বা কোন অংশ নিচু থাকবে তা ঠিক করে নিয়ে, নীচু অংশের মাটি তার দিয়ে কেটে তুলে নিতে হবে। এছাড়া জেমস ক্লীপ ব্যবহার করে এই মাটি কাটার কাজ করা যেতে পারে।

➢ যখন মাটি শুকিয়ে আসবে, তখন মাটির উপরিতল ঘষে ঘষে মসৃণ করতে হবে।

➢ শেষে সাদা রঙ ব্যবহার করে। প্রয়োজন অনুযায়ী রঙ করতে হবে।

২.৬.৩ মাটির খেলনা, ফল, পশু ইত্যাদি তৈরি

মাটির ফল, খেলনা, পশু ইত্যাদি হাতের চাপ দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনে মাটির কাজের চিয়াড়ি বা তার ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার মাটির লেচি তৈরি করে কুন্ডলিকৃত প্রক্রিয়ায় মাটি ফুলদানি, কলসি, হাঁড়ি ইত্যাদি তৈরি করা যায়। কখনও পশু বা পাখির বা মানুষ তৈরিতে তার বা কাঠি মাটির ভেতরে দিলে সহজে মাটিটাকে ধারণ করে রাখা যায়। শেষে শুকিয়ে সাদা রঙ করে বিভিন্ন রঙ করতে হবে।

২.৭ ছাপচিত্র (Graphics)

Graphics Ÿ শব্দটি গ্রীক Graphia থেকে এসেছে। এর অর্থ হল কোনো সমতল ক্ষেত্রের উপর কোনো চিত্র ফুটিয়ে তোলা। তা print হতে পারে বা প্রতিচ্ছবি হতে পারে। Graphics শিল্পের মধ্যে লেখাও থাকতে পারে। অর্থাৎ দেওয়াল, কাগজ, ক্যানভাস, পাথর বা কম্পিউটার স্ক্রিন-এর উপর রেখা চিত্র, গ্রাফ, সংখ্যা, চিহ্ন, রঙ, জ্যামিতিক, অলংকরণ , ম্যাপ, ফটোগ্রাফ, লেখা প্রভৃতির সাহায্যে যে চিত্র করা হয়, তাকেই গ্রাফিক্স বলে।

প্রথম গ্রাফিক্স শিল্প নতুন প্রস্তর যুগে গুহাচিত্রের গায়ে পাওয়া যায়। এগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, ঋতু ইত্যাদিতে ব্যবহার করেছে। কিছু গ্রাফিক্স পাওয়া গেছে পাথরের উপর খোদাই করা অবস্থায়। মিশরে প্যাপিরাসের উপরে পিরামিডের কিছু নকশাও পাওয়া যায়। ৬০০ খৃঃপূঃ থেকে ২৫০ খৃঃপূঃ মধ্যে গ্রীকরা গ্রাফিক্সের ব্যবহার জ্যামিতির ক্ষেত্রে করেছিল।

চীনদেশে প্রথম ছাপাই ছবি দেখা যায়। যদিও প্রাচীন গুহাচিত্রে ও হাতের ছাপা পাওয়া গেছে। কাগজ আবিষ্কারের পর এই পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শুরু হয়। ছাপাই ছবির একটা ছাঁচ থাকে। যার থেকে অনেকগুলি ছাপ নেওয়া হয়। যে অংশটার ছাপ নেওয়া হয় তা অপেক্ষাকৃত উচু হয়ে থাকে। তাতে রঙ লাগিয়ে ছাপা নেওয়া হয়। ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা হয় যেমন—ধাতু, লিনোশিট, পাথর ইত্যাদি। দু'রকমভাবে ছাপচিত্র করা হয়। (ক) কোনো Surface খোদাই করে। (খ) শুধুমাত্র হাত, আঙুল বা রঙের ছাপের মাধ্যম।

২.৭.১ উডকাট বা লিনোকাট

উডকাট বা লিনোকাট কাপড়ের উপর নকশা করার জন্য শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা উন্নত হয়ে ছাপাখানায় ব্যবহৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠে নন্দলাল বসুর আঁকা চিত্র গুলি এই মাধ্যমে করা।

বৈশিষ্ট্য ঃ

- এই মাধ্যমে সরাসরি ছবি আঁকা যায় না
- একবার প্লেট তৈরি হলে অনেকগুলি ছাপ নেওয়া যায়।
- একসময় মুদ্রন শিল্পে -এর বহূল ব্যবহার ছিল।

উপকরণ ঃ উড বা লিনো, উড কাটার যন্ত্রপাতি, Printing Ink, রোলার, বড় চামচ, কাগজ ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ

- ➢ প্রথমে উড বা লিনোশিটের উপর ড্রইং করে নিতে হবে।
- ➢ যে অংশটায় রঙ লাগানো হবে তা রেখে বাকি অংশটা কেটে ফেলতে হবে।
- ➢ শেষে ছাপার কালি রোলারের সাহায্যে উড বা লিনোশিটের উপর লাগাতে হবে।
- ➢ কাগজ উল্টোকরে উড বা লিনোশিটের উপর রেখে বড় চামচের পেছন দিয়ে ঘষে ঘষে ছাপ তুলতে হবে।
- ➢ একাধিক রঙ ব্যবহার করলে একাধিক কাঠের ব্লক তৈরি করে নিতে হবে।

২.৭.২ আলু বা ঢেঁড়সের ছাপ

আলু ও ঢেঁড়স বা অন্য সবজীর ক্ষেত্রে কেটে নিয়ে তুলি দিয়ে বা প্যালেটের উপর রঙে ডুবিয়ে ছাপ নিতে হবে। ঢেঁড়স কাটলে ফুলের মত ডিজাইন তৈরি হয়। তার ছাপ ঠিকভাবে নিলে সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

২.৭.৩ ষ্টেনসিল

ষ্টেনসিলও একধরনের ছাপ চিত্র। কোনো মোটা কাগজ বা টিন কেটে এটি তৈরি করা হয়।

পদ্ধতি ঃ

- ➢ প্রথমে কাগজ বা টিনের উপর ড্রইং করে নিতে হবে।
- ➢ যে অংশটায় রঙ হবে তা কেটে ফেলতে হবে।
- ➢ এরপর তুলো, স্পঞ্জ বা কাপড়ের পুঁটলি করে রঙ লাগিয়ে আর একটি কাগজের ওপর ছাপ নিতে হবে।

২.৭.৪ আঙুলের ছাপ ও হাতের ছাপ

আঙুল বা হাতে রঙ লাগিয়ে ছাপ নিতে হবে। পরে ছাপ দেখে দু' একটি দাগ দিয়ে বিভিন্ন জীবজন্তু, পাখি, মানুষের আকার দিতে হবে।

২.৭.৫ মনোপ্রিন্ট

একটি কাঁচের উপর রঙ তুলি দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ছবি আঁকতে হবে। শুধু মোটা লাইন ব্যবহার করে এই কাজ করলে ভালো হয়। রঙে জলের পরিমাণ বেশি রাখতে হবে। যাতে রঙ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে না যায়। এরপর একটি কাগজ নিয়ে কাঁচের উপরের চিত্রটির উপর চেপে ধরে ছাপ নিতে হবে। এই পদ্ধতিতে একটাই ছাপ নেওয়া হয় বলে একে মনোপ্রিন্ট বলে।

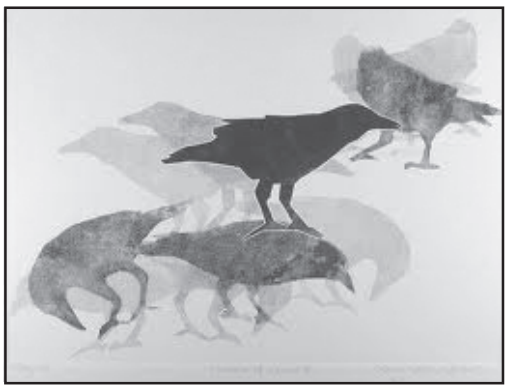

২.৮ সারসংক্ষেপ (Let us sum up)

এই অধ্যায়ে চারুশিল্প ও কারুশিল্পের করণকৌশল ও বিভিন্ন ব্যবহারিক দিকে দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ছবি আঁকতে অনুপাত, পরিপ্রেক্ষিত, আলোছায়া ও কম্পোজিশন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। ছবির রঙ, তুলির ব্যবহার করতে জানা জরুরী। রঙ দু'রকম পাওয়া যায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক রঙ। লাল, নীল, হলুদ প্রাথমিক রঙ। বাকিগুলি সব মাধ্যমিক রঙ কারণ এই রঙগুলি অন্যরঙের সংমিশ্রণে তৈরি হয়। জলরঙ দুরকম পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। (ক) স্বচ্ছ (খ) অস্বচ্ছ। অক্ষর লিখনও চারু ও কারুশিল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলা ও ইংরেজি হরফে বিভিন্ন শৈলিতে অক্ষর পাওয়া যায়।

কোলাজ শিল্পমাধ্যমের আরেকটি অন্যতম মাধ্যম। খুব কম খরচে, রঙের বিকল্প হিসেবে কোলাজ ব্যবহার করা হয়। কাগজের কাজের মধ্যে পেপার কাটিং, অরিগামি, পেপার ম্যাসে, কাগজ ও কার্ডবোর্ডের কাজ উল্লেখযোগ্য। সহজলভ্য উপাদান মাটি, তা দিয়েও বিভিন্ন পদ্ধতিতে নানারকম কাজ করা যায়। যেমন— জ্যামিতিক আকৃতি, রিলিফের কাজ, খেলনা, পশু, পাখি ইত্যাদি তৈরি।

এছাড়া ছাপচিত্র (Graphics) আরও একটা উল্লেখযোগ্য শিল্পমাধ্যম। উডকাট বা লিনোকাট, ষ্টেনসিল, আলু বা ঢেঁড়সের ছাপ ব্যবহার করে ছাপচিত্র করা হতে পারে। অনেকগুলি ছাপ নেওয়া যায় অর্থাৎ একই ছবি অনেকগুলি তৈরি করা যায়। এছাড়া মনোপ্রিন্ট, হাতের ছাপ, আঙুলের ছাপ ইত্যাদি দিয়েও ছাপচিত্র নেওয়া যায়।

চারু ও কারুশিল্পে ব্যবহারিক কাজ যত বেশি অভ্যাস করা যাবে, তত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

২.৯ অনুশীলনী (Exercise)

(ক) শিল্প কাকে বলে?

(খ) ছবি আঁকার ক্ষেত্রে চারটি ধারণা কী কী?

(গ) পরিপ্রেক্ষিত কাকে বলে?

(ঘ) Still life কাকে বলে?

(ঙ) শীতল ও উষ্ণ রঙ কাকে বলে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(চ) পাঁচটি লাল রঙের নাম লিখুন।

(ছ) কোলাজ শব্দটি কোথা থেকে উৎপত্তি?

(জ) কাগজ কোথায় আবিষ্কৃত হয়?

(ঝ) Paper Mache তৈরির পদ্ধতি আলোচনা করুন।

২.১০ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন—এর উত্তর (Answer to check your progress)

(ক) যে রঙ অন্য কোন রঙের দ্বারা প্রভাবিত নয় এবং নিজস্বতা আছে। যেমন—লালা, নীল, হলুদ।

(খ) লেমন ইয়েলো, গ্যামবোজ, ইয়েলো আকার

(গ)

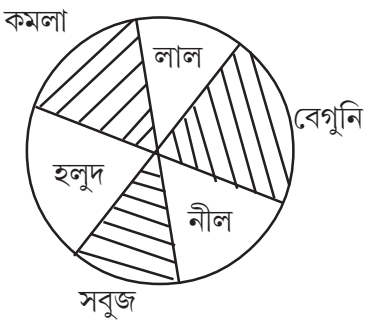

(ঘ) হলুদ + নীল = সবুজ

(ঙ) Light to dark পদ্ধতি।

তথ্যসূত্র ঃ-

১। Art Education, NCERT

২। প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষায় কৃৎকলা, চারুশিল্প, স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা, এ. মুখোপাধ্যায় ও বি. দত্ত, রীতা পাবলিকেশন।

কর্মশিক্ষা

Work Education

একক ৩
কর্মশিক্ষা (Work Education)

গঠন

৩.১ সূচনা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ কর্মশিক্ষার পরিধি

৩.৪ গান্ধিজীর সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা

৩.৫ অন্যান্য বিষয়ের সংগে সম্পর্কযুক্ত কর্মপ্রকল্প

৩.৬ আঞ্চলিক কারুশিল্পের ধারণা

৩.৭ কর্ম শিক্ষাকে শিক্ষায় প্রয়োগ ঘটানোর পদ্ধতির নীতি

৩.৮ কর্মপত্রের পরিকল্পনা ও কর্মসম্পাদন

- ৩.৮.১ পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা
- ৩.৮.২ ফুলের বাগান
- ৩.৮.৩ মাটির কাজ
- ৩.৮.৪ কাগজের শিল্প
- ৩.৮.৫ পাপেট
- ৩.৮.৬ খেলনা তৈরি
- ৩.৮.৭ বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স জিনিষপত্রের মেরামতি

৩.৯ কর্মশিক্ষার মূল্যায়ন

৩.১০ পাঠ্যক্রম প্রক্রিয়াকরণের সুপারিশ সমূহ

৩.১১ সারসংক্ষেপ

৩.১২ অনুশীলনী

৩.১৩ আপনার ''অগ্রগতি যাচাই'' করে নিন-এর উত্তর

৩.১ সূচনা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ১৯৭৪ সালে সিলেবাসে প্রথম কর্মশিক্ষাকে অন্তর্ভূক্ত করেন। ১৯৬৪-৬৬ সালে কোঠারি কমিশন প্রথম কর্মশিক্ষাকে শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব দেন। কমিশন চারটি মৌলিক বিষয়কে সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে দেখার সুপারিশ করেছিলেন। তা হলো — (ক) সাক্ষরতা (খ) সংখ্যা জ্ঞান (গ) সমাজসেবা (ঘ) কর্ম-অভিজ্ঞতা।

কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাই হল কর্মশিক্ষা। কাজ করতে শেখা, কাজের দ্বারা শেখা ও কাজের সংগে সম্পৃক্ত সবকিছুকে শেখা। এই তিনের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে কর্মশিক্ষার ধারণা। "Work Education is a method of integration of education with work" বা "Work Education is a process for the development of total personality of an individual for social living in the world of work." অর্থাৎ কর্মশিক্ষা বলতে বুঝি ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য কাজ করতে শেখা, কাজের মধ্য দিয়ে শেখা ও কাজের বিষয়ে যা জানবার আছে তা শেখার মাধ্যমে কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থী-শিক্ষক যে বিষয়গুলি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করবেন এবং অপরকে বোঝাতে বা শেখাতে সক্ষম হবেন—

- বৃহত্তর সমাজের পরিবেশের সংগে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো এবং শিক্ষার্থীকে কাজের জগতের সংগে পরিচিত করানো।
- শ্রম ও স্বনির্ভরতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব ও অভ্যাস গঠন করা।
- শিক্ষার্থীর সৃজনশীল মনোভাবের বিকাশ ঘটানো।
- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও পটুত্ব বৃদ্ধি করা।
- উৎপাদনাত্মক কাজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা গঠন ও দক্ষতা বৃদ্ধি।
- উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহারের প্রতি সদর্থক মনোভাব ও সামর্থ গড়ে তোলা।
- বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ অংক, বিজ্ঞান, ভাষা ইত্যাদিতে সম্পৃক্তকরণ।
- বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা ও কাজের মাধ্যমে কর্মশিক্ষা করানো।

৩.৩ কর্মশিক্ষার পরিধি (Scope of Work Education)

যে কোনো অর্থবহ উৎপাদনাত্মক কায়িক পরিশ্রম সাপেক্ষ কর্মই কর্মশিক্ষার অন্তর্গত।

সময়ের উপযোগী পণ্যদ্রব্য উৎপাদন কর্মশিক্ষার অন্তর্গত। বিদ্যালয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের বিকাশ ঘটানো। চারটি বিকাশ এক্ষেত্রে দেখা যায়। যথা—(ক) স্বাদেশিকতার বিকাশ (খ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ (গ) মনের ও দেহের বিকাশ (ঘ) আর্থিক বিকাশ।

কর্মশিক্ষার কর্মপরিধির মধ্যে রয়েছে প্রধান তিনটি ক্ষেত্র — বিদ্যালয়, গৃহ ও সমাজ পরিবেশ। কর্মের একটি প্রধান ক্ষেত্র হলো বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাগ দেখা যায়, কোনো বিদ্যালয় শহরকেন্দ্রিক বা কোনো বিদ্যালয় গ্রামকেন্দ্রিক। কোনো বিদ্যালয়ে জমি আছে, যন্ত্রপাতি আছে, আবার কোথাও তা নেই। কর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো কাজ দলগতভাবে করতে হবে, কোনটা বা একা করতে হবে।

কর্মের দ্বিতীয় প্রশস্ত ক্ষেত্র হলো গৃহ পরিবেশ। এখানেও কর্মশিক্ষার শিক্ষার্থীরা কর্মসম্পাদনের সময় উন্নয়ন ও অপচয় নির্ধারণের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারলে পারিবারিক পরিবেশ উপকৃত হতে পারে।

তৃতীয় প্রধান ক্ষেত্র হলো সমাজ পরিবেশ। সমাজ-পরিবেশের বিভিন্ন কর্মসূচীকে সংগঠিত করে কর্মশিক্ষার প্রকরণ হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব। বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করে অনেক কর্মকেই যৌথ কর্মরূপে গড়ে তোলা যায়।

৩.৪ গান্ধিজীর বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা : (Gandhiji's concept of basic education, work & livelihood)

কর্ম ও বাল্য কালের মধ্যে কি সম্পর্ক

কর্মের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমের নীরস এক ঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি দেয়। গান্ধিজী কায়িক শ্রম সম্পর্কে সশ্রদ্ধ করে তোলে শিক্ষার্থীকে এমন শিক্ষার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সমস্ত রকম সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। শিক্ষায় চরম লক্ষ্য বস্তুতান্ত্রিক , এটি একপ্রকার আধ্যাত্মিক উন্মেষন।

তিনি বলেন শিক্ষা হবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক, বাহন হবে মাতৃভাষা। কর্মের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবহারিক বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্রদান করতে হবে শিক্ষার্থীর প্রারম্ভ কালীন জীবনে। হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে শিশুকালে। যেমন— সুতোকাটা, তাঁত বোনা , চাষীদের কাজ, ধাতুর কাজ, ছবি আঁকা, সংগীত বাধ্যতামূলক । শরীর চর্চার ব্যবস্থা বাল্যকালের কর্মে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৩.৫ অন্যান্য বিষয়ের সংগে সম্পর্কযুক্ত কর্মপ্রকল্প (Work Activities relating to Science, Mathematics, Social Studies, Language)

কর্মপ্রকল্পগুলি করার সময় তা বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান এক্ষেত্রে কাজে লাগে। যেমন ফুলের বাগান কর্মপ্রকল্প হিসেবে করার ক্ষেত্রে প্রথমেই বাগানের মাপ নিয়ে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে গণিতের পাটিগণিত ও জ্যামিতি ব্যবহৃত হবে। কোন ফুল কোন ঋতুতে হবে, অঞ্চল ভেদে কোন ফুলের বাগান ভালো হবে, বা কোন মাটিতে কোন ফুল ভাল হবে এ সম্পর্কে ভৌগলিক জ্ঞান শিক্ষার্থীর হবে। উদ্ভিদের শ্রেণি বিভাগ, সালোকসংশ্লেষ ও শ্বাসকার্য, ইত্যাদি বিজ্ঞান অন্তর্ভূক্ত বিষয়। আবার ফুলের চাষের ইতিহাস ও ফুল সম্পর্কে প্রবন্ধ যথাক্রমে ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত। যে কোনো কর্মপ্রকল্প অন্যান্য বিষয়ের সংগে সম্পর্কযুক্ত অবশ্যই হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকেরা কর্মপ্রকল্প সম্পাদন করতে সাহায্য করতে পারেন।

কর্মপ্রকল্পগুলির শিক্ষোপকরণ হিসেবে ব্যবহার

যে কোনো কাজ তৈরি করে তা শিক্ষোপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, মাটির কাজের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে তা দিয়ে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার তৈরি করতে হবে। এরপর তা শুকিয়ে গেলে জ্যামিতির ক্ষেত্রে শিক্ষোপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এভাবে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিষয়টির উপর ধারণা সুদৃঢ়ভাবে বিকাশলাভ করবে।

৩.৬ আঞ্চলিক কারুশিল্পের ধারণা (Concept of Local crafts)

আমাদের বিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত। এক জেলা থেকে আরেক জেলার কারুশিল্প আলাদা। প্রত্যেক অঞ্চলে বংশপরম্পরায় কিছু কারুশিল্প চলে এসেছে। উত্তরবঙ্গে যেমন বাঁশ ও বেতের কাজের লোকশিল্প প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় তেমনি পূর্বমেদিনীপুরে মাদুর শিল্প দেখা যায়। নদীয়ার কৃয়্ণনগর অঞ্চলে মাটির পুতুল বা বাঁকুড়ার পাঁচমুরাতে পোড়ামাটির কাজ দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে কমবেশি কারুশিল্প দেখা যায়। নিজের অঞ্চলের কারুশিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দরকার। কারুশিল্পগুলি চিহ্নিতকরণ করে তা থেকে সম্যকজ্ঞান লাভ প্রয়োজন।

কারুশিল্পীর সাক্ষাৎকার (Interviews with local craftsmen)

শিক্ষার্থীরা কিছু প্রশ্ন তৈরি করে আঞ্চলিক কারুশিল্পীর সাক্ষাৎকার নিতে পারে। এভাবে তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানবে। বিশেষ করে এ ধরনের শ্রমের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে। বংশ পরম্পরায় যে শিল্প চলে আসছে তার ইতিহাস, ভৌগলিক অবস্থানের সুবিধা, বাজারে বিক্রী, কাঁচামাল সংগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে জানবে। এ ধরনের সাক্ষাৎকার ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে কাজ দেবে।

আঞ্চলিক কারুশিল্প ও শিল্পীদের উপর প্রতিবেদন তৈরি (Preparation of reports on the local crafts and craftsmen)

প্রত্যেক শিক্ষার্থী আঞ্চলিক কারুশিল্পীর ও শিল্পীদের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করবে। নিচে প্রতিবেদনে কি কি থাকতে পারে তা দেওয়া হলো।

(ক) কারুশিল্প সম্পর্কে ধারণা

(খ) অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য

(গ) কারুশিল্পের ইতিহাস

(ঘ) কারুশিল্পের পদ্ধতি

(ঙ) বাজারের চাহিদা

(চ) উন্নতির জন্য পদক্ষেপ

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—১ (Cheek your progress-1)

(ক) কত সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষদ কর্মশিক্ষাকে সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করে?

——

——

(খ) ফুলের বাগান তৈরিতে কোন্ কোন্ বিষয় সম্পর্কে জানা যায়?

——

——

(গ) মাদুরশিল্প কোন্ জেলাতে বিখ্যাত?

——

——

৩.৭ কর্ম শিক্ষাকে শিক্ষায় প্রয়োগ ঘটানোর পদ্ধতির নীতি (Strategies for Promotion of Work Education Programme)

কর্ম শিক্ষা করতে গিয়ে অর্থাৎ হাতে কলমে কাজ করতে গিয়ে পাঠ্যসূচীর যে সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে হাতের কাজের প্রত্যক্ষ যোগ আছে (যথা পুতুল তৈরি, কাঠের কাজ, হাতের কাজ, চাষবাসের কাজ) সেগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। বিদ্যালয়ে কেবল মাত্র তাত্ত্বিক শিক্ষার ওপর নির্ভর না করে অথবা ধরা বাঁধা রুটিন অনুসরন না করে ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষিকার সমস্ত সঞ্চিত শক্তি অযথা নষ্ট না করে তরুণ শক্তিতে ভরপুর বিদ্যালয়গামী লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহন করাতে পারলে শিক্ষার আনন্দ যেমন বাড়বে, তেমনি দেশের ভবিষ্যত নাগরিক বা নতুন প্রজন্মের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটবে এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, অবসর বিনোদন, সু-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজ দিয়ে তারা তাদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন গুলি মেটাতে পারবে। মহত্মা গান্ধীর বক্তব্য অনুযায়ী ''শিখতে শিখতে উপার্জন কর''। এই হল শিক্ষার অভ্যন্তরে কর্ম শিক্ষার অর্ন্তভুক্তির মূল কারণ।

কর্ম শিক্ষাকে কিভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় কার্য্যকরী করে তোলা যায়, তা ব্যবহারে শিক্ষাবিদরা প্রথম পর্যায়ে জটিলতায় ভুগলেও পরবর্তীতে তার প্রয়োগ ঘটাতে সমর্থ হয়। শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে তদন্ত করে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষায় কর্মের স্থান থাকলে শিশুরা পরস্পরের সহযোগীতায় এমন কাজে মনোযোগী হয়ে উঠবে যা সমাজের মৌলিক চাহিদা গুলির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। বিদ্যালয়ের অন্য পাঠের সাথে কর্ম শিক্ষাকেও অর্ন্তভুক্ত করলে এই কাজ সহজ হবে।

১৯৮২ সালের জানুয়ারী থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন পাঠ্যসূচীতে কর্ম শিক্ষা স্থান পাওয়ায় এই কাজ অনেক সহজ হয়েছে।

কর্ম শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো : (Skill Development through work education)

কর্ম শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব। অর্থাৎ কর্মে সাধারণ পটুত্ব অর্জিত হয়। একটা কাজ পাঠ্যক্রমের মধ্যে দিয়ে শিখে বারে বারে করতে করতে একজন দক্ষ ব্যাক্তিতে পরিণত হয় শিক্ষার্থীরা। কাজের মধ্য দিয়ে শিখে নেবার ফলে পরবর্তীতে সেই কাজ করতে ও ভুল খুবই কম হয়।

যেমন - ধরা যাক, একজন শিক্ষার্থী পুতুল তৈরি করতে শিখলে বা কাঠের কাজ শিখলে পরবর্তীতে সে আর ঐ কাজ ভুলবে না। উপরন্তু একজন দক্ষ কর্মীতে পরিণত হবে, যেহেতু সে খেলার ছলে কর্মের মধ্যে দিয়ে বিষয়টিকে রপ্ত করেছে।

কর্ম অভিজ্ঞতা : (Work Excercise)

কোঠারী কমিশনের মতে কর্ম অভিজ্ঞতা হল ঃ উৎপাদনশীল কর্মের সঙ্গে শিক্ষার আঙ্গীকরণ ই হল কর্ম অভিজ্ঞতা। কাজকে সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে গেলে কর্মক্ষেত্র থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় তাই হল কর্ম অভিজ্ঞতা। প্রত্যেক কর্মেই একটি সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়, যা ভবিষ্যত কর্ম সম্পাদনের কাজে লাগে।

এস, ইউ, পি, ডব্লু : (SUPW) S - Socially, U - Usefull, P - Productive, W - Work (Socially useful Productive Work)

বাংলায় বলা যায় সমাজোপযোগী উৎপাদনাত্মক প্রকল্প। সমাজে বাস করতে গেলে প্রত্যাহিক জীবন যাত্রায় যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন হয়, তাকে তৈরি করার পরিকল্পনা ও উৎপাদন পরবর্তীতে ভুল হয় না। উপরন্তু ঐ ব্যক্তি একজন দক্ষ কর্মীতে পরিণত হবে। যেহেতু সে খেলার ছলে কর্মের মধ্যে দিয়ে বিষয়টিকে রপ্ত করেছে।

৩.৮ কর্মপত্রের পরিকল্পনা ও কর্মসম্পাদন (Designing and Organizing School- Based Activities)

৩.৮.১ পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা (Social Cleanliness)

কর্মশিক্ষা ও সমাজসেবা একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ শিক্ষার্থীর ভেতরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিকাশ ঘটায়। যথা —

(১) শিক্ষাভাবনা।

(২) সমস্যা সমাধানের পটুত্ব।

(৩) কায়িক শ্রমের বিকাশ।

(৪) শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার।

(৫) দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা।

বিভিন্ন দলে শিক্ষার্থীদের ভাগ করে কোনো একটি অঞ্চলে সাফাই অভিযান করা যেতে পারে। এই ধরনের কর্মপ্রকল্প শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি সমাজের সুন্দর আবহ সৃষ্টির উপযোগী হবে।

৩.৮.২ ফুলের বাগান (Gardening)

ফুলের বাগান করতে হলে প্রথমে ঠিক করতে হবে ঋতুভিত্তিক ফুল চাষ করা হবে, না, সারাবছরের ফুল চাষ অর্থাৎ দীর্ঘকালীন ফুল চাষ করা হবে। সেই অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। ধরা যাক শীতকালীন ফুল গাছের চাষ করা হবে। সুতরাং কর্মপ্রকল্পের ভাবনা স্বল্পকালীন হবে। কোন্ কোন্ ফুল বাগানে চাষ করা হবে তা ঠিক করতে হবে। ফুলের বাগান করতে হলে নিম্নে দেওয়া ধাপগুলি অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(ক) বাগান তৈরির পরিকল্পনা — জায়গা কতখানি, বেড়া দেওয়া, রোদ ও বাতাসের ব্যবস্থা, জলসেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

(খ) মাটি পরীক্ষা — মাটি ফুলের বাগানের পক্ষে উপযুক্ত কিনা বা কোন্ ফুল এই মাটিতে হবে প্রভৃতি।

(গ) মাটি বা জমি তৈরি করা — প্রয়োজন অনুযায়ী চূণ, গোবর সার প্রভৃতি ব্যবহার করা।

(ঘ) বীজতলা তৈরি — ভালো বীজ সংগ্রহ করে বীজতলাতে ব্যবহার করতে হবে।

(ঙ) গাছ রোপণ — বীজতলা থেকে গাছের চারা নিয়ে নির্দিষ্টভাবে গাছ রোপন করতে হবে।

(চ) পরিচর্যা — আগাছা পরিস্কার, ডাল ছাঁটাই প্রভৃতি করা প্রয়োজন।

৩.৮.৩ মাটির কাজ (Clay Work)

মাটির কাজ করতে হলে তিনটি পদ্ধতিতে কাজ করা যায় — (১) হাতের সাহায্যে (২) চাকার সাহায্যে (৩) ছাঁচের সাহায্যে

মাটি নির্বাচন

যে কোনো মাটি দিয়ে মাটির জিনিস তৈরি করা যাবে না। তাই মাটির কাজে মাটি নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণত মাটির কাজের জন্য এঁটেল মাটি ব্যবহৃত হয়।

মাটি তৈরি করা ঃ প্রথমে এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে বেশ কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে নরম করে নিতে হবে। মাটির মধ্যে কোনো পাথর, ইঁটের টুকরো, কাঠি প্রভৃতি বের করে দিতে হবে। এ ধরনের অবাঞ্ছিত জিনিস মাটিতে থাকলে পরে মাটির কাজ ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরপর অল্প পরিমাণে মাটি নিয়ে ভালোভাবে মাখতে হবে। প্রয়োজন মতো পাটের কুচো বা শন মেশানো যেতে পারে। মাটি ঠিকমতো তৈরি হলে তা হাতের তালুতে নিলে হাতে লাগবে না।

হাতের সাহায্যে বা ছাঁচের সাহায্যে মাটির কাজ

কাজের উপযুক্ত মাটি নিয়ে বিভিন্ন আকার, আকৃতি বা ফল বা পাখি বা জীবজন্তু তৈরি করা যেতে পারে। মাটির কাজ একদম শুকিয়ে গেলে রং করতে হবে। প্রথমে সাদা রং ও পরে মাটির কাজ অনুযায়ী রং করতে হবে। ছাঁচের সাহায্যে কাজ করতে হলে আগে ছাঁচ তৈরি করে নিতে হবে। তারপর তার থেকে মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরি করতে হবে।

৩.৮.৪ কাগজের শিল্প (Paper Craft)

১০৮ খ্রিস্টাব্দে চিনদেশে কাগজ আবিষ্কারের পর কাগজকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হতে থাকে। কাগজ ব্যবহার করে যে কাজ করা হয়, সেগুলি হল — কাগজের মণ্ড (Paper Pulp), পেপার ম্যাসে (Paper Mache), পেপার কাটিং (Paper Cutting), অরিগামি (Origami), কিরিগামি (Kirigami)। অলংকরণ থেকে শুরু করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাগজের কাজ ব্যবহার করা হয়। Paper শব্দটি লাটিন প্যাপিরাস থেকে এসেছে।

কাগজের মণ্ড (Paper Pulp)

পাল্প বা মণ্ড হচ্ছে আঁশযুক্ত যা রাসায়নিক বা যান্ত্রিকভাবে কাঠ, আঁশযুক্ত শস্য বা ফেলে দেওয়া কাগজ দিয়ে তৈরি করা হয়। কাগজের মণ্ডের ক্ষেত্রে কাগজকে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কাগজের আঁশকে ভেঙে ফেলা হয়।

প্রাচীনকালে মিশরীয়রা প্যাপিরাসের উপর লিখত যা প্যাপিরাস গাছ থেকে তৈরি হত। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে চিনে কাগজ আবিষ্কারের পর পাল্প বা মণ্ডও তৈরি হতে থাকে। বর্তমানে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্নক্ষেত্রে মণ্ডের ব্যবহার হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে মণ্ড তৈরির পদ্ধতির রকমফের দেখা যায়। কাশ্মীরে যেভাবে কাগজের মণ্ড তৈরি হয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তা একদম আলাদা। এখানে মণ্ডের সাথে গোবর, তুঁষ, মাটি ব্যবহার করা হয়। আবার রাজস্থানে মণ্ডের সাথে মুলতানি মাটি ব্যবহার করা হয়। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে মণ্ডের ব্যবহার সারা পৃথিবীতে হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের মুখোশ, বাক্স, গহনা, এমনকী আধুনিক শিল্পেও কাগজের মন্ড ব্যবহার করা হচ্ছে।

পেপার পাল্প বা কাগজের মণ্ড তৈরির পদ্ধতি ঃ

উপকরণ ঃ পুরোনো খবরের কাগজ, আঠা, স্ক্যাবার, স্পঞ্জ, শিলনোড়া বা মিহি করে পাল্প মেশানোর মেশিন, ছাঁচ, জল, পাত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ খবরের কাগজের টুকরো ছোটো করে ছিঁড়ে ২৪ ঘণ্টা জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে। যদি তাড়াতাড়ি কাগজ ভেজাতে হয়, তাহলে কয়েকঘণ্টা গরমজলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর অন্য একটি পাত্রে বা হামান দিস্তা বা মিক্সিতে ভালো করে মেশাতে হবে। যাতে কাগজের আঁশগুলি একেবারে মিশে যায়, খুব মিহি মণ্ড করতে চাইলে। শিলানোড়ায় বেটে নিতে হবে। তারপর অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে নিতে হবে। মার্কিন কাপড় এক্ষেত্রে ব্যবহার করা ভালো। এতে জল ভালোভাবে ঝরে যাবে। এরপর সেলুলোজ পাউডার আঠা বা জিলেটিন বা অন্য আঠা হাত দিতে মেশাতে হবে। আঠার পরিমাণ বেশি হলে চলবে না। তিন লিটার মণ্ডের সাথে ৫০ গ্রাম আঠা মেশাতে হবে। এরপর ঘণ্টা দুয়েক রেখে দিতে হবে। এই কাগজের মণ্ড একেবারে মাটির মতো হয়ে যাবে। এই মণ্ড দিয়ে ইচ্ছে মতো যে-কোনো কাজ করা যাবে। বর্তমানে ভাস্কর্য (Sculpture) তৈরি করা হচ্ছে মণ্ড ব্যবহার করে। মণ্ড তৈরি করে দিন দুয়েকের মধ্যে ব্যবহার করা সব থেকে ভালো। নাহলে মণ্ড নষ্ট হয়ে যায়। তবে যদি শক্ত করে আটকানো পাত্রে অর্থাৎ হাওয়া যাতে যা ঢোকে, সেইরকম পাত্রে ঠিকভাবে রাখলে কিছুদিন রাখা যায়।

কাগজের মণ্ডের কাজ তৈরি ঃ

কাগজের মণ্ড দিয়ে কোনো বস্তু তৈরি করতে হলে, সেই বস্তুর ছাঁচের প্রয়োজন হয়। সেই ছাঁচ প্লাস্টার বা প্লাস্টিক বা রাবার যাই হোক না, তা নিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। ছাঁচের উপর releasing agent ব্যবহার করতে হবে। কারণ এর ফলে কাগজের মণ্ড সহজে ছাঁচ থেকে উঠে আসবে। বাজারের releasing agent ব্যবহার করার চেয়ে নিজেরা তৈরি করে নিলে ভালো হয়। এক্ষেত্রে ওয়াক্সপোলের সঙ্গে তার্পিন তেল গরম করতে হবে। যতক্ষণ না ওয়াক্সপোল তার্পিনতেলের মধ্যে মিশে যায় ততক্ষণ একটা কাঠি দিয়ে নাড়াতে হবে। গরম অবস্থায় ভালোভাবে ছাঁচের উপর এই মিশ্রণটি দু থেকে তিবার লাগাতে হবে। অতিরিক্ত জলকে বের করে নেওয়ার জন্য স্পঞ্জ দিয়ে আস্তে আস্তে চেপে জল শুষে নিতে হবে।

এরপর কাগজের মণ্ডটি ধীরে ধীরে ছাঁচের উপর লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে ভাষ্কর্যের স্ক্র্যাবার ব্যবহার করে মণ্ডকে মসৃণ করতে হবে। দিন তিনেক সরাসরি রৌদ্রে শুকোতে দিতে হবে। বর্তমানে মাইক্রোওভেনে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শুকিয়ে নেওয়া যায়। মণ্ড শুকিয়ে গেলে ধীরে ধীরে ছাঁচের মধ্য থেকে বার করে নিতে হবে। যে জায়গায় মণ্ড ঠিকমতো মসৃণ হয়নি, সেখানে মণ্ড লাগিয়ে মসৃণ করে নেওয়া যেতে পারে।

পেপার পাল্পের কাজ

সবশেষে শুকিয়ে যাওয়ার পর সাদা রং করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি অ্যাক্রিলিক রং করা হয় তাহলে অ্যাক্রিলিক সাদা ব্যবহার করতে হবে। যদি পোস্টার রং ব্যবহার করা হয় তাহলে Zinc Oxide বা খড়িমাটি বা Whiting যে-কোনো সাদা রং নিয়ে সঙ্গে ফেভিকল ও জল মিশিয়ে পাতলা করে লাগাতে হবে। শেষে সাদা রং শুকিয়ে গেলে ইচ্ছেমতো রং দিয়ে অলংকরণ করা যাবে।

❑ **কাগজের মণ্ডের সুবিধে ঃ**

- কাগজের মণ্ডের কাজ অনান্য কাজের থেকে অনেক বেশি হালকা হয়। সেজন্য সহজেই অনেক কাজ বহন করা যায়।
- এক ছাঁচে অনেক কাজ উৎপাদন করা যায়।
- টেক্সচার তৈরি করে কাজের জন্য উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

- মাটির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মাটির পরিবর্তে মণ্ড উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায়।।
- ফেলে দেওয়া কাগজকে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।

❑ **কাগজের মণ্ডের অসুবিধে ঃ**

- কাগজের মণ্ড দীর্ঘস্থায়ী মাধ্যম হিসেবে থাকে না।
- মণ্ড তৈরি যথাযথ না হলে কাজ টেঁকসই হবে না।

পেপার ম্যাসে (Paper Mache)

পেপার ম্যাসে শব্দটা ফরাসি ভাষা থেকে এসেছে। একটা কাগজের স্তরের উপর আরেকটা স্তর লাগিয়ে পেপার ম্যাসে করা হয়। প্রাচীন মিশরে এই পদ্ধতিতে কফিন বা মুখোশ তৈরি হত। যদিও এক্ষেত্রে প্যাপিরাস বা কাপড় ব্যবহার করা হত। ভারতবর্ষের পেপার ম্যাসে মোঘলদের সময় পার্শিয়া থেকে এসেছিল। কাশ্মীরে বিভিন্ন বাক্স, ট্রে ইত্যাদিতে পেপার ম্যাসের ব্যবহার দেখা যায়। পুরুলিয়া জেলায় ছৌএর মুখোশে পেপার ম্যাসে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে থিয়েটার, পাপেট প্রভৃতি ক্ষেত্রে পেপার ম্যাসে খুবই ব্যবহার করা হয়।

পেপার ম্যাসের পদ্ধতি ঃ

উপকরণ ঃ পুরনো খবরের কাগজ, আঠা, রং, তুলি, বার্নিশ ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ খবরের কাগজ ছোটো ছোটো করে ছিঁড়ে নিতে হবে। যে ছাঁচে কাগজগুলি লাগানো হবে সেই ছাঁচটিকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর ছেঁড়া কাগজগুলি জলে ভিজিয়ে ছাঁচের উপর লাগাতে হবে। প্রথমে একটা বা দুটো স্তর জলে ভিজিয়ে ভালোভাবে ছাঁচটির উপর লাগাতে হবে। কারণ জলের স্তরের কাগজ আঠার স্তরের কাগজকে ছাঁচের সংস্পর্শে আসতে দেয় না। কাগজটা শুকিয়ে গেলে খুব সহজেই ছাঁচ থেকে উঠে আসে। তারপর ময়দা বা এরারুট দিয়ে তৈরি পাতলা আঠা দিয়ে কাগজের সাত থেকে আটটা স্তরের কাগজ লাগাতে হবে। এমনভাবে আঠা লাগানো কাগজ লাগাতে হবে, যাতে সমস্ত জায়গায় সমানভাবে কাগজ লাগে। বিশেষ করে ছাঁচের ছোটো ভাঁজগুলিতে কাগজ ঠিকমতো ঢুকে যায়। তারজন্য কাঠের স্প্যাচুলা ব্যবহার করতে হবে। বর্তমানে Synthetic আঠা, ময়দা বা এরারুটের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। Polyviny1 Acetate (PVA) বা Fevicol জাতীয় আঠা এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

পেপার ম্যাসের কাজ ছাঁচসহ ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। যদি ঠিকমতো সব জায়গা না শুকোয়, তখন ছাঁচ থেকে পেপার ম্যাসের কাজ বার করে নিলে কাজটি বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরপর সাদা রং ব্যবহার করতে হবে। তবে উপরের স্তরের কাগজ যদি সাদা কাগজ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে ভালো হয়। রঙের ক্ষেত্রে ইচ্ছেমতো রঙে অলংকরণ করা যায়। সবার শেষে বার্নিশ ব্যবহার করলে কাজটি খুবই সুন্দর দেখাবে।

মুখোশ তৈরী :— এটিও একটি হস্তশিল্পের নিদর্শন। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় এই মুখোশ তৈরির প্রচলন আজও বর্তমান। এই মুখোশ তৈরির উদ্দেশ্য হলো মুখোশ পরে নাচ, যা ছৌনাচ বলে পরিচিত।

মাটির মুখ তৈরী করে তার উপর পেপার ম্যাসে লাগিয়ে তুলে নেওয়া হয় পরে রং করে ডেকোরেশন করে সাজিয়ে তোলা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় এই ধরনের হস্তশিল্পের ব্যবহার ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে, বাস্তবের সঙ্গে পাঠ্যাংশকে একত্রিত করে অনুধাবনে সাহায্য করতে পারবে। বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করতে পারবে।

৩.৮.৫ পাপেট:

পাপেট বা পুতুল নাচ এমন একটা মাধ্যম যা পুরোপুরি মানুষের দ্বারা পরিচালিত। পুতুলনাচ অনেক পুরানো বিনোদনের একটা মাধ্যম। বিভিন্ন সমাজে বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে পুতুলনাচের প্রচলন ছিল। পাশাপাশি ধর্মীয় উৎসবেও এর ব্যবহার দেখা গেছে। বেশীরভাগ পুতুলনাচ গল্প বলার জন্য ব্যবহার করা হত। কখনও ম্যাজিকে বা ঐ ধরনের কোনো বিনোদনের অঙ্গ হিসেবেও প্রচলিত ছিল। বর্তমানে শিক্ষারক্ষেত্রে পাপেট ব্যবহার করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্য

- শিক্ষোপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা। যাতে পাঠ্য বইকে সহজভাবে বোঝা যায়।
- সৃজনশীল মনকে আরো উন্নত করা।
- পাপেটের মাধ্যমে মূল্যবোধ, আদর্শ প্রভৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ সহজ হতে পারে। বিশেষ ভাবে পঞ্চতন্ত্র ধরনের গল্প পাপেটের মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পাশাপাশি সাধরণ জনপ্রিয় মাধ্যমগুলোর থেকেও পাপেট ছাত্র-ছাত্রীদের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে পাপেটের ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পাপেটের মাধ্যমে শিক্ষাদান ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

পাপেট ব্যবহার ও পদ্ধতি

সাধারণত চাররকম পাপেট আমরা দেখতে পাই।

(ক) গ্লাভস পাপেট — হাতের আঙুল, হাত ব্যবহার করে চালনা করা হয়।

(খ) রড পাপেট — পাপেটের মাঝখানে বড় বা লাঠি ব্যবহার করে চালানো হয়।

(গ) স্ট্রিং-পাপেট — সূতোর দ্বারা চালনা করা হয়।

(ঘ) শ্যাডো পাপেট — ছায়া দিয়ে পাপেট চালনা করা হয়।

গ্লাভস পাপেট

রড পাপেট

স্ট্রিং-পাপেট

শ্যাডো পাপেট

আমরা এখানে গ্লাভস পাপেট ব্যবহার করা ও চালনা করা নিয়ে আলোচনা করব। কারণ এই পাপেট শ্রেণিকক্ষে সহজে ব্যবহার করা যাবে। নিচে দুরকম পাপেট তৈরি এবং ব্যবহার দেখানো হল।

(ক) পায়ের মোজা দিয়ে গ্লাভস পাপেট তৈরি

উপকরণ ঃ পায়ের মোজা, কার্ডবোর্ড, লাল রঙের কাপড়, কাঁচি, আঠা ইত্যাদি

- পায়ের একটা মোজা নিয়ে হাতের মধ্যে পরে নিতে হবে। তারপর বুড়ো আঙ্গুল ও বাকী আঙ্গুলের মাঝখানে কেটে ফেলতে হবে।
- কার্ডবোর্ড মুখের আকারে কেটে তার উপর লাল কাপড় আঠা দিয়ে লাগাতে হবে।
- তারপর আঠা শুকিয়ে গেলে কার্ডবোর্ডকে ভাঁজ করে মুখের মধ্যে ঠুকিয়ে দিতে হবে এবং মোজার সাথে সেলাই করে দিতে হবে।
- এবার ইচ্ছে মতন পাপেট চরিত্র সাজিয়ে নেওয়া যায়। চোখ, কান, চুল, গোঁফ, ভুরু, চশমা তৈরি করে নেওয়া যায়। প্রয়োজনমত জামা, টাই ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

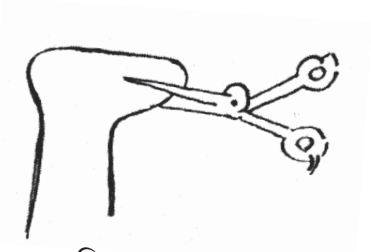

১ নং চিত্র

২ নং চিত্র

৩ নং চিত্র

(খ) আর্টপেপার বা প্যাস্টেল পেপার দিয়ে গ্লাভস পাপেট তৈরি

- আর্টপেপার বা প্যাস্টেল পেপার আয়তাকার আকারে কেটে নিতে হবে।
- কাগজটাকে আঙ্গুলে গোল করে আঠা দিয়ে আটকে নিতে হবে। চিত্র নং ১-এর মতো করতে হবে।
- কাগজ দিয়ে ঐ গোল কাগজের উপর নাক, চোখ, মুখ, গোঁফ, চুল তৈরি করতে হবে।

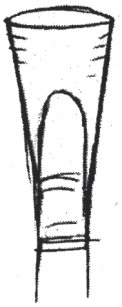

১ নং চিত্র

২ নং চিত্র

এই গ্লাভস পাপেটের বিভিন্ন চরিত্র ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে খুব সহজেই পাঠদান করা যেতে পারে। শুধুমাত্র আঙুল বা হাতকে একটু নাড়িয়ে চরিত্রগুলি আকর্ষনীয় করে তোলা যায়।

৩.৮.৬ খেলনা তৈরি (Toy Making)

খেলনা তৈরির বিভিন্ন মাধ্যমে অর্থাৎ কাগজ, কাপড়, মাটি, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে করা যাবে। প্রাচীন যুগে হরপ্পা, মহেঞ্জোদরোতে মাটির খেলনা পাওয়া গেছে, নিচে কাগজের একটি পুতুল তৈরির পদ্ধতি দেওয়া হল।

আর্টপেপার বা মোটা কাগজের কাজ

আর্টপেপার, হ্যান্ডমেড পেপার বা প্যাস্টেল পেপার ব্যবহার করে বিভিন্ন কাগজের কাজ করা যায়। হালকা ক্ষণস্থায়ী মডেল ব্যবহার করে একটা ত্রিমাত্রিক পুতুল তৈরির পদ্ধতি দেওয়া হল।

উপকরণ ঃ আর্টপেপার, কাঁচি, আঠা, বিভিন্ন রঙের মার্বেল পেপার, পিচবোর্ডের টুকরো, পেনসিল ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ একটা আর্টপেপারকে চারভাগের একভাগ করে নিতে হবে।

তারপর আড়াআড়ি ভাবে পাকিয়ে গোল করতে হবে ও আঠা দিয়ে আটকে দিতে হবে। তারপর অর্ধেক অংশে কালো মার্বেল পেপার আটকে দিতে হবে। উপরের অংশে জ্যাকেটের মতো যে-কোনো রঙিন মার্বেল কাগজ আটকে দিতে হবে।

আরেকটা আর্ট পেপারের চৌকো-ছোটো অংশ নিতে হবে। তার উপর আঠা দিয়ে রঙিন মার্বেল পেপার আটকে দিতে হবে। মাঝখানের একটু বেশি অবধি কাঁচি দিয়ে কাটতে হবে। শেষে একদিকের কাটা অংশের কাগজ আরেকদিকে আঠা দিয়ে লাগাতে হবে।

আঠা শুকিয়ে যাওয়ায় পরে বাড়তি অংশ গোল করে কাটতে হবে। এটা দেখতে অনেকখানি চাষিদের টোকার মতো হবে।

এরপর এই অংশটাকে পূর্বের করা আর্টপেপারের অংশের উপর আঠা দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে লাগাতে হবে। এরপর উপরের দিকে চোখ, নাক, মুখ, চুল ও গলায় টাই ইত্যাদি ইচ্ছেমতো সাজিয়ে নিতে হবে। যদি হাত করতে হয় তাহলে আর্টপেপার সরু করে পাকিয়ে আঠা দিয়ে আটকাতে হবে। শেষে হাত দুটো আঠা ও কাগজের টুকরো দিয়ে দিতে হবে। হাতের আঙুল ও চেটো আর্টপেপার ড্রইং করে কেটে নিয়ে আটকাতে হবে। এবার কাগজের পুতুলটাকে সোজাভাবে দাঁড় করানোর জন্য নীচের দিকের অংশ কাটতে হবে। দেখে মনে হবে ফুলপ্যান্ট পরে রয়েছে। তারপর একটা পিচবোর্ডের টুকরোর উপরে কাটা আর্টপেপার দুদিকের অংশ আঠা দিয়ে মুড়ে আটকে দিতে হবে। এই ভাবে কাগজের ত্রিমাত্রিক পুতুল তৈরি করা যায়।

৩.৮.৭ বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স জিনিষপত্রের মেরামতি

যে কোনো বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স জিনিষপত্র মেরামতি করতে হলে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। বৈদ্যুতিক কাজের ক্ষেত্রে তড়িৎ কী, তড়িৎ প্রবাহ, তড়িতের সুপরিবাহী ও কুপরিবাহী, ওয়াট প্রভৃতি সম্পর্কে জানা দরকার। এই সব ধারণা প্র্যাকটিকাল কাজে যথেষ্ট কাজে লাগবে। বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স জিনিষপত্র মেরামতি করতে হলে উপযুক্ত সরঞ্জাম অর্থাৎ স্ক্রু ডাইভার, হাতুড়ি, টেপ, পিন, ছুরি, কাঁচি, ফিউজ তার, পুডিং প্রভৃতি আলাদা একটি ব্যাগে রাখতে হবে। যাতে প্রয়োজন মত তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—২ (Cheek your progress-2)

(ক) কত রকম পাপেট ব্যবহার করা হয়?

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

(খ) মাটির কাজে তিনটি পদ্ধতির নাম লিখুন

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

(গ) কোন নাচে পেপার ম্যাসের মুখোস ব্যবহার করা হয়?

———————————————————————————————————

———————————————————————————————————

৩.৯ কর্মশিক্ষার মূল্যায়ন :

সূচনা (Introduction) :-

কর্ম শিক্ষা প্রধানত:একক ভিত্তিক শিক্ষা। সেজন্য এর মূল্যায়ণ ও একক ভিত্তিক। বিভিন্ন মূল্যায়ণের উপায়ের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ, মনোভাব, ব্যক্তিত্ব, দক্ষতা বা পটুতা এবং অর্জিত জ্ঞান প্রভৃতির তুলনা করা সহজ হবে। পরীক্ষককে সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক মূল্যায়ণ করতে হবে। শুধুমাত্র সঠিক মূল্যায়ণ করলেই হবে না, তা সংরক্ষণ ও করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মদিনপঞ্জী ও শিক্ষকের কর্মদিনপঞ্জী অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং রেকর্ড রাখতে হবে তবেই যথার্থ মূল্যায়ণ।

কর্ম শিক্ষার মূল্যায়ণের সম্পর্কিত ব্যাখ্যা (Defining Evaluation in the context of Work Education) :-

কর্ম শিক্ষা তথা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মূল্যায়ন কথাটা খুব গভীর এবং ব্যাপক অর্থের ব্যবহার করেছে। তাই মূল্যায়ণের খাতিরে যে বিষয়গুলির উপর খুব বেশি জোর দেওয়া সম্ভব হল সেগুলির (ক) মূল্যায়ণের যথাযথ পদ্ধতি ভিত্তিক সুষ্ঠু পরিকল্পনা। (খ) মূল্যায়ণের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার প্রস্তুতি ও তাদের যথাযথ ব্যবহার। (গ) মূল্যায়ণের ফল সঠিকভাবে সংরক্ষণ, প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার ও সঠিক সিদ্ধান্ত গঠন (ঘ) যথাসময়ে মূল্যায়ণের ফল প্রকাশ। এই সকল বিষয় গুলি কর্ম শিক্ষার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জরুরি।

কর্ম শিক্ষার মূল্যায়ণের ভিত্তি স্তম্ভ (Associating competencies with the evaluation tools) :-

কর্ম শিক্ষার মূল্যায়ণ করতে হবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। যেমন— (ক) নির্দেশিকা, (খ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়মিত লিখে রাখা দিনপঞ্জী (গ) পর্যবেক্ষণ সূচী প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে (ঘ) ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক উৎপাদনের জিনিসগুলোর ও ব্যবস্থা রাখতে হবে।

যেমন—

(ক) ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের পরিকল্পনা রচনা করার ক্ষমতার ওপর মৌখিক প্রশ্ন করা যাবে পাঁচ নম্বরের

(খ) যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম তথ্যাদি ও কার্য প্রণালী ভিত্তিক প্রশ্ন করা যাবে পাঁচ নম্বরের মধ্যে।

(গ) কর্মটির উপলব্ধি ও বিচার করার ক্ষমতা যাচাই ভিত্তিক কিছু মৌখিক প্রশ্ন করা যেতে পারে, তবে পাঁচ নম্বরের মধ্যে।

(ঘ) প্রকল্প —কর্মের সঙ্গে অঙ্গীকৃত নানা মৌখিক প্রশ্ন করা যেতে পারে তবে মোটেই পাঁচ নম্বরের বেশি নয়।

কর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কারণ নির্ধারণ (Assessing the competencies for Work Education) :-

- বাস্তবানুগ চাহিদাভিত্তিক প্রকল্পের অনুমোদন
- ছাত্র-ছাত্রীদের কর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্য গুরুত্ব সহকারে বুঝিয়ে দেওয়া ও প্রকল্প পরিকল্পনা বা কাজের মূল্যায়ণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা।
- কাজের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের পুঁথিগত শিক্ষার যথাযথ সমন্বয় সাধন করা।
- শ্রমের প্রতি মর্যাদা ও শ্রমিকের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগাতে সাহায্য করা (ছাত্র-ছাত্রীদের)।
- সঠিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত করা।
- বিদ্যালয়ে উপযুক্ত কর্ম শালা, আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- পরিকাঠামোগত দোষ—ত্রুটি দূরীকরণ ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগনকে ওয়াকিবহাল করার ব্যবস্থা করা উচিত।

কর্ম শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে প্রয়োগের প্রস্তুতির রিপোর্ট (Preparation of report & its implication for Work Education in the schools) :-

১৯৮২ সালের পর মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ নতুন এক পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেছেন যাকে বর্তমান পদ্ধতি বলা যায় এবং তাতে কর্ম শিক্ষার মূল্যায়ন সম্বন্ধে কিছু নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে বা শর্ত দেওয়া হয়েছে বলা যায়; যেমন মধ্য স্তরে (৬ষ্ঠ-৮ম) কোন বাইরের পরীক্ষা না থাকার দরুণ ঐ স্তর পর্যন্ত আভ্যন্তরীন মূল্যায়নকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের কাজের কর্ম দিন পঞ্জী রাখবে। তাদের সকল কর্মকান্ড ঐ দিনপঞ্জীতে লিখে রাখবে।

কর্ম শিক্ষার প্রয়োগ স্কুলে ঘটাতে গেলে শিক্ষার্থীদের শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জন্মানোর পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে। যে সমাজে সে বেড়ে উঠেছে তাকে উন্নত করার জন্য যে শ্রমজীবি মানুষেরা উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে ওঠাতেই হবে।

কাজের পূর্বে পরিকল্পনা করার অভিজ্ঞতা অর্জন করানো, কর্ম দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর পদ্ধতিগুলো শিক্ষার্থীকে রপ্ত করাতে হবে। শিক্ষার্থীর বিশেষ ধরনের কাজের প্রবণতা থাকে, তাকে খুঁজে বের করে তার সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে সম্পাদিত কর্মের অনুবন্ধ স্থাপন অর্থাৎ কিনা কর্ম ও শিক্ষার সাঙ্গীকরন ঘটাতে পারলেই শিক্ষার আঙ্গিনায় কর্ম শিক্ষাকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করানো সম্ভব হবে।

ধরা যাক—সাবান বা ফিনাইল অথবা কালি তৈরি শেখানো হলো কর্ম শিক্ষার মাধ্যমে, এক্ষেত্রেই এই গুলি তৈরির সঙ্গে কেমিস্ট্রি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামতির সঙ্গে পদার্থ বিদ্যা বা বিজ্ঞানের, উদ্যানের কাজের সঙ্গে জীবন বিজ্ঞানের ছাটাই, বুনাই বা সূচী, শিল্প এর সঙ্গে ভূগোলের বিষয়েরও জ্ঞান লাভ হবে। তাই বলা যায় কর্ম শিক্ষাকে সাঙ্গীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে বিদ্যালয় স্তরে।

কর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কারণ নির্ধারণ

কর্ম শিক্ষার মূল্যায়ণ পদ্ধতি এবং মূল্যায়ণের কর্ম পদ্ধতির সম্পর্কে ধারণা অর্জন। কর্ম শিক্ষাকে দৃঢ় ভাবে শিক্ষার অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো যায় সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। কর্ম শিক্ষার মূল্যায়ণের প্রয়োজনীয়তা ও কর্ম শিক্ষার গুরুত্ব। বিদ্যালয় স্তরে কেন এই শিক্ষাকে কার্য্যকরী করাতে হবে এবং সেক্ষেত্রে মূল্যায়ণের (শিক্ষার্থীর) স্তম্ভগুলি কি হবে তা নির্ধারণ করা।

৩.১০ পাঠ্যক্রম প্রক্রিয়াকরণের সুপারিশ সমূহ (Suggestions for curriculum transaction)

কর্মশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো কর্মপ্রকল্প গ্রহণ করলে তা অবশ্যই অঞ্চল অনুযায়ী গুরুত্ব পাবে। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে মাটির পুতুল বিখ্যাত। সেখানে এধরনের কর্মপ্রকল্পের অগ্রাধিকার দেওয়া অবশ্যই দরকার। শিক্ষার্থীদের আঞ্চলিক কারুশিল্পীদের কাজ দেখা এবং আঞ্চলিক শিল্পগুলি দেখা দরকার। বিভিন্ন বিষয়ের কর্মপ্রকল্প তৈরি করতে হবে। যেমন— পাপেট পাঠ্যক্রমের গল্প বা ছড়ায় ব্যবহার করা যেতে পারে। তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বই-এর পান্তাবুড়ি গল্পটি পাপেটের মাধ্যমে সুন্দর উপস্থাপন করা যায়। আবার মাটি দিয়ে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার তৈরি করে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, শঙ্কু, পিরামিড প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যায়। ভ্রমন, প্রকল্প, হাতে-কলমে কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে কর্মশিক্ষার ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

৩.১১ সারসংক্ষেপ (Let us sum up)

কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাই হল কর্মশিক্ষা। এ অধ্যায়ে কর্মশিক্ষার প্রকল্পগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যাবে। যেমন— শিক্ষার্থী কাগজের কাজ, বাগান, মাটির কাজ, পাপেট প্রভৃতি তৈরি ও বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবহার সম্পর্কে জানবে। আঞ্চলিক কারুশিল্প ও শিল্পীদের সম্পর্কে জানবে।

৩.১২ অনুশীলনী (Unit-End Excercise)

(ক) কর্মশিক্ষা বলতে কী বুঝি?

(খ) পায়ের মোজা দিয়ে কীভাবে পাপেট ব্যবহার করবেন?

(গ) কীভাবে একটি কর্মপ্রকল্পকে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহার করা যায় তা উদাহরণ সহকারে লিখুন।

(ঘ) ফুলের বাগান তৈরির ধাপগুলি লিখুন।

৩.১৩ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর (Answer check your progress)

অগ্রগতি যাচাই করুন — ১

(ক) ১৯৭৪ সালে

(খ) বিজ্ঞান, অংক, ভূগোল, ইতিহাস

(গ) পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়

অগ্রগতি যাচাই করুন — ২

(ক) ৪ রকমের—১। গ্লাভস পাপেট, ২। রড পাপেট, ৩। স্ট্রিং পাপেট ও ৪। শ্যাডো পাপেট

(খ) ৩ রকমের—১। হাতের সাহায্যে, ২। চাকার সাহায্যে, ৩। ছাঁচের সাহায্যে

(গ) ছৌ নাচ

তথ্য সূত্র

১। Art Education, NCERT (Teacher Handbook for Classess VII-VIII)

২। Teacher-made material in Early childhood education training programme, A manual, NCERT

৩। কর্মশিক্ষা শিক্ষণ পদ্ধতি, ড. কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ও অরুন কুমার প্রামানিক, রীতা পাবলিকেশন

৪। সৃজন ও উৎপাদন কর্মপদ্ধতি, অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়, রীতা পাবলিকেশন

স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা
Health and Physical Education

একক - ৪

স্বাস্থ্য শিক্ষা (Health Education)

গঠন

৪.১ সূচনা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষার ধারণা ও গুরুত্ব

৪.৪ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা

৪.৫ পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা

৪.৬ শারীরিক উচ্চতা ও ওজনের তালিকা নথিভুক্তিকরণ ও তার ব্যবহার

৪.৭ বিশুদ্ধ জলের ব্যবহার

৪.৮ খাদ্য ও পুষ্টি

৪.৮.১ পুষ্টির উপাদান ও পুষ্টিগত গুরুত্ব

৪.৮.২ অপুষ্টি / বিভিন্ন পুষ্টিগত অভাব

৪.৯ সারসংক্ষেপ

৪.১০ অনুশীলনী

৪.১১ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-এর উত্তর

৪.১ সূচনা (Introduction)

যেকোনো দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও বিকাশ নির্ভর করে সেই দেশের স্বাস্থ্যের ওপর। দেশের স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্য। এই স্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য যেরকম নিয়মিত খাদ্য, বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনি প্রয়োজন হয় নিয়মিত স্বাস্থ্য চর্চার। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) -এর মতে 'Health is a State of complete physical, mental and Social well being and not merely an absence of disease or infirmity.' অর্থাৎ পরিপূর্ণ দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক সমুন্নতির অবস্থাকেই স্বাস্থ্য বলে—নিছক রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতে স্বাস্থ্য বলে না।

৪.২ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থী-শিক্ষক যে বিষয়গুলি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করবেন এবং অপরকে বোঝাতে বা শেখাতে সক্ষম হবেন—

- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির উপায় সম্পর্কে জানবে।
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জানবে।

- বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জানবে।
- নাক, গান, গলা, চোখ, ত্বক, দাঁত ভালো রাখা সম্পর্কে জানবে।

৪.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষার ধারণা ও গুরুত্ব (Concept of Health and Importance of being healthy)

স্বাস্থ্যবিধি বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান : গ্রিক শব্দ 'Hygeia' থেকে Hygiene-এর উৎপত্তি হয়েছে। Hygeia গ্রিসের স্বাস্থ্যের দেবী ছিলেন। Hygeia শব্দের অর্থ হলো স্বাস্থ্যের সংরক্ষণ।

স্বাস্থ্যবিধি হলো বিজ্ঞাননির্ভর এমন একটি বিষয় যা স্বাস্থ্য বজায় রাখতে ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নিজেকে সুন্দর ও সমাজকে রোগমুক্ত রাখতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান জানা একান্ত প্রয়োজন। যে তত্ত্ব জানলে নিজেকে তথা সমাজকে রোগমুক্ত রাখা যায় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলির পরিচর্যা ও উন্নতি করা যায় তাকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলে।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য : স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তি ও সমাজের স্বাস্থ্য কী উপায়ে রক্ষা করা যায় সেই সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত উপায় নির্ধারণ করা ও সেগুলি কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

স্বাস্থ্যবিধির দুটি দিক হলো— (১) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং (২) সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি।

(১) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি : স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নীতিগুলি যখন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বলে। ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক সমস্ত দিকের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরি ও তার যথার্থ প্রয়োগকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বলা হয়।

এর অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলি হলো—খাদ্য ও খাদ্যগ্রহণের সময়সূচি, পুষ্টি, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, বিশ্রাম, পানীয় জল ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য : ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির বিভিন্ন উদ্দেশ্যগুলি হলো—

- ব্যক্তির স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি করা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করা।
- ব্যক্তি-উন্নতির জন্য দেহের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।
- পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও সুষম খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করা।
- সমাজের প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সমাজ তথা দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা।
- স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম পালনের মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
- নির্দিষ্ট সময়ে পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ ও উপযুক্ত বিশ্রাম ও ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব :

- সু-অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে।
- শিক্ষায়তন, গৃহ ও শ্রেণিকক্ষ ইত্যাদি জায়গায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করে।
- আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

- মানসিক স্থিতিশীলতার উন্নতি ঘটায়।
- স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

(২) সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি : সামাজিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের যে নীতিগুলি সফলভাবে প্রয়োগ করে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা হয়, তাকে সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি বলে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব প্রভাব থাকে। সমাজ যেমন মানুষ দ্বারা প্রভাবিত আবার মানুষও সমাজের বিভিন্ন নিয়ম-নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই সুস্থ সমাজ মানুষের জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক স্বাস্থ্য একটি সমষ্টিগত স্বাস্থ্য হিসাবে বিবেচিত। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির সুস্বাস্থ্য লাভ সামাজিক স্বাস্থ্য গঠনে সাহায্য করে।

সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য :

- সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি করা ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।
- স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করা।
- সু-অভ্যাস ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে উৎসাহ দেওয়া।
- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা দান এবং সামাজিক ও শারীরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করার পরামর্শ ও উৎসাহ দান করা।
- আদর্শ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ কীভাবে বজায় রাখা যায় সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সামাজিক স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব :

- জনস্বাস্থ্য রক্ষা করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
- স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি করে ও বিভিন্ন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।
- সুস্থ ও সবল, রোগমুক্ত সমাজগঠনে সহায়তা করে।

বাড়ন্ত শিশুদের সু-স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা (Health needs of a growing child)

(ক) শিশুদের দৈহিক কাঠামোর উন্নতিসাধন করা।

(খ) শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রগুলির উন্নতিসাধন করা (রক্ত সংবহন তন্ত্র, পরিপাক তন্ত্র, রেচন তন্ত্র, স্নায়ু তন্ত্র ইত্যাদি।)

(গ) রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(ঘ) বিভিন্ন ধরনের ছোঁয়াচে রোগ যাতে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

(ঙ) স্নায়ুপেশীর মধ্যে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে শিশুরা কম শক্তি ব্যয় করে বেশি কাজ করতে পারে সে বিষয়ে নজর দেওয়া।

(চ) চিন্তা শক্তির বিকাশ এবং জ্ঞান ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের সাথে অন্তর দৃষ্টির সম্প্রসারণ ঘটাতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যার ফলে মানসিক সুস্থিতি অবস্থা বিরাজ করতে পারে।

(ছ) শিশুদের সক্রিয় খেলা-ধুলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে সু-অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করা। যার মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করলে সু-স্বাস্থ্যও গড়ে ওঠে।

৪.৪ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (Personal cleanliness)

সূচনা (Introduction)

ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সুস্থ শরীরে সুস্থ মন বাস করে। আমরা যদি শিশুদের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চাই তা হলে শিশুদের শারীরিক অবস্থার বা প্রকৃত স্বাস্থ্যের ওপর নজর দেওয়া দরকার। সাধারণভাবে স্বাস্থ্য ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন নিয়মাবলী মেনে চলা উচিৎ। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বলতে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রাখার কথাই বোঝায়। তাই স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত বিশেষ করে দেহের ত্বক, মুখ, হাত-পায়ের নখ, দাঁত, কান, চোখ, নাক, চুল ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন নিয়মনীতিগুলি পালন করা দরকার।

ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা ঃ (Needs of Personal cleanliness)

- অপরিচ্ছন্নতা থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগের সংক্রমণ হয় যেমন পেট খারাপ, আমাশা ইত্যাদি। নোংরা হাত, অপরিষ্কার বাসনপত্র, বাসি খাবার, অপরিষ্কার ও দূষিত জল ইত্যাদি কারণে সংক্রমণ হয়।
- ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।
- সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে; যার ফলে পেট খারাপ, ডাইরিয়া, উদরাময় প্রভৃতি কম হয়।
- স্বাস্থ্যবিধান ও স্বাস্থ্যশিক্ষা বিদ্যালয়ে নিরাপদ, নির্মল, স্বাস্থ্যকর ও সুরক্ষিত এক স্বচ্ছ পরিবেশ গড়ে তোলে যা শিশুদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে রক্ষা করে।
- পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নত মানের হলে তবেই বিদ্যালয়ের উন্নত মানের শিখন-শিক্ষণ সুনিশ্চিত হবে।

শরীরের বিভিন্ন অংশের যত্ন (Care of different parts of the body)

ত্বকের যত্ন (Care of Skin)

ত্বকের বিভিন্ন রোগ :

১) দাদ ২) চুলকানি ৩) ব্রণ ৪) একজিমা ৫) ছুলি ৬) সোরাইসিস ৭) চর্ম ফেটে যাওয়া।

চর্মের যত্ন :

১) উষ্ণ জলে স্নান করতে হবে।

২) তেল বা ময়লা জাতীয় পদার্থ থেকে দেহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবার জন্য উষ্ণ জল ও সাবান ব্যবহার করা উচিত।

৩) যাদের চর্ম শুষ্ক তারা ক্রিম ব্যবহার করবে।

৪) প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী পোশাক ব্যবহার করা দরকার।

৫) চর্মের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য জীবাণুনাশক তরল দিয়ে স্নান করা দরকার।

৬) চর্মের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

৭) অন্যের ব্যবহৃত পোশাক, গামছা ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্তর্বাস পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।

৮) সোরাইসিস রোগের রোগীদের ক্ষেত্রে ঝরনার মাধ্যমে পূর্ণস্নান করা উচিত।

৯) সূর্যস্নান, বায়ুস্নান ও সমুদ্রস্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

১০) ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। নিয়মিত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

১১) কারো চুলকানি হলে বাড়ির সকলেরই চিকিৎসা করানো উচিত। চুলকানির চিকিৎসায় অল্প জলে কিছু নিমপাতা সেদ্ধ করে সেটা একটু হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে মলম তৈরি করতে হবে। সাবানজল দিয়ে শরীর পরিষ্কার করে মুছে মলম লাগাতে হবে। তিনদিন স্নান করা যাবে না। এইভাবে তিনদিন মলম লাগিয়ে কিছুক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাকলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

১২) শীতকালে রোদে শরীরকে উন্মুক্ত রেখে ভিটামিন 'ডি' সংগ্রহ করতে হবে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে।

নাক, কান ও চোখের যত্ন (Care of Nose, Ear and Eyes)

নাকের যত্ন (Care of Nose)

নাকের মাধ্যমে আমরা পরিবেশ থেকে বাতাস গ্রহণকরি, গৃহীত বাতাসের মধ্যে ধূলিকণা ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু থাকে। নাকের মধ্যে প্রবেশ করার পর এগুলি নাকের আভ্যন্তরস্থ তরলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বলে যদি নাক পরিষ্কার না করা যায় তাহলে বিভিন্ন রোগের উদ্ভব হয়।

নিয়মাবলী :—

(ক) নাকের মধ্যে আঙ্গুল দেওয়া যাবে না।

(খ) নরম ও পরিষ্কার কাপড় দিয়ে নাক পরিষ্কার করা দরকার।

(গ) হাঁটার সময় নাকে রুমাল দিয়ে চাপা দেওয়া উচিত।

(ঘ) নাকের মধ্যে সামান্য পরিমাণ জল টেনে নিয়ে তারপর সেই জল বাইরে আনা দরকার।

(ঙ) নাকের গভীরে পরিষ্কারের জন্য কাথির্টার ব্যবহার করা যেতে পারে।

কানের যত্ন (Care of Ears)

কানের রোগ :

(১) শক্ত কর্ণমল : কর্ণমল (ময়লা) অধিক পরিমাণে জমলে কানে ব্যথা হয় ও শ্রবণশক্তি কমতে পারে।

(২) কানে পুঁজ জমা : কানের মধ্যে জল ঢুকলে, সেই জল যদি কান থেকে বের করা না হয়, দীর্ঘদিন সর্দি লাগলে বা কানের মধ্যে কোনো সংক্রমণ ঘটলে কানে পুঁজ জমতে পারে। দীর্ঘদিন যদি কানের মধ্য হতে পুঁজ বের হতে থাকে, তবে কান কালা হয়ে যেতে পারে ও কানের মধ্যে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে— যার পরিণাম মৃত্যু।

(৩) কানের পর্দা ফেটে যাওয়া : আঘাতজনিত কারণে অতিরিক্ত বায়ুর চাপে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। জলে ডুব দিয়ে জলের গভীরে প্রবেশ করলে জলের চাপে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। এর ফলে কান কালা হয়ে যায়, কানের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ হয়।

কানের যত্ন

১) কানে ময়লা যাতে না জমতে পারে তার জন্য নিয়মিত কান পরিষ্কার করা দরকার।

২) যানবাহনের বিকট শব্দ বা কলকারখানার তীব্র শব্দ পরিহার করা উচিত।

৩) প্রতিদিন স্নানের সময় কান পরিষ্কার করা উচিত।

৪) কোনো সময়ে কানে কোনোরূপ আঘাত করা উচিত নয়।

৫) কোনোরূপ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

চোখের যত্ন (Care of Eyes)

চোখের বিভিন্ন রোগ :

১) আঞ্জনি ২) চক্ষুপ্রদাহ ৩) দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ৪) ছানিপড়া ৫) রাতকানা ৬) দৃষ্টিশক্তিজনিত ত্রুটি ৭) বর্ণান্ধতা।

চোখের রোগ প্রতিরোধের জন্য কী করতে হবে : প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শিশুদের টিকা ও প্রতিটি ডোজ সঠিক সময়ে গ্রহণ করাতে হবে।

চোখের যত্ন :

১) দিনে অন্তত চার থেকে পাঁচবার পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করা উচিত।

২) অন্যের ব্যবহার করা রুমাল বা তোয়ালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

৩) চোখের ভিতরে কোনো ময়লা বা ধুলো পড়লে পরিষ্কার জল বা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

৪) রাতে পড়ার সময় বইয়ের উপর পিছন থেকে কাঁধের উপর দিয়ে যাতে যথেষ্ট আলো আসে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৫) চোখ থেকে অন্তত একফুট দূরে বই রেখে পড়াশোনা করা উচিত।

৬) অন্যের চশমা ব্যবহার করা উচিত নয়।

৭) অল্প আলোতে কাজ করা উচিত নয়।

৮) TV-র পর্দা থেকে অন্তত তিন মিটার দূরে বসে ছবি দেখা উচিত।

৯) ধোঁয়া চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক।

গলার যত্ন (Care of Throat)

গলা মুখের অভ্যন্তরে অবস্থিত সংবাহী লালা যার মাধ্যমে বাতাস, খাদ্য ও জল দেহের অভ্যন্তরে যায়। সুতরাং যথাসম্ভব গলায় নজর দেওয়া উচিত যাতে এটি সর্দি, ঠাণ্ডা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে মুক্ত থাকে।

নিয়মাবলী

ক) রাতে শোবার সময় ও সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর গরম জল দিয়ে গলা পরিষ্কার করা উচিত।

খ) গলার প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করা দরকার।

গ) গলার মধ্যে জমে থাকা কফ প্রতিদিন পরিষ্কার করা দরকার।

দাঁতের যত্ন (Care of Teeth)

দাঁতের বিভিন্ন রোগ :

১) দন্তক্ষয়— দাঁতের ক্ষয়রোগের প্রধান কারণ হলো ব্যাকটেরিয়া ও দাঁতের গঠন।

২) পাইওরিয়া— দাঁত থেকে রক্ত ও পুঁজ নির্গত হয় এবং মাড়ি ও অস্থিগহ্বর নষ্ট হয়ে যায়।

৩) নিশ্বাসে দুর্গন্ধ— দন্তক্ষয় রোগ, পাইওরিয়া, দাঁতের পরিচর্যার অভাব, এছাড়াও বিভিন্ন সাধারণ ব্যাধির ফলেও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়ে থাকে।

৪) মাড়ি ফুলে যাওয়া— দাঁতের নিয়মিত পরিচর্যার অভাব ও ভিটামিনের অভাবে মাড়ি সংক্রান্ত একটি রোগ হলো মাড়ি ফুলে যাওয়া।

দাঁত ভালো রাখার নিয়মাবলী :

১) দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের জন্য নিয়মিতভাবে দন্ত বিশেষজ্ঞের দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করানো এবং মুখগহ্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।

২) সকালে ঘুম থেকে উঠে ও রাতে শোয়ার আগে প্রতিদিন মাজন বা পেস্ট দিয়ে অবশ্যই দাঁত মাজা উচিত।

৪) A–B–C ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

৫) দন্তমল নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত।

৬) নিয়মিত দাঁতের পরিচর্যা করা উচিত।

৭) যে-কোনো খাবার খাওয়ার পরে জল দিয়ে মুখ ধোয়া উচিত।

চুলের যত্ন (Care of Hair)

নিয়মাবলী

ক) চুলের যত্ন নেবার জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে দুবার চুল চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো প্রয়োজন।

খ) স্নানের সময় চুলের গোড়ায় হাল্কা ম্যাসাজ করলে চুল ভাল থাকে।

গ) চুলে যাতে খুস্কি না হয় এবং উকুন যাতে বাসা না বাঁধে সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ঘ) চুল পরিষ্কার রাখাই চুলের যত্নের মূল কথা। তাই প্রয়োজনমত সপ্তাহে একাধিক বার স্যাম্পু করে চুলকে ধুলো ময়লা থেকে মুক্ত রাখা উচিত।

ঙ) অন্যের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো উচিত নয়।

চ) স্টাইল করার জন্য চুলের বিভিন্নরকম ড্রায়ারের অতিরিক্ত ব্যবহার কিংবা কৃত্রিম রঙের লাগানোও চুলের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

পায়ের যত্ন (Care of Legs)

নিয়মাবলী

ক) বাইরে থেকে ফিরে এসে প্রথমেই কাজ হবে হাত মুখের সঙ্গে ভাল করে পা ধোঁয়া। পায়ের আঙুলের ফাঁকে ময়লা জমে থাকলে ঐ স্থানে ছত্রাক জন্মায়। ফলে এই অংশ চুলকাতে থাকে।

খ) খুব আঁটো সাঁটো জুতো ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে পায়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এছাড়া আঁটোসাঁটো জুতো ব্যবহার করলে পায়ে ফোঁস্কা পড়ে। অনেক সময় কড়াও পড়ে। এমন জুতো পরা উচিত যাতে পায়ের আঙুল নড়াচড়া করতে পারে।

গ) পায়ে নাইলন বা কৃত্রিম সুতোর মোজা ব্যবহার করা উচিত নয়।

ঘ) হাইহিল জুতোও ব্যবহার করা উচিত নয়। এর থেকে কোমরে ব্যথা হয় এবং স্পন্ডেলাইটিস রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ঙ) পায়ের নখ নিয়মিত কাটা উচিত।

চ) গোড়ালি ফাটলে উপযুক্ত যত্ন নেওয়া উচিত। গোড়ালির চামড়া সবসময়ে পরিষ্কার ও নরম রাখলে গোড়ালি ফাঁটা রোধ করা সম্ভব।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন — ১ (Check Your Progress – 1)

(ক) তিনটি ত্বকের রোগের নাম লিখুন।

উঃ .....।

(খ) মাড়ি কেন ফুলে যায়?

উঃ .....।

(গ) চোখের দুটি রোগের নাম লিখুন।

উঃ .....।

৪.৫ পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা (Environment Cleanliness)

ভূমিকা (Introduction)

মানুষ যেখানে বাস করে সেই জায়গায় সব কিছু নিয়েই তৈরি হয় মানুষের পরিবেশ, জল, বায়ু, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু, তাপ, আলো প্রভৃতি নিয়ে তার ভৌত পরিবেশ। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থাও তার পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে একটি পরিবেশ আছে যার স্থিতাবস্থা বা সাম্যের অবস্থা বজায় রাখা আবশ্যিক শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে। কিন্তু শরীর অভ্যন্তরের পরিবেশ বাইরের জগতের পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খাদ্য, পানীয়, বাতাস প্রতিনিয়ত আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে। যদি এই ভৌত জিনিসগুলি কোনোভাবে দূষিত হয় তাহলে শরীরের অভ্যন্তরও ওই দূষণের প্রভাবে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে পারে না। ফলে মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলা হয়।

রোগ প্রতিরোধ ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ভালো অভ্যাস ঃ

- প্রতিদিন সকালে ও রাতের খাওয়ার পর দাঁত মাজতে হবে।
- প্রতিদিন সাবান বা সমতুল অন্য পরিষ্কার করবার জিনিস দিয়ে শরীর পরিস্কার করে স্নান করতে হবে।
- নিয়মিতভাবে সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে চুল পরিষ্কার করতে হবে।
- পরিষ্কার জামাকাপড় পরতে হবে।
- হাট বাজার বা স্কুল থেকে ঘরে এসে জামাকাপড় পাল্টাতে হবে।
- নখ ছোটো করে কাটতে হবে ও সর্বদা পবিষ্কার রাখতে হবে।
- কান ও চোখ নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে।
- বাইরে পরা জুতো ঘরে যেন না নিয়ে যাওয়া হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

- খাবারের জায়গায় স্কুল ব্যাগ বাইরে থেকে এসে জামাকাপড় যেন না রাখা হয়।
- বাথরুম ব্যবহারের পর, খাওয়ার আগে ও পরে, রান্না করবার আগে ও পরিবেশনের আগে, যখনই মনে হবে হাতে ময়লা লেগে আছে তখনই সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।
- বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এলে বা টাকা পয়সায় হাত দেবার পর অবশ্যই ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধানের প্রয়োজনীয়তা

১। রোগ সংক্রমণের বিভিন্ন দিক :

ক. হাতের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ : আমরা হাত দিয়ে নানা ধরনের কাজ করি। বিভিন্ন জিনিস ধরি। তার ফলে হাতে নানা ধরনের ময়লা লাগে। এসব ময়লায় বিভিন্ন ধরনের জীবাণু থাকে। ফলে ওইসব জীবাণু হাতে লেগে যায়। আবার আমরা পায়খানা করার পর হাত দিয়ে শৌচকাজ করি। অনেক সময় আমাদের পায়খানাও আমাদের হাতে লেগে থাকতে পারে। পায়খানাতে নানা ধরনের রোগ-জীবাণু থাকে। ফলে এগুলোও হাতে লেগে যায়। এইসব জীবাণু অতি সূক্ষ্ম। খালি চোখে তাদের দেখা যায় না। হাত এমনিতে পরিষ্কার মনে হলেও আমাদের হাতে জীবাণু লেগে থাকে। আমরা যদি এই হাতে কোনো খাবার খাই বা খাবার পরিবেশন করি, তা হলে ওই হাতের মাধ্যমে রোগ-জীবাণু খাবারের এবং জলের মধ্য দিয়ে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। আমরা অসুস্থ হতে পারি। এসব থেকে বাঁচতে হলে আমাদের ভালো করে হাত পরিষ্কার রাখতে হবে। বিশেষত খাওয়ার আগে, খাবার পরিবেশন করার আগে এবং মল ত্যাগের পর শৌচ করে অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

খ. জলের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ : জলের আরেক নাম জীবন। কারণ জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। আবার জল আমাদের জীবনে নানা বিপত্তিও ঘটাতে পারে। জলের সাহায্যে নানা ধরনের রোগ-জীবাণু আমাদের শরীরে ঢুকতে পারে। কারণ জল হলো রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার একটি খুব ভালো মাধ্যম। দূষিত জলের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের পেটের অসুখ, আন্ত্রিক ও কলেরা হতে পারে। তাছাড়া জন্ডিস, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি অসুখও জলের মাধ্যমে ছড়ায়। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। অনেক সময়ই খাবার জন্য যে জল আমরা সংগ্রহ করি তা জীবাণুমুক্ত নয়। জলের উৎস নিরাপদ হতে হবে। সাধারণত টিউবওয়েলের (হ্যান্ডপাম্প) বা কলের (ট্যাপের) জল নিরাপদ। আমাদের সেই জলই খাওয়া, হাতমুখ ধোওয়া ও রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহার করা উচিত। যদি কোনো কারণে মনে হয় যে, আমাদের খাবার জল নিরাপদ নয়, তা হলে সেই জল ফুটিয়ে পান করা উচিত। মনে রাখতে হবে, জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না, কারণ সেগুলি অতি ছোটো। পরিষ্কার জলেও জীবাণু থাকতে পারে। বন্যার সময় হ্যান্ডপাম্প বা ট্যাপের জলও দূষিত হয়ে যায়। তখন ওই টিউবঅয়েল ও পাইপলাইনকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। বন্যার সময় জল ফুটিয়ে খাওয়াই নিরাপদ।

গ. ফল ও কাঁচা শাকসবজির মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ : ফল ও কাঁচা শাকসবজির মাধ্যমে নানা ধরনের রোগ ছড়ায়। যেমন টমেটো, শশা, গাজর, কড়াইশুঁটি, ধনেপাতা, পুদিনাপাতা, কাঁচালঙ্কা ইত্যাদি সবজি। এগুলি আমরা প্রায়ই কাঁচা খাই। মাঠে যখন এগুলি থাকে তখন এগুলোতে নানা ধরনের নোংরা লাগে। ফলে এগুলোতে রোগ-জীবাণু লেগে থাকে। তখন যদি আমরা এসব খুব ভালো করে না ধুয়ে খাই, তা হলে আমাদের নানা ধরনের পেটের অসুখ যেমন- আমাশয়, ক্রিমি, কলেরা, আন্ত্রিক ইত্যাদি হতে পারে। এছাড়া আজকাল বেশি ফসল ফলাবার জন্য নানা ধরনের রাসায়নিক সার ও কীট মারার ওষুধ মাঠে ব্যবহার করা হয়। এগুলি যদি আমাদের শরীরে সরাসরি ঢোকে, তা হলে আমাদের খুব ক্ষতি হতে পারে। নানা ধরনের অসুখ এমনকি ক্যানসারও এগুলো থেকে হতে পারে।

আবার কিছু ফল আছে যেগুলোর খোসা ছাড়িয়ে খেতে হয় না। যেমন- পেয়ারা, আপেল, আঙুর, কুল ইত্যাদি। এগুলো নানান জায়গা থেকে আসে। ফলে এগুলোতে নানা ধরনের নোংরা লেগে থাকে। এগুলোতে কীটনাশকও দেওয়া হয়। তাই

এগুলো ভালো করে না ধুয়ে খেলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি। ফলে খেয়ে তখন হিতে বিপরীত হয়। তাই যেসব শাকসবজি বা ফল আমরা কাঁচা খাই বা খোসা না ছাড়িয়ে খাই, সেগুলি খাওয়ার আগে খুব ভালো করে বিশুদ্ধ জলে ধুয়ে খেতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা এগুলোকে খাওয়ার আগে বেশ কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর ধুয়ে খাই। ধোয়ার জন্য জল কিন্তু নিরাপদ উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। না হলে আবার বিপত্তি ঘটবে। সেই জল যদি খারাপ হয়, তা হলে তার মাধমেও অসুখ-বিসুখ ছড়াবে।

ঘ. পোকামাকড়ের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ : পোকামাকড়ের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে নানা ধরনের রোগ ছড়ায়। যেমন মাছি। মাছি নানা নোংরা জায়গায় বসে। মল-মূত্রেও বসে। তখন মাছি সেই নোংরা খায়। আবার সেই নোংরা তার পায়ে ও শরীরে লেগে যায়। তারপর সেই মাছি যখন কোনো খাবারে বসে, তখন তার স্বভাববশত প্রথমে একটু বমি করে। তখন সেই বমি থেকে এবং তার পায়ে ও শরীরে লেগে থাকা নোংরা থেকে খাবার-দাবার দূষিত হয়ে যায়। আমরা যখন সেই খাবার খাই, তখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। এছাড়া টিকটিকি, আরশোলা, ইঁদুর ইত্যাদিও নানাভাবে খাবার-দাবার দূষিত করতে পারে।

এইসব কারণে আমাদের নানা ধরনের পেটের অসুখ হয়, যথা-আমাশয়, আন্ত্রিক, কলেরা ইত্যাদি। তা ছাড়া নানা ধরনের কৃমির সংক্রমণও এসব থেকে হয়। ইঁদুর থেকে প্লেগ নামক এক ভয়াবহ অসুখ ছড়ায়।

এই জন্যই আমাদের সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। খাবার-দাবার সবসময় ভালো করে ঢেকে রাখতে হবে। ঘর-দোর ও আমাদের বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যাতে পোকামাকড় না জন্মায় এবং তাদের বংশ বিস্তার না ঘটে। রাত্রে মশারি টাঙিয়ে ঘুমোতে হবে। ফলে মশা আমাদের কামড়াতে পারবে না। মশা যাতে বংশ বিস্তার করতে না পারে, তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। জমা জল যাতে বাড়ির আশপাশে না থাকে, তার জন্যও ব্যবস্থা নিতে হবে।

২। গৃহের পরিচ্ছন্নতা :

আমাদের জীবনের অনেকটা সময়ই আমরা আমাদের ঘরে কাটাই। তাই ঘরটাকে আমাদের খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। রোজ ঘর ঝাঁট দিয়ে আবর্জনা সারগর্তে ফেলতে হবে। বাড়ির উঠোনও ঝাঁট দিতে হবে নিয়মিত। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো গোয়াল ঘর। তাকে নিয়মিত সাফ করতে হবে। গোয়াল ঘরের গোবর ও অন্যান্য আবর্জনা সারগর্তে ফেলতে হবে।

ভালো স্বাস্থ্যের জন্য আবার চাই ঘরে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো-হাওয়া। তাই ঘরে থাকা উচিত সঠিক সংখ্যায় দরজা ও জানলা। না হলে ঘরের বদ্ধ হাওয়া বেরতে পারবে না। এর ফলে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না।

রান্নাঘরও একই রকমের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আমাদের মা-বোনেরা সেখানে তাঁদের অনেকটা সময়ই কাটান। অথচ আমরা ওই ঘরটাকে খুবই কম গুরুত্ব দিই। এখানে রান্না হয়। গ্রামে সাধারণত ব্যবহার করা হয় সাধারণ চুলা। এগুলোতে রান্না করলে প্রচুর ধোঁয়া হয়। এই ধোঁয়া মা-বোনেদের স্বাস্থ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি করে। একটা লোক দৈনিক ২০০টা সিগারেট খেলে তার স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হয়, মা-বোনেদের রান্নাঘরের ধোঁয়ায় ক্ষতি হয় তার চেয়েও বেশি। নানা ধরনের শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুখ, টি.বি. এমনকি ক্যানসারও এর ফলে হতে পারে।

বাড়িতে একটি উন্নত চুলা বানিয়ে নিলে, রান্নাঘর থাকবে একেবারে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। ঘরে কোনো ধোঁয়া হবে না, পাইপ দিয়ে তা বেরিয়ে যাবে ঘরের বাইরে। এই চুলায় জ্বালানিরও হয় অনেক সাশ্রয়। এসব চুলার দামও খুব একটা বেশি নয়। স্যানিটারি মার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলে, এরা তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিস্ত্রির সাহায্যে একটি উন্নত চুলা বানিয়ে দেবেন।

৩। পানীয় জলের নিরাপদ সংরক্ষণ ও তার ব্যবহার :

খাবার বা রান্নার জল শুধু নিরাপদ উৎস থেকে সংগ্রহ করলেই চলবে না, তাকে ঘরে এনে ঠিকভাবে সংরক্ষণও করতে হবে। টিউবওয়েল থেকে জল আনার আগে পাত্রটাকে (বালতি, কলসি ও অন্য কোনো পাত্র) খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে

নিতে হবে। পাত্রটাকে ঢাকনা দিয়ে জল আনতে হবে। বাড়িতে এনেও পাত্রটাকে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। কলসি থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে গ্লাসে করে খেতে হবে। যদি জল বালতিতে থাকে, তবে একটি পরিষ্কার মগে করে বা লম্বা হাতলওয়ালা পাত্র দিয়ে বালতি থেকে জল নিতে হবে। এতে বালতির জল দূষিত হবে না। গ্লাস বা মগ দিয়ে খাওয়ার জল পরিবেশন করার সময় - দেখতে হবে কোনো ভাবেই হাত বা আঙুল যেন জলে লেগে না যায়। হাত বা আঙুল লেগে গেলে জল দূষিত হয়ে পড়তে পারে। অনেক সময় দেখা যায় জল ভর্তি গ্লাসে আঙুল ডুবিয়ে পরিবেশন করা হচ্ছে। চা-দোকানে, হোটেলে বা রেস্তোরাঁয় এটা প্রায়ই চোখে পড়ে। তিন-চারটি গ্লাস এক সঙ্গে আঙুল ঢুকিয়ে নিয়ে গিয়ে টেবিলে টেবিলে দিচ্ছে এসব দেখলে আমাদের বারণ করতে হবে। তার হাতের মাধ্যমেও অসুখ ছড়াতে পারে।

৪। ব্যবহৃত জলের নিরাপদ নিষ্কাশন :

আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে বাড়ি ঘরে অনেক জল ব্যবহার করি। যেমন স্নানের জন্য, বাসন-কোসন ধোওয়ার জন্য, শাক-সবজি বা ফল ধোয়ার জন্য, কাপড়-চোপড় কাচার জন্য, ঘর মোছার জন্য ইত্যাদি। ফলে অনেক নোংরা জল তৈরি হয়। এগুলোতেও নানা ধরনের জীবাণু থাকে। আবার নোংরা জল জমে থাকলে মশা মাছির সৃষ্টি হয়। বাড়ির জায়গা স্যাঁৎসেঁতে হয়ে পড়ে। ফলে মশা-মাছি ছাড়াও নানা ধরনের পোকা-মাকড়ের সৃষ্টি হয়। এ থেকে বাড়ির লোকেদের নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ হতে পারে। তাই এসব ব্যবহৃত জলের নিরাপদ নিষ্কাশন দরকার। বাড়িতে একটি জলশোষক গর্ত বানিয়ে নিলে এইসব নোংরা জল ওই গর্তে চলে যাবে। ফলে বাড়িতে এখানে সেখানে এইসব নোংরা জল জমে থাকবে না।

জলাশোষক গর্ত ছাড়াও ওইসব ব্যবহৃত জল বাড়ির সবজি বা ফুলের বাগানে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য চাই একটু পরিকল্পনা। রান্না ঘর ও স্নানের ঘর থেকে নর্দমার সাহায্যে ব্যবহৃত জল বাগানে নিয়ে যেতে হবে।

স্যানিটারি মার্টকে বললে জলশোষক গর্ত বানিয়ে দেবে। জলশোষক গর্ত বানানো মোটেই কঠিন নয়। যে কেউ নিজেই এটা বানাতে পারেন। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় দুই হাত করে একটি গর্ত তৈরি করে সেই গর্তটি ভাঙা ইঁট বা পাথর দিয়ে ভর্তি করতে হয়। এবারে তার উপর একটি পলিথিনের শিট পেতে মাটি চাপা দিতে হবে। গর্তটির এক কোণে তলায় ফুটোযুক্ত একটি মাটির হাঁড়ি বসাতে হবে। নোংরা জল যাতে এই কলসিতে এসে পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। একটি পাইপের সাহায্যে তা করা যেতে পারে।

৫। আবর্জনার নিরাপদ নিষ্কাশন :

বাড়ির দৈনন্দিন কাজের সময়ে নানা ধরনের আবর্জনা তৈরি হয়। যেমন তরি-তরকারির খোসা, মাছের আঁশ,, মাংসের ছাঁট ইত্যাদি। এছাড়াও আরও অনেক আবর্জনা, যেমন, বাজার থেকে আনা কাগজের ঠোঙা, গাছের পাতা, গোয়ালঘরের আবর্জনা, মাঠ থেকে ফসল বাড়িতে আনলে তারও অনেক আবর্জনা। এইসব আবর্জনা যদি সঠিকভাবে নিষ্কাশন না হয় তা হলে বাড়ির পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়বে। মশা, মাছি ও নানা ধরনের পোকামাপড় হবে। ইঁদুরের উৎপাত বাড়বে। কুকুর, বিড়ালের উৎপাত হবে। রোগ-অসুখও বাড়বে।

এইসব আবর্জনার নিরাপদ নিষ্কাশনের জন্য বাড়িতে চাই একটি সারগাদা। সারগাদা খুব সহজেই তৈরি করা যায়। বাড়ির এক কোণে একটি চৌকো গর্ত তৈরি করতে হবে। আবর্জনার পরিমাণ বুঝে, গর্তের পরিমাপ হবে। তবে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় ২ হাত করে গর্ত করলেই ভালো। বাড়ির সব গোবর-আবর্জনা এই গর্তে ফেলতে হবে। ৭-৮ দিনের মাথায় আবর্জনার উপর ছাই বা পাতলা করে মাটি চাপা দিতে হবে। এর ফলে মাছি বংশ বিস্তার বন্ধ হবে। গর্ত ভর্তি হয়ে গেলে মাটি চাপা দিয়ে ২-৩ মাস ফেলে রাখতে হবে। গর্তের আবর্জনা পচে সার হয়ে যাবে। এটা খুব ভালো জৈব সার। ফসলের জন্য বা বাড়ির বাগানে খুব ভালো কাজ দেবে।

৬। মানুষের মল-মূত্রের নিরাপদ নিষ্কাশন :

মানুষের মল-মূত্রে থাকে নানা ধরনের অসুখের জীবাণু। বিভিন্ন ধরনের পেটের অসুখ, কলেরা, আমাশয়, আন্ত্রিক, টাইফয়েড, পোলিও ইত্যাদি রোগের জীবাণু অসুস্থ মানুষের শরীর থেকে মল-মূত্র এবং বমির সঙ্গে বেরিয়ে আসে। মাঠে ঘাটে পায়খানা করলে এসব জীবাণু মশা-মাছির মাধ্যমে বা অন্যান্য পোকা-মাকড়ের মাধ্যমে ছড়াবে। বৃষ্টির জলের সঙ্গে জীবাণু পুকুরে এসে পুকুরের জল দূষিত করবে। মাটিতে বেঁচে থাকে হুক কৃমি। কারণ এদের জীবনচক্র মাটিকে কেন্দ্র করেই। খালি পায়ে মাঠে গেলে হুক কৃমি আমাদের শরীরে ঢুকবে এবং সুস্থ মানুষ আক্রান্ত হবে।

তাই চাই মানুষের মল-মূত্রের নিরাপদ নিষ্কাশন। খুব সহজেই এটা করা যায়। বাড়িতে একটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বানিয়ে বাড়ির সবাই এটাকে ব্যবহার করলেই মল-মূত্রের নিরাপদ নিষ্কাশন হবে। একটি পায়খানা বানানো যায়। নিকটবর্তী স্যানিটারি মার্টে বা পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করলেই, স্যানিটারি মার্ট পায়খানা বানিয়ে দেবে। কম দামি পায়খানা থেকে ধাপে ধাপে বেশি দামের পায়খানা তৈরি করা যায়। এতে পূর্বের খরচ করা টাকার কোনো অপচয় হবে না। আবার দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থাও আছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই যে শিশুদের মলও পায়খানায় ফেলতে হবে। কারণ শিশুদের মলেও একই রকমের রোগ-জীবাণু থাকে। পরে শিশু যখন ধীরে ধীরে বড়ো হবে তাকে আস্তে আস্তে পায়খানা ব্যবহার করার অভ্যাস করাতে হবে।

৭। খাদ্যদ্রব্যের নিরাপদ সংরক্ষণ ও তার ব্যবহার :

আমরা খাওয়া দাওয়া করেই বেঁচে থাকি। আবার খাবারের মাধ্যমেই অনেক রকমের জীবাণু আমাদের শরীরে গিয়ে আমাদের অসুস্থ করে তোলে। তাই আমাদের সাবধান হতে হবে। বাড়িতে হয়তো ভালো রান্না করা হলো। রান্না করার সময় যথেষ্ট সতর্কতাও নেওয়া হলো, যাতে কোনও প্রকার নোংরা না লাগে। কিন্তু ওই খাবার যদি ঠিকভাবে রাখা না হয়, তবে তা দূষিত হয়ে পড়তে পারে। তাই রান্না করা খাবার, দুধ, ফল ইত্যাদি ভালো করে ঢেকে রাখতে হবে। না হলে মশা, মাছি নানা ধরনের পোকা-মাকড়, আরশোলা, টিকটিকি, ইঁদুর ইত্যাদি খাবারকে দূষিত করে দিতে পারে এবং সে খাবার খেয়ে আমরাও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি। নানা ধরনের পেটের অসুখ, কলেরা, জন্ডিস, আন্ত্রিক, ডায়রিয়া, প্লেগ ইত্যাদি নানা ধরনের অসুখ হতে পারে। রান্না ঘরে একটি তারের জাল দেওয়া আলমারি থাকলে সবচেয়ে ভালো হয়। তা হলে রান্না করা খাবার ওই আলমারিতে রাখা যাবে। বাসি খাবারও খাওয়া উচিত নয়। কারণ খাবার-দাবার পুরোনো হলে পচে যায়। বিশেষত গরমকালে। এতেও আমাদের নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ হতে পারে। রান্নার কাজে পুকুরের জল ব্যবহার করা হয়। এটা খুবই বিপজ্জনক। রান্নার কাজে নলকূপ বা কলের জলই ব্যবহার করতে হবে।

৮। পায়খানা করে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করা :

আমাদের পায়খানায় থাকে নানা ধরনের জীবাণু। অনেক সময় কৃমি ও কৃমির ডিমও থাকে। আর আমরা জানি যে আমাদের পায়খানা কোনো না কোনো ভাবে মুখে আসলেই আমাদের বেশিরভাগ পেটের অসুখ, আন্ত্রিক, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস ইত্যাদি মারাত্মক সব অসুখ-বিসুখ হয়। তাই আমাদের সাবধান থাকতে হবে। পায়খানা শৌচ কাজের পর আমাদের হাত খুব ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। সাবান দিয়ে ধুতে হবে, না হলে ওইসব অদৃশ্য জীবাণু হাতে লেগে থাকতে পারে এবং খাবার-দাবারের সঙ্গে বা জলের সঙ্গে আমাদের পেটে গিয়ে আমাদের অসুস্থ করে দেবে। এই কাজের জন্য কম দামি সাবান ব্যবহার করলেও চলবে। সাবানটা পায়খানা ঘরের মধ্যে রাখলেই ভালো হয়। বাড়ির বাচ্চাদেরও এই অভ্যাসটা ছোটো থেকেই করাতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাচ্চাদের পায়খানাতেও একই রকমের রোগ-জীবাণু থাকে। তাই শিশুদের পায়খানা পরিষ্কার করার পর, একইভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

৯। খাওয়ার আগে ও খাবার পরিবেশনের আগে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া :

হাত হলো একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এর সাহায্যেই আমরা বেশিরভাগ কাজ করি। নানা ধরনের জিনিস ধরি। ফলে ওইসব জায়গা বা জিনিস থেকে আমাদের হাতে ময়লা লেগে যায়। ময়লায় নানা ধরনের জীবাণু থাকতে পারে। ওই জীবাণু যদি কোনোভাবে আমাদের পেটে যায় তখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমরা হাত দিয়ে খাই বা খাবার পরিবেশন করি। হাতের নোংরা ও জীবাণু ওই সময় আমাদের পেটে চলে যায়। তাই আমাদের অতি অবশ্যই খাওয়ার আগে এবং খাবার পরিবেশনের আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া উচিত। শুধু এইভাবে চললেই আমরা প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ পেটের অসুখ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

১০। নিয়মিত নখ কাটা :

আমাদের হাতের আঙুলে নখ থাকে। সেই নখগুলি আস্তে আস্তে বড়ো হয়। ফলে আমাদের আঙুলের মাংসের ও নখের মাঝে একটি ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। আমরা যখন নানা ধরনের কাজ করি তখন ময়লা সেই নখের ফাঁকে ঢুকে যায়। এই ময়লা সহজে বার করা যায় না। এমনকি সাবান দিয়ে ধুলেও ওই ময়লা থেকে যায়। তারপর যখন আমরা খাওয়া-দাওয়া করি বা খাবার পরিবেশন করি তখন ওই ময়লা থেকে জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। তাই আমাদের নখ নিয়মিত কাটতে হবে যাতে কোনো ময়লা নখের গোড়ায় না লাগতে পারে। কোনোমতেই দাঁত দিয়ে নখ কাটা চলবে না। তা হলে তো জীবাণুগুলি অতি সহজেই আমাদের পেটে চলে যাবে এবং আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ব। অনেকেই দাঁত দিয়ে নখ কাটে। এটা অত্যন্ত বাজে অভ্যাস এবং একে কেউ সু নজরে দেখে না।

১১। নিয়মিত দাঁত মাজা ও স্নান করা :

সারা দিনই আমরা নানা ধরনের খাবার খাই। খাওয়ার পরে আমরা মুখ ধুয়ে নিলেও খাবার ছোটো ছোটো অংশ দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকে। ওই খাবারগুলি আস্তে আস্তে পচে এবং এক ধরনের অ্যাসিড তৈরি হয়। ফলে দাঁতের ক্ষয় হয় এবং ধীরে ধীরে দাঁতে ফোকর তৈরি হয়। ফোকরগুলি বড়ো হয়ে দাঁতের গোড়ায় চলে যায়। তখন অসহ্য ব্যথা হয়। তখন দাঁতের ফোকরগুলির চিকিৎসা করাতে হবে। কিছুদিন পরে দাঁত তুলেও ফেলতে হয়। সেই জন্যই আমাদের সকলেরই দাঁত পরিষ্কার রাখতে হবে। দিনে দু'বার (ভোরে ঘুম থেকে উঠে এবং রাত্রে ঘুমাবার আগে) ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে হবে। দাঁত মেজে পুকুরের জলে মুখ ধোওয়া উচিত নয়। কারণ পুকুরের জলে অত্যন্ত নোংরা এবং নানা ধরনের জীবাণু থাকে। তখন আবার আমাদের নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ হতে পারে। তাই টিউবওয়েলের জলে মুখ ধোওয়া উচিত। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— মিষ্টি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ধুয়ে নেওয়া। তা না হলে আমাদের দাঁত খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। দৈনন্দিন কাজের সময় আমাদের শরীরে নানা ধরনের ময়লা লাগে। ঘাম হয়। তাই আমাদের ভালোভাবে স্নান করতে হবে। একইভাবে চুলেরও ময়লা সাফ করতে হবে। মাঝে মাঝে সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে মাথা সাফ করা উচিত।

১২। চটি বা জুতো পায়ে বাইরে বেরনো :

আমাদের মধ্যে অনেকেই মাঠে-ঘাটে পায়খানা করে। আবার কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণীরাও মাঠেই মলমূত্র ত্যাগ করে। এছাড়াও নানা প্রকারের নোংরা ও আবর্জনা মাঠে-ঘাটে ফেলা হয়। ফলে মাঠ-ঘাট খুব নোংরা থাকে। আমাদের পায়খানায় থাকে নানা ধরনের কৃমি। এদের মধ্যে আছে হুক কৃমি যা মাটিতেই জীবনধারণ করে। এগুলো খুব ছোটো এবং তাদের হুকের সাহায্যে সহজেই আমাদের চামড়া ভেদ করে শরীরে ঢুকে যায়। খালি পায়ে মাঠে-ঘাটে গেলে হুক কৃমি আমাদের পায়ের পাতা ভেদ করে শরীরে ঢুকে যায়। ফলে এই কৃমিতে আমরা আক্রান্ত হই। এই কৃমিতে আক্রান্ত হলে আমরা রক্তশূন্যতা ও অপুষ্টিতে ভুগি। এর ফলে আরও মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

খুব সবজেই এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, যদি আমরা বাইরে জুতো বা চটি পরে চলাফেরা করি। জুতো বা চটি পরা থাকলে কৃমি আমাদের শরীরে ঢুকতে পারবে না। অন্য ধরনের ময়লাও পায়ে লাগতে পারে না। জুতো পায়ে চলাফেরা করলে পায়ে চোট লাগার সম্ভাবনা থাকে না। পায়ে কাটা-ছেঁড়া থাকলে খালি পায়ে চলাফেরা করলেই ধনুষ্টঙ্কার নামে এক বিপজ্জনক অসুখও হতে পারে।

১৩। হাঁচি-কাশির সময় মুখ সরিয়ে, রুমাল বা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রাখা :

আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সর্দি-কাশিতে ভুগলে প্রায়ই হাঁচি বা কাশি। এই হাঁচি-কাশির সময় অনেক জীবাণু আমাদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। এগুলো হাঁচি-কাশির সময় অনেক দূরে যেতে পারে। ওই সময় একজন সুস্থ লোক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এ হাঁচি-কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসা জীবাণুও শরীরের ভেতরে নিয়ে নেয়। ফলে ওই সুস্থ লোকেরও অসুস্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। টি.বি. রোগ ছড়াবার এটি একটি বড়ো কারণ।

তাই হাঁচি-কাশির সময় আমাদের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া উচিত। শুধু তাইই নয়, হাঁচি-কাশির সময় রুমাল দিয়ে নাক মুখ ঢেকে রাখতে হবে। যেহেতু এর জন্য অন্যের অসুবিধা হতে পারে তাই হাঁচি বা কাশির পরে 'আমি দুঃখিত' বলা উচিত।

১৪। কোনো প্রকার রং দেওয়া খাবার, অ্যালুমিনিয়াম তবক দেওয়া মিষ্টি না খাওয়া :

আমরা যে সব খাবার দাবার বাইরে থেকে কিনে খাই তার মধ্যে অনেকগুলোই রং দিয়ে তৈরি করা। বাজারে রং দেওয়া মিষ্টি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। খাবারে যেসব রং দেওয়া হয় সেগুলোর অধিকাংশই নিষিদ্ধ রং। এগুলো কল-কারখানায় ব্যবহারের জন্য তৈরি। তাই এইসব বিষাক্ত রং পেটে গেলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি। মানুষের ক্যানসার হওয়ার এটাও একটা কারণ। তা হলে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি রং দেওয়া খাবার যেমন-জিলিপি, সন্দেশ ও নানা ধরনের মিষ্টি আর খাব না। রং দিয়ে খাবারের স্বাদ বাড়ে না কেবল দেখতে একটু অন্যরকম লাগে।

আজকাল আবার মিষ্টিতে তবক দেওয়ার চল হয়েছে খুব। এগুলো অ্যালুমিনিয়ামের খুব পাতলা পাত। এসব ধাতু আমাদের পেটে গেলে আমাদের ক্ষতি হয়। নানা অসুখ-বিসুখ হতে পারে। তা হলে গ্রামে-গঞ্জে স্লোগান তুলতে পারি — 'আমরা রং দেওয়া খাবার বা তবক দেওয়া মিষ্টি আর খাব না।' তা হলে দেখা যাবে যে কিছুদিনের মধ্যেই এইসব খাবার আর তৈরি হবে না।

১৫। ও. আর. এস-এর ব্যবহারের মাধ্যমে বাড়িতে পেটের অসুখ ও আন্ত্রিক চিকিৎসা :

আমাদের দেশে প্রতি ঘরেই একটি অসুখের দেখা মেলে। সেটি পেটের অসুখ। বাড়ির কেউ না কেউ বছরে এক-দু'বার এতে আক্রান্ত হয়। বাচ্চারা আক্রান্ত হয় সবচেয়ে বেশি। গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালেই এই রোগ বেশি দেখা যায়। স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং লোকেদের কতকগুলি ব্যক্তিগত খারাপ আচরণবিধিই হলো পেটের অসুখের মূল কারণ। পেটের অসুখের মধ্যে আবার আন্ত্রিক হলো সবচেয়ে খারাপ। অনেক সময় আন্ত্রিক ও কলেরার মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। দিনে দু-তিন বারের বেশি পাতলা পায়খানা হলে সাবধান হতে হবে। এটাকে ধরতে হবে পেটের অসুখ, ডায়রিয়া বা আন্ত্রিক। পাতলা পায়খানা ও বমির সঙ্গে আমাদের শরীর থেকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ বেরিয়ে যায়। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা ও বমির ফলে রোগীর শরীরে দেখা দেয় জলশূন্যতা। শরীরে জলশূন্যতা দেখা দিলে রোগী মারাও যেতে পারে। রোগীর শরীরে জলশূন্যতার কয়েকটি লক্ষণ দেখা দেয়। প্রাথমিক জলশূন্যতার লক্ষণগুলি হলো—পিপাসা, শরীরে অস্থিরতা, জিভ মাঝারি শুকনো, ঠোঁট শুকনো কিন্তু নাড়ি স্বাভাবিক। গুরুতর জলশূন্যতার লক্ষণ—আচ্ছন্নতা, হাত-পা শীতল, বাচ্চাদের তালু বসে যাওয়া, মূত্রাল্পতা, চোখ বসে যাওয়া, জিভ শুকনো, চিমটি কাটলে চামড়া মিলিয়ে যেতে সময় লাগা ইত্যাদি। রোগীর শরীরে যাতে জলশূন্যতা সৃষ্টি না হয়, তার জন্য পেটের অসুখের শুরু থেকেই ও.আর.এস সরবত খাইয়ে যেতে হবে।

পেটের অসুখের বা আন্ত্রিকের নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা হলো রুগীকে ও.আর.এস-এর সরবত খাওয়ানো। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী তৈরি ও.আর.এস-এর প্যাকেটে থাকে সোডিয়াম, পটাশিয়ামের লবণ এবং কিছুটা গ্লুকোজ। তাই এই মিশ্রণ রোগীকে পাতলা পায়খানা অসুখের শুরু থেকে খাওয়ালে আর কোনো ভয় থাকে না। ও.আর.এস-এর ২৭.৯ গ্রামের প্যাকেটের মিশ্রণ ১ লিটার কলের জলে (ফুটিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে) মিশিয়ে সরবত তৈরি করতে হবে। রোগীকে কিছুক্ষণ পরে পরেই এই মিশ্রণ খাওয়াতে হবে।

তবে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে : রোগীর অবস্থা খারাপ হলে (চামড়া চিমটি দিয়ে ছেড়ে দিলে কুঁচকে থাকলে ও চোখের মণি ঘোলাটে বা স্থির হতে থাকলে, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে) রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

বাড়িতে সব সময় দুটি ও.আর.এস প্যাকেট অবশ্যই মজুত রাখতে হবে। হাসপাতাল, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, স্যানিটারি ও ওষুধের দোকানে ও.আর.এস-এর প্যাকেট পাওয়া যায়।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কর্মসূচি—স্বাস্থ্য নির্দেশ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিদর্শন

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি — বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. স্বাস্থ্য নির্দেশ

২. স্বাস্থ্য পরিষেবা

৩. স্বাস্থ্য পরিদর্শন

১. স্বাস্থ্য নির্দেশ ঃ শিক্ষক, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী বা অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে যে তথ্য জ্ঞাপন করা হয় - যার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত সু-অভ্যাস গড়ে ওঠে, তাকে স্বাস্থ্য নির্দেশক বলা হয়। যার মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সংক্রামক ব্যাধি, ব্যায়াম, বিশ্রাম, পুষ্টি, খাদ্য, এইডস ও ড্রাগস সম্পর্কে যথাযথ ধারণার উল্লেখ করা হয়। এ বিষয়ে শিক্ষায়তনের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২. স্বাস্থ্য পরিষেবা ঃ স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনগণের চেতনা বৃদ্ধি ও অসুস্থ ছাত্রছাত্রীদের রাখতে সাহায্য করে যে বিশেষ ধরনের পরিষেবা দেওয়া হয় তাকেই স্বাস্থ্য পরিষেবা বলে। স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে সাধারণতঃ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষণ এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একত্রিত প্রচেষ্টাকে বোঝায়।

স্বাস্থ্য পরিষেবা হলো স্বাস্থ্য পরিকল্পনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। স্বাস্থ্য পরিষেবার অধীনস্থ বিভিন্ন দায়িত্বগুলি হলো —

১। সংক্রামক ব্যাধি চিহ্নিতকরণ, প্রতিরোধ

২। ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

৩। দ্বিপ্রহরকালীন আহার

৪। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও মূল্যায়ন

৫। হেলথ কার্ড নথিভুক্তকরণ ইত্যাদি

স্বাস্থ্য পরিষেবার উদ্দেশ্য ঃ

আদর্শ স্বাস্থ্যরক্ষা কর্মসূচির কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। যেমন

(i) ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যেমন শিক্ষার্থীর উচ্চতা, ওজন, শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি।

(ii) শিক্ষার্থীর কোনো স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা থাকলে তা নির্ণয় করা এবং তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

(iii) ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে অবহিত করা।

(iv) মানবদেহের গঠন ও বিভিন্ন তন্ত্রগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন ও সচেতন করা।

(v) রোগের আক্রমণ ও তার প্রতিরোধ এবং নিরাময় ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

(vi) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ তৈরি করা, যেমন — উপযুক্ত আলো-বাতাসপূর্ণ শ্রেণিকক্ষ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, উপযুক্ত খেলার মাঠ ইত্যাদি।

(vii) বয়স অনুযায়ী দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সুষম খাদ্যতালিকা প্রকাশ করা।

(viii) নিয়মিত ব্যায়াম ও শরীর চর্চা এবং উপযুক্ত বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া।

(ix) ব্যক্তিগত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করা ও সুঅভ্যাস গঠন করা।

(x) নিরাপত্তা শিক্ষা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে সচেতন করা ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য পরিষেবার উদ্দেশ্য ঃ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য পরিষেবার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যেমন ঃ—

(১) নির্দিষ্ট সময়ান্তরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা-এর ব্যবস্থা করা।

(২) স্বাস্থ্য পরীক্ষা-এর রেকর্ড রাখা।

(৩) সবসময় প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা রাখা।

(৪) সংক্রামক রোগের প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(৫) স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৬) সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৭) স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা; সেমিনার ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার কর্মসূচি হলো– ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যাহ্ন আহার (Mid-day meal), পরিচ্ছন্নতা, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দেওয়া। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে Health Card এ তা সঠিকভাবে নথিভুক্ত করা।

বিদ্যালয়ে বাইরে স্বাস্থ্য পরিষেবার কর্মসূচি হলো–

I. টিকাকরণ কর্মসূচি পালন ও উদ্বুদ্ধ করা।

II. রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা।

III. অসুস্থদের নির্দিষ্ট প্রতিবিধান দেওয়া।

IV. এইডস্ সচেতনতা ক্যাম্প করা, হেপাটাইটিস-বি টিকাকরণ প্রভৃতি।

স্বাস্থ্য পরিদর্শন ঃ বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার দুটি দিক আছে, স্বাস্থ্যগত দিক ও শিক্ষাগত দিক। এই দুটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের দুটি ধারা বিদ্যমান। যথা– ১) শিক্ষক কর্তৃক প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও ২) চিকিৎসক কর্তৃক স্বাস্থ্য পরিদর্শন (সপ্তাহে কিংবা মাসে)।

শিক্ষক কর্তৃক প্রাত্যহিক স্বাস্থ্য পরিদর্শন বা পর্যবেক্ষণ ঃ

১. বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ, ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ, লিখন-পঠন পাঠনের সামগ্রী, দাঁত, কান, চোখ, নখ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখবেন।

২. হাম, মাম্পস, বসন্ত, হুপিংকাশি, ডিপথেরিয়া- প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

৩. শারীরিক ছাড়া মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থীদের হীনমন্যতা, উৎকণ্ঠা, ভয়, নিরানন্দ ভাব, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি থেকে মুক্ত করবেন। কারণ এগুলো সবই শিশুর স্বাভাবিক শিক্ষালাভের অন্তরায়।

চিকিৎসক কর্তৃক স্বাস্থ্য পরিদর্শন (সপ্তাহে কিংবা মাসে) ঃ

১. বিদ্যালয়ের গৃহে সেনেটারী ব্যবস্থা ইত্যাদি বিজ্ঞান সম্মত কিনা তা পরীক্ষা করা ও কর্তৃপক্ষকে জানানো।

২. বিদ্যালয়ের পানীয় জল স্বাস্থ্য সম্মত কিনা তা পরীক্ষা করা ও কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া।

৩. বিদ্যালয়ের সময় তালিকা পঠন পাঠন কর্মপরিকল্পনা স্বাস্থ্য সম্মত কিনা তা পরীক্ষা করা।

৪. স্বাস্থ্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রয়োজন মতো পরামর্শ দেওয়া।

৫. কোনো সংক্রামক ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিলে তার যথাযথ চিকিৎসা করা।

৬. ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে শরীর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ করা।

স্বাস্থ্য রক্ষার কর্মসূচি ঃ

স্বাস্থ্য শিক্ষার কর্মসূচি, খেলোয়াড় তথা ছাত্র-ছাত্রীদের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের উন্নতির উপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবে কর্মসূচিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা ঃ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উন্নত মানের প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রক্ষা করতে পারেন। যেমন- হাম, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়রিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগের কারণ ও প্রসার সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা। বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। যেমন- যত্র-তত্র থুথু না ফেলা, বিভিন্ন রকম আবর্জনা ফেলার জন্য একাধিক পাত্র রাখা যাতে নোংরা আবর্জনা সর্বত্র ছড়িয়ে না পড়ে২, ইত্যাদি।

২. নিরাময় মূলক ব্যবস্থা ঃ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নিরাময় মূলক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন- বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে রোগের ধরন অনুযায়ী পৃথক করে আলাদা আলাদাভাবে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

আদর্শ স্বাস্থ্য রক্ষার কর্মসূচির করণীয় বিষয় ঃ

১. প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। যেমন- উচ্চতা, ওজন, দৈহিক কাঠামো, পুষ্টি, স্নায়বিক ও মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য।

২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের দৈহিক অপাঙ্গগুলি নির্ধারণ।

৩. মানব দেহের গঠন ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন।

৪. মানব দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধনের জন্য সুষম খাদ্য তালিকা প্রকাশ।

৫. বিভিন্ন ঋতু, রোগব্যাধি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা।

৬. ছাত্র-ছাত্রীদের বয়ঃসন্ধিকাল ও তাদের বিভিন্ন দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন করা।

৭. প্রত্যহ শরীরের যত্ন নিতে ও সু-অভ্যাস গঠনে সাহায্য করা।

৮. নিয়মিত শরীরচর্চা, সময় মতো মল-মূত্র ত্যাগ, নিদ্রা, খাওয়া ও বিশ্রাম নিতে অভ্যস্ত করে তোলা।

অনুসরণ মূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (Follow-up) ঃ স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অনুসরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। যে সব শিক্ষার্থীদের কোনো সময় কোনো বিশেষ অসুবিধা লক্ষ করা গেলে তাদের এই অসুবিধা চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে যদি পরীক্ষামূলক অনুসরণ করা হয়, তাহলে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোন মূল্য থাকে না। স্বাস্থ্য পরীক্ষকের কাজ শুধু রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করাতেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষকরা স্বাস্থ্য রক্ষার কর্মসূচির বিষয়গুলি অনুসরণ করলে তবেই তিনি শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশে সাহায্য করতে পারবেন। এই ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করবার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। যথা–

১. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয়, প্রধান শিক্ষক, অথবা কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারা অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

২. শিক্ষায়তনের চিকিৎসা কেন্দ্রের সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

৩. শিক্ষায়তনের চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকলে অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থায়ী কোনো সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. রোগে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর বাড়ির লোক তথা অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

চিকিৎসা মূলক আরোগ্যশালা ঃ স্বাস্থ্য রক্ষা কর্মসূচি শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর রোগ নির্ণয় ও তার চিকিৎসার জন্য অভিভাবকদের বিজ্ঞপ্তি দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীদের দৈহিক অসুস্থতা দূর করা ও তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা স্বাস্থ্যরক্ষা কর্মসূচির এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশ সাধনে পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়েরও বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা ও তা রক্ষনাবেক্ষণ করা ব্যয়সাপেক্ষ, তাই আমাদের দেশে স্টুডেন্ট হেল্‌থ হোমগুলি আরোগ্যশালা হিসাবে কাজ করে। স্টুডেন্ট হেলথ হোমগুলিতে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা ভীষণ ব্যয়সাপেক্ষ, এখানে সাধারণতঃ সর্দিকাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, দাদ, খোস, চর্মরোগ, চোখ, কান, গলা প্রভৃতির চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। যদি এই সমস্ত চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি উপযুক্ত স্থান ও দক্ষ কর্মী নিয়োগ করে তাহলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভব।

স্বাস্থ্যের নমুনার লিপিবদ্ধকরণ ঃ স্বাস্থ্য রক্ষা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিক হলো স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলের লিপিবদ্ধকরণ, যা শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের উন্নতি বা অবনতির মূল্যায়নে সাহায্য করে। এর জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তির প্রথম দিনেই প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নামে একটি করে স্বাস্থ্য কার্ড তৈরি করতে হবে এবং এই হেলথ কার্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম, শ্রেণি, বয়স, উচ্চতা, ওজন, পাল্‌স

রেট, দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, রক্তের গ্রুপ, কোনো রোগ আক্রান্ত কিনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সময় যা ভীষণভাবে কাজে লাগে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ঃ যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে শিশু তথা ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, বৌদ্ধিক প্রভৃতি গুণাবলির বিকাশ ঘটে এবং সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনে নিরলস, নির্মল কর্মোচ্ছল সৃজনশীলতার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারে তাকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বলে। স্বাস্থ্যরক্ষা কর্মসূচির দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে।

১. প্রত্যক্ষ দিক - ছাত্র-ছাত্রীদের রোগ নির্ণয় ও তার স্বাস্থ্য রক্ষা, স্বাস্থ্য উন্নতি, শিশুর শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সর্বোপরি শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করে। শুধুমাত্র সুচিকিৎসা, সুষম খাদ্য গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের সুষম বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তার জন্য দরকার সুস্থ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ যা শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতির ও অসুবিধা দূরীকরণের পক্ষে সহায়ক।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশের উপকরণ ঃ একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশের নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বাঞ্ছনীয়। যথা - ১) নির্মল বাতাস, ২) পর্যাপ্ত সূর্যালোক, ৩) জীবাণু মুক্ত পরিবেশ, ৪) বিশুদ্ধ পানীয় জল, ৫) স্বাভাবিক জনবসতি, ৬) উপযুক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা, ৭) বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুব্যবস্থা, ৮) শব্দ দূষণ নিরাপত্তা, ৯) জল ও বায়ু দূষণ নিরাপত্তা, ১০) রাজনৈতিক সুস্থিরতা ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, ১১) খেলার মাঠ ও শরীর চর্চার উপযুক্ত ব্যবস্থা, ১২) বিনোদন মূলক কর্মসূচির সুব্যবস্থা প্রভৃতি।

শিক্ষায়তনের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ঃ স্বাস্থ্য রক্ষা কর্মসূচির প্রত্যক্ষ দিক যেমন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সুষম খাদ্য সরবরাহ করা এবং শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা দূর করে স্বাভাবিক জীবন দান করা। তেমনি পরোক্ষ দিক হলো– স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যোন্নতিতে সহায়তা করা এবং অসুস্থতার কারণগুলি দূর করা। সুতরাং বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করা স্বাস্থ্যরক্ষা কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ। এটি কতগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন —

১. **প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ঃ** শিক্ষায়তন যতটা সম্ভব শান্ত ও কোলাহল মুক্ত পরিবেশে রাস্তার ধারে অবস্থিত হওয়া উচিত। যাতে যোগাযোগ ও যাতায়াতের সুবিধা হয়, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সময়মতো বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারেন এবং নিজ নিজ কাজে পূর্ণ-মনোযোগ দিতে পারেন। শান্ত পরিবেশে পঠন পাঠন প্রক্রিয়া মনোযোগ সহকারে সম্পন্ন হয়।

২. **আকৃতি ও আয়তন ঃ** শিক্ষায়তনের আকৃতি এবং আয়তন, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর সদস্য সংখ্যার অনুপাতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩. **ভবন ও শ্রেণিকক্ষ ঃ** শিক্ষায়তনের ভবন সাধারণত দক্ষিণমুখী হওয়া উচিত, যাতে সূর্যালোক ভবনের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে। শ্রেণিকক্ষের জানালা দরজাগুলি বড়ো হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. **কার্যালয় ঃ** শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী অফিস ঘরের আকৃতি হওয়া উচিত। এটি এমন জায়গায় অবস্থিত হবে যেখান থেকে সমস্ত শ্রেণি কক্ষগুলি লক্ষ করা যাবে, যাতে প্রধান শিক্ষক মহাশয় সহজেই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারেন।

৫. **বিশ্রাম কক্ষ ঃ** বিদ্যালয়ে টানা ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা কেবলমাত্র পড়াশুনাতে মনোযোগ রাখা কষ্টকর, তাই একঘেয়েমি ভাব কাটানোর জন্য আলাদা বিশ্রাম কক্ষের প্রয়োজন, যেখানে হাল্কা বিনোদনমূলক কিছু ইন্‌ডোর গেমের ব্যবস্থা থাকবে। ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীরা নতুনভাবে পূর্ণমনোযোগ সহকারে শিক্ষালাভ করতে সক্ষম হবে।

৬. **আসবাব পত্র ঃ** শ্রেণিকক্ষের আসবাব পত্র শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা আরামে বসে শিক্ষালাভ করতে পারে, তা না হলে শিশুদের বিভিন্ন রকম দেহভঙ্গির বিকৃতি বা খারাপ দেহভঙ্গিমা হতে পারে। তাই বেঞ্চের উচ্চতা শিক্ষার্থীদের উচ্চতা ও ব্ল্যাকবোর্ডের দূরত্ব অনুযায়ী হবে।

৭. **পাঠাগার ঃ** শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের বই, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ প্রভৃতি শিক্ষার্থীদেরকে সহজেই সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি শিক্ষায়তনে একটি করে আদর্শ পাঠাগার থাকা উচিত এবং এই পাঠাগারে যথেষ্ট নিরিবিলি খোলামেলা জায়গা থাকবে, যাতে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনাতে ব্যাঘাত না ঘটে।

৮. **খেলার মাঠ ঃ** বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ বিদ্যালয়ের সুস্থ পরিবেশ রচনার সহায়ক এবং শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক দিকের উন্মেষ ঘটাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 'গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা শ্রেয়', অর্থাৎ শরীর ও মন সুস্থ রাখতে হলে কায়িকশ্রম অবশ্যই করণীয়। খেলাধুলার মাধ্যমে কায়িকশ্রম করে শরীরকে অধিক কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা যায়। শারীরশিক্ষা কার্যক্রমকে বাস্তব রূপদানের ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত খেলার মাঠ অবশ্যই প্রয়োজন।

৯. **জল সরবরাহ ঃ** বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য খারাপ ও জলবাহিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জলনিকাশের সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, বাহ্যিক কোনো জল বা বৃষ্টির জল জমে নানারকম রোগের জীবাণু সৃষ্টি হতে পারে যা শিশুদের সুস্বাস্থ্যের পরিপন্থী।

১০. **শৌচাগার ঃ** বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী শৌচাগার নির্মাণ করতে হবে। ছাত্র ও ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক পৃথক শৌচাগার নির্মাণ করতে হবে। শৌচাগারগুলি নিয়মিতভাবে জীবাণু নাশক পদার্থ যেমন ফিনাইল, ন্যাপথলিন, কার্বলিক অ্যাসিড প্রভৃতি দিয়ে পরিষ্কারের এবং শৌচাগারের জল নির্দিষ্ট একটি জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. **আরোগ্যশালা ঃ** প্রতিটি শিক্ষায়তনে একটি করে আরোগ্যশালা (Clinic) থাকা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যশিক্ষার উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য আরোগ্যশালার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের রোগ নির্ণয় করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। চিকিৎসা ও প্রয়োজনে যথাস্থানে পাঠানো ব্যবস্থা ও সেখানে গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে এই কাজটি করা যেতে পারে।

১২. **বিপদমুক্ত ব্যবস্থাদি ঃ** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী, মূল্যবান নথি ও দামি জিনিসপত্র থাকে। যেকোনো সময়ে, যে কোনো দুর্ঘটনা বিশেষ করে অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে এই সমস্ত নথি রক্ষা করার জন্য অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

১৩. **পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ** নিয়মিতভাবে শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র, খেলার মাঠ পরিষ্কার করা দরকার। এতে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় থাকে ও মনের মধ্যে প্রফুল্লতার সঙ্গে কর্মপ্রেরণা জাগে।

১৪. **শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ** কাজের গতি এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সর্বোপরি যা দরকার তা হলো পরস্পরের মধ্যে কুশল বিনিময়। শ্রদ্ধা ও কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলি যদি কর্মীদের মধ্যে থাকে তাহলে কাজের একটি সুস্থ পরিবেশ তৈরি হয় এবং এতে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। একে অন্যের সুখ ও দুঃখের সঙ্গী হতে পারে।

খেলার মাঠের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ঃ শারীরশিক্ষা কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো খেলার মাঠ। খেলার মাঠ ব্যতিরেকে শারীরশিক্ষা কার্যক্রমের কোনো কর্মসূচি সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা এবং শরীর চর্চা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একটা আদর্শ খেলার মাঠ একান্ত প্রয়োজন। খেলার মাঠকে বলা হয় শারীরশিক্ষা কার্যক্রমের 'ল্যাবরেটরি'। তাই প্রতিটি শিক্ষায়তনে এবং প্রতিটি গ্রাম বা শহরে অন্তত একটি করে আদর্শ খেলার মাঠ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। একটি আদর্শ খেলার মাঠের পরিবেশ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

১. খেলার মাঠ বিদ্যালয় সংলগ্ন বা গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে হবে।

২. খেলার মাঠ কমপক্ষে ১৩০ মিটার দীর্ঘ ও ৯০ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট হবে।

৩. খেলার মাঠ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা উচিত, যাতে সেখানে গবাদি পশু প্রবেশ করতে না পারে।

৪. মাঠে প্রবেশের জন্য একাধিক প্রবেশ পথ থাকবে।

৫. মাঠে পর্যাপ্ত সবুজ ঘাস থাকা উচিত এবং চারপাশে শোভাবর্ধনকারী চিরহরিৎ বৃক্ষ লাগানো ভালো।

৬. খেলার মাঠ উত্তর-দক্ষিণমুখী হলে ভালো হয়। মাঠের পাশে পর্যাপ্ত দর্শক আসন থাকবে।

৭. খেলোয়াড়দের পোশাক পরিবর্তনের জন্য ছেলে ও মেয়েদের আলাদা আলাদা ঘর থাকবে।

৮. ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক স্বাস্থ্যকর শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকবে।

৯. মাঠে যাতে জল না জমে তার জন্য মাঠ হবে সমতল ও মধ্যবর্তী অঞ্চল অপেক্ষাকৃত উঁচু।

১০. মাঠের চারপাশে জল নিকাশি ব্যবস্থা থাকবে এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে।

১১. খেলার সরঞ্জাম রাখার জন্য মাঠের একপাশে Store Room থাকবে।

১২. মাঠের পরিচর্যা করার জন্য একজন মালি থাকবেন।

১৩. মাঠের স্থায়ী উপকরণ যেমন গোলপোষ্ট, খো-খো পোল, ভলিবল কোর্ট প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে।

১৪. প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে।

১৫. মাঠের চারপাশে আলোর ব্যবস্থা থাকবে।

১৬. পরিচালক ও বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষক মহাশয়গণের জন্য বিশ্রাম কক্ষ থাকবে।

১৭. অংশগ্রহণকারী দুই দলের প্রতিনিধিদের জন্য নির্ধারিত আসনের ব্যবস্থা থাকবে।

পরিবেশ কিভাবে দূষিত হয় (Causes of Environmental Pollution)

মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য অপরিকল্পিতভাবে ছোটো বড়ো নানান ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে। অধিক ফসল ও ফসল রক্ষার তাগিদে নানান ধরনের রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এমনকি ব্যবসায়িক কারণে অধিক মুনাফার জন্য খাদ্যে ভেজাল বা ক্ষতিকারক উপাদান মেশানো হয়। শিল্প কারখানার রাসায়নিক পদার্থ, ধোঁয়া, গ্যাসীয় পদার্থ, শিল্পে নির্গত বর্জ্য পদার্থ, মটর গাড়ির ধোঁয়া, সীসা জাতীয় পদার্থ প্রভৃতি অহরহ ভৌত পরিবেশকে দূষিত করছে। এছাড়া মানুষ নিজেই নিজের পরিবেশ নষ্ট করে যেমন সিগারেটের ধোঁয়া, আবর্জনা ফেলা, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদির দ্বারা। বন, জঙ্গল নির্মূল করে, বিভিন্ন কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করে জৈব পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। তেমনি দারিদ্র্যতা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক সংঘাত, ভেদাভেদ, দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ প্রভৃতি মন-সামাজিক পরিবেশ নষ্ট করে।

৪.৬ শারীরিক উচ্চতা ও ওজনের তালিকা নথিভুক্ত ও তার ব্যবহার (Records of Body Height and Weight, their uses)

সূচনা (Introduction)

একজন শিশুর শারীরিক ওজন ও উচ্চতার সঙ্গে তার দেহভঙ্গি, খেলাধূলা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছে। অপর দিকের দেহের ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী শিশুদের বিভিন্ন ভাগ বা পর্যায়ে নথিভুক্ত করা হয়ে থাকে। শিশুটি কোন খেলায় আরো বেশি করে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে সেটা নির্ভর করে শিশুটির ওজন ও উচ্চতার সম্পর্কের উপর অপেক্ষাকৃত মোটা বা মেদবহুল শিশুদের রেসলিং, কুস্তি, বক্সিং ইত্যাদি খেলাতে অংশগ্রহণ করানো যেতে পারে। আবার যেসব শিশুর দেহের ওজন কম অথচ তারা লম্বা তাদেরকে দূরপাল্লার দৌড়, বাস্কেটবল, ভলিবল ইত্যাদি খেলায় অংশগ্রহণ করানো যেতে পারে। শিশুর দেহের ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী তার Body Mass Index বা BMI নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

এর সূত্রটি হল [1 inch = 2.54 cm]

$$BMI = \frac{\text{Weight বা ওজন}}{\text{Height বা উচ্চতা (মিটার)}^2}$$

নিচে বডি মাস ইনডেক্স-এর একটি চার্ট দেওয়া হলো।

ওজন কেজি —	৪৫.৫	৪৭.৭	৫৪.০	৫২.৩	৫৪.৫	৫৬.৮	৫৯.১	৬১.৪	৬৩.৬	৬৩.৮
দৈহিক উচ্চতা										
৫′০ ইঞ্চি	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
৫′১″	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
৫′২″	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
৫′৩″	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
৫′৪″	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
৫′৫″	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
৫′৬″	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
৫′৭″	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫′৮″	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫′৯″	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
৫′১০″	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
৫′১১″	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
৬′.০″	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১

প্রয়োজনের তুলনায় আপনার —

(i) ওজন কম (বি.এম.আই ১৮.৫ এর কম)

(ii) স্বাস্থ্যকর ওজন (বি.এম.আই ১৮.৫ — ২৪.৯)

(iii) মাত্রাতিরিক্ত ওজন বি.এম.আই ২৫ — ২৯.৯)

(iv) আপনার সমস্যা স্থূলত্বকে অতিক্রম করেছে (বি.এম.আই - ৪০ বা তার বেশী)

টীকাকরণের গুরুত্ব ও কার্যকারীতা (Importance of Immunization)

শিশু জন্মের পর থেকেই তার কিছু সমস্যা থাকে তার নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে। কারণ তখন তার শরীরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা সেভাবে গড়ে ওঠে না। তাই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই তাকে বাহ্যিক ভাবে কিছু ওষুধ প্রয়োগ করা হয় যা তাকে সুস্থ সবল দেহের অধিকারী হতে সাহায্য করে। এরকম কিছু টীকা দেওয়া হয় তাদের যা বিভিন্ন বয়সে সঠিক ভাবে তাকে নিতে হয়।

সেগুলি হল নিম্নরূপ :-

টীকাকরণ সম্পর্কিত তথ্য (Table of Immunization) [শিশুরা যে ধরনের টীকা নিয়ে থাকে সেগুলির একটি তালিকা]

টীকার নাম	**হ্যাঁ/না**	**(হ্যাঁ হলে) তারিখ**
বি.সি.জি		
টিটেনাস		
ডি.পি.টি		
ভিটামিন এ		
ও.পি.ভি (পোলিও)		
হেপাটাইটিস - বি		
হাম		
জাপানীজ এনকেফেলাইটিস		
অন্যান্য		

রোগ ও অসুস্থতার বিবরণ

[প্রতি বছর অন্তত দুবার পরীক্ষা করে অসুস্থতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।]

২০১৩-১৪: ১ম পরীক্ষা ২০১৪-১৫: ১ম পরীক্ষা ২০১৫-১৬: ১ম পরীক্ষা

২০১৩-১৪: ২য় পরীক্ষা ২০১৪-১৫: ২য় পরীক্ষা

বিভিন্ন ধরনের রোগ ও অসুস্থতার তালিকা

জন্মগত সমস্যা	**ঘাটতিজনিত সমস্যা**	**শৈশবকালীন সমস্যা**	**অক্ষমতা/প্রতিবন্ধকতা**
১.নিউরাল টিউব ডিয়েন্ট	১. রক্তাল্পতা	১. ত্বকের সমস্যা	১. দেখার সমস্যা
২. ডাউনাস সিন্ড্রোম	২. ভিটামিন-এ অভাব	২. ওটাইটিস মিডিয়া	২. শোনার সমস্যা
৩. ট্যালিপেস (ক্লাবকুট)	৩. ভিটামিন-ডি অভাব	৩. দাঁতের ক্ষয়	৩. কথা বলা বিলম্ব
৪. জন্মগত ছানি	৪. গলগণ্ড	৪. খিঁচুনি	৪. শিখনগত সমস্যা
৫. জন্মগত বধিরতা			৫. বিলম্বিত বোধশক্তি
৬. জন্মগত হৃদযন্ত্র			৬. মনোযোগের অভাব
			৭. অন্যান্য

৪.৭ বিশুদ্ধ জলের ব্যবহার (Usess of Drinking water)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জলের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ জীবনধারণের জন্য জল একান্ত প্রয়োজন। দেহে জলের সাম্য বজায় রাখার জন্য জল গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়। এই সাম্য বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন পর্যাপ্ত জলপান করা উচিত। তবে জল সবসময় বিশুদ্ধ ও নিরাপদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিশুদ্ধ জলের বৈশিষ্ট্য হলো —

(১) স্বাদহীন ও শীতল হবে।

(২) দুর্গন্ধহীন ও স্বাভাবিক বায়ুমিশ্রিত হবে।

(৩) রোগজীবাণুমুক্ত নিরাপদ জল হবে।

নিরাপদ বিশুদ্ধ জলের বিভিন্ন ব্যবহারগুলো হলো —

মানবদেহে ব্যবহার ঃ

(১) রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে এবং রক্তকে তরল রাখে।

(২) পরিপাক ও দেহগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(৩) রেচন পদার্থসমূহকে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত করতে সাহায্য করে।

(৪) দেহকোশে জলের সমতা বজায় রাখে।

(৫) শরীরের অভ্যন্তরীণ তন্ত্রগুলোর পরিচালনায় সাহায্য করে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহার ঃ

(১) বিশুদ্ধ জল চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

(২) হাসপাতাল বা বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিশুদ্ধ জল বিপুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়।

অন্যান্য ব্যবহার ঃ

(১) রান্নার জন্য বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করা উচিত।

(২) বিশুদ্ধ জলে জামাকাপড় বেশি পরিষ্কার হয় ও উজ্জ্বলতা বজায় থাকে।

(৩) সাঁতার শেখার জন্য সুইমিং পুলে বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করা হয়।

(৪) বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশুদ্ধ জলের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

বিশুদ্ধ বায়ুর ব্যবহার (Uses of Air)

জীবনধারণের জন্য আমরা বায়ুর উপর নির্ভরশীল। বায়ু ছাড়া আমরা শ্বাসগ্রহণ করতে পারি না। পরিবেশ সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর রাখার জন্যও বিশুদ্ধ বায়ু বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিশুদ্ধ ও নির্মল বায়ু শিশুকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান করে তোলে।

বিশুদ্ধ বায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো —

(১) বর্ণ ও গন্ধহীন হবে।

(২) জীবাণুমুক্ত হবে।

(৩) উপযুক্ত পরিমাণে অক্সিজেন থাকবে।

বিশুদ্ধ বায়ুর ব্যবহার ঃ

(১) জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসে বিশুদ্ধ বায়ু বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(২) পরিবেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৩) বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, বাড়ির পরিবেশ ইত্যাদি জায়গার বিশুদ্ধ বায়ু সকলকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

(৪) বিশুদ্ধ বায়ু রোগজীবাণু ছড়াতে বাধা দেয়।

(৫) পরিবেশকে জীবাণুমুক্ত রাখে।

আলোর ব্যবহার (Uses of Light)

চোখ দিয়ে আমরা দেখলেও আলো ছাড়া চোখের গুরুত্ব কম। কারণ আলো ছাড়া আমরা কোনো কিছুই দেখতে পাই না। তবে আলোর তীব্রতার উপর আমাদের দৃষ্টিশক্তির ভালোমন্দ নির্ভর করে। উপযুক্ত আলোই স্বাস্থ্যকর, কম বা বেশি আলো দৃষ্টিশক্তির উপর খারাপ প্রভাব ফেলে।

উপযুক্ত আলোর ব্যবহার ঃ

(১) দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখতে ব্যবহার করা হয়।

(২) খেলার মাঠে উপযুক্ত আলো ছাড়া ভালো দক্ষতা দেখানো যায় না।

(৩) বিদ্যালয়ে উপযুক্ত আলোয় পড়াশোনা ভালো হয়।

(৪) ছাত্রছাত্রীদের মনঃসংযোগ বাড়ে।

(৫) কলকারখানায় উপযুক্ত আলোয় উৎপাদন বেশি হয় এবং শ্রমিকদের দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকে।

(৬) উপযুক্ত আলোয় রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনা কম হয়।

শৌচাগার (Sanitary)

উদ্দেশ্য: রোগ প্রতিরোধ ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।(Objectives of Sanitary Toilets)

স্বাস্থ্যবিধান হলো মানুষের মল ও মূত্রের নিরাপদ নিষ্কাশন ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা। এক গ্রাম মলে এক কোটি ভাইরাস, দশ লক্ষ ব্যাকটেরিয়া, এক হাজার প্যারাসাইট ডিম থাকতে পারে। মানুষের মলই অধিকাংশ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর উৎস। এমনকি পোলিও রোগের জীবাণুও আক্রান্ত শিশুর মলের মাধ্যমে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, অন্যান্য শিশুদের জীবন বিপন্ন করে দিতে পারে।

শৌচাগার ব্যবহারের নিয়মাবলী (Direction to use Sanitary Toilets)

* হাওয়াই চপ্পল পরে শৌচাগারে যেতে হবে।
* পায়খানায় বসবার আগে প্যানটি জলে ভিজিয়ে নিতে হবে।
* ব্যবহারের পর প্যানে পর্যাপ্ত জল ঢালতে হবে। দেখতে হবে যেন মল প্যানে না লেগে থাকে বা না ভেসে থাকে।
* সাধারণত ১-২ লিটার জল প্যানে ঢালতে হবে।
* ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। আঙুলের নখ যাতে সঠিকভাবে কাটা থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
* প্রতিদিন প্রস্রাবাগার, চাতাল, পাদানি ও প্যান পরিষ্কার করতে হবে।
* শৌচাগার ব্যবহারের সময় ও পরে সঠিকভাবে দরজা খোলা ও বন্ধ করা যায় যাতে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
* স্কুল ছুটির সময় গেটে তালা দেওয়ার আগে সুনিশ্চিত হতে হবে যে শৌচাগারে কোনো কিছু নেই।

শিক্ষক/শিক্ষিকাদের ভূমিকা :

* সঠিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবহার সম্পর্কে পড়ুয়া থেকে পড়ুয়া, পড়ুয়া থেকে অভিভাবক ও শিক্ষক থেকে সমাজে আলোচনা সম্প্রসারিত করতে হবে।
* যেসব পড়ুয়ার বাড়িতে শৌচাগার নেই তাদের অভিভাবকদের এবিষয়ে সচেতন করে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় সেই সমস্যা সমাধানের সফল পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট হতে হবে।
* প্রয়োজনে পড়ুয়া, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা একটি দল তৈরি করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কে আলোচনা ও সচেতনতা অভিযান করবেন।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন — ২ (Check Your Progress – 2)

(ক) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়।

উঃ .....।

(খ) স্বাস্থ্যকর পরিবেশের চারটি উপকরণের নাম লিখুন।

উঃ .....

.....।

(গ) BMI কথাটির অর্থ কী?

উঃ .....।

৪.৮ খাদ্য ও পুষ্টি (Food and Nutrition)

খাদ্য ও পুষ্টির ধারণা : (Information on Food and Nutrition)

যে প্রক্রিয়ায় জীব তার মৌলিক জৈবনিক ক্রিয়াগুলি (যেমন—বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রোগপ্রতিরোধ) সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও শক্তি সংগ্রহ করে বা সরবরাহ করে চলে তাকে পুষ্টি বলে। আর যে সকল জৈব, অজৈব বস্তু গ্রহণ করে জীব পুষ্টি লাভ করে থাকে তাকেই বলে পরিপোষক। আর এই পরিপোষক বা আহার্য সামগ্রীর মধ্যে যাদের নির্দিষ্ট

তাপনমূল্য আছে অর্থাৎ যারা সাধারণত জীবদেহ গঠনে অংশগ্রহণ করে তাদেরকেই খাদ্য বলে। আর তাই পুষ্টির জন্য চাই জীবদেহে নিয়মিত খাদ্যবস্তুর যোগান। যার থেকে জীব নতুন প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তু তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান পেয়ে থাকে।

শিশুদের পুষ্টির যোগান, অপুষ্টির কারণ ও তার প্রতিকার (Planning for Food and Nutrition)

পুষ্টিকর খাদ্য বলতে বোঝায় সেই খাদ্য যা গ্রহণ করলে শারীরবৃত্তিক কার্যবলীর পুষ্টি নিয়ন্ত্রণ, দেহের প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান, দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণে যথাযথ হয়। পুষ্টিকর খাবার বিভিন্ন অবস্থায় দেহের গঠনগত দিক ও শারীরবৃত্তিক কাজের মধ্যে সমতা বজায় রাখে।

পুষ্ঠিকর খাদ্য পরিকল্পনার জন্য যে সমস্ত নীতিগুলি গ্রহণ করা হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ :-

(i) মৌল বিপাকের হার

(ii) কাজের প্রকৃতি

(iii) দৈহিক বৃদ্ধি, গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদাত্রী মায়ের জন্য অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন।

(iv) শর্করা চাহিদা

(v) প্রোটিন চাহিদা

(v) স্নেহ পদার্থের চাহিদা

(vi) পুষ্টির অনুপাত

(vii) রান্না, পরিপাক ও বিশ্লেষণের জন্য।

জীবের পুষ্টির জন্য কার্বহাইড্রেট প্রোটিন, লিপিড, খনিজ পদার্থ, ভিটামিন এবং জল — এই ছয়টি পুষ্টি উপাদান অপরিহার্য। এদের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও লিপিড জারিত হয়ে তাপশক্তি বা ক্যালোরি উৎপন্ন করে; এদেরকে ক্যালোরি যুক্ত পুষ্টি উপাদান বা দেহ পরিপোষক পুষ্টি উপাদান বা প্রকৃতপক্ষে খাদ্য বলে। অন্যদিকে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল— এই তিনটি উপাদান পুষ্টির জন্য আবশ্যক হলেও এগুলি থেকে তাপশক্তি উৎপন্ন হয় না; এগুলিকে দেহ সংরক্ষক পুষ্টি উপাদান বলে।

যাহোক, এই সকল পুষ্টি উপাদানগুলি বিভিন্ন প্রকার জীবেরা মূলত ২টি উপায়ে সংশ্লেষণ অথবা সংগ্রহ করে থাকে; যথা—হলোফাইটিক পুষ্টির ক্ষেত্রে, সরল অজৈব উপাদান থেকে দেহকোশের উপযোগী জৈব যৌগ গঠন করে অথবা তরল পুষ্টি রসকে কোশের অংশীভূত করে আত্তীকরণের মাধ্যমে পুষ্টিগত উপাদান লাভ করে এবং হলোজয়িক পুষ্টির ক্ষেত্রে, কঠিন অথবা অর্ধতরল খাদ্য গৃহিত হবার পর তাকে পরিপাকের মাধ্যমে শোষণ উপযোগী সরল ও তরল পুষ্টি রসে পরিবর্তিত বা পরিণত করে নেবার মাধ্যমে পুষ্টি কার্য সমাধা হয়।

মূলত স্বভোজী উদ্ভিদে হলোফাইটিক পুষ্টি দেখা যায় এবং আমাদের অর্থাৎ মানব দেহে হলোজয়িক পুষ্টি দেখা যায়।

অর্থাৎ মানবদেহে খাদ্য গৃহীত হওয়ার পর পরিপাক প্রণালীর মাধ্যমে খাদ্য সরল ও তরল হয়। পরে পাচিত খাদ্য দেহকোশে শোষিত হয় এবং শোষিত খাদ্যের আত্তীকরণ বা কোশের অংশীভূতীকরণ ঘটে এবং অপাচ্য অংশের দেহের বাইরে মলরূপে বহিষ্করণ ঘটে। আর খাদ্যের এই আত্তীকরণের ফলেই জীবকোশে খাদ্যের মধ্যস্থ নিহিত শক্তির (সৌরশক্তি স্থৈতিক শক্তিরূপে আবদ্ধ) সঞ্চয় ঘটে। যার ফলে জীবদেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিই হল পুষ্টি যা সঠিক মাত্রায় সম্পন্ন হলে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়তা করে; পুষ্টির অভাবে স্বাস্থ্য গঠন ও স্বাস্থ্য রক্ষার কাজ ব্যহত হয়। তাই সুষম খাদ্য বা Balance diet গ্রহণ করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

৪.৮.১ পুষ্টির উপাদান ও পুষ্টিগত গুরুত্ব (Importance of Food and Nutrition)

পুষ্টি উপাদান, পুষ্টিগত গুরুত্ব ও তা কীসে লভ্য তা নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হলো—

FOOD COMPOSITION TABLE :

(বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে পুষ্টি-উপাদানের তালিকা)

(ভোজ্য অংশের প্রতি 100 গ্রাম ওজনে)

Source : Indian Council of Medical Research – 1990

খাদ্যের নাম তন্ডুল ও	জলীয় উপাদান (g)	প্রোটিন Nx6.25 (g)	ফ্যাট (g)	খনিজলবণ (g)	তন্তু (g)	কার্বোহাইড্রেট (g)	শক্তি (কিলোক্যালোরি)	ক্যালসিয়াম (g)	ফসফরাস (g)	লৌহ (g)
<u>দানা জাতীয়</u>										
বার্লি	১২.৫	১১.৫	১.৩	১.২	৩.৯	৬৯.৬	৩৩৬	২৬	২১৫	১.৬৭
ভূট্টা	১৪.৯	১১.১	৩.৬	১.৫	২.৭	৬৬.২	৩৪২	১০	৩৪৮	২.৩
গম	১২.৮	১১.৮	১.৫	১.৫	১.২	৭১.২	৩৪৬	৪১	৩০৬	৫.৩
গমের আটা	১২.২	১২.১	১.৭	২.৭	১.৯	৬৯.৪	৩৪১	৪৮	৩৫৫	৪.৯
ময়দা	১৩.৩	১১.০	০.৯	০.৬	০.৩	৭৩.৯	৩৪৮	২৩	১২১	২.৭
পাঁউরুটি (ব্রাউন)	৩৯.০	৮.৮	১.৪	--	১.২	৪৯.০	২৪৪	১৮	--	২.২
পাঁউরুটি (সাদা)	৩৯.০	৭.৮	০.৭	--	০.২	৫১.৯	২৪৫	১১	--	১.১
সিদ্ধচাল ঃ										
ঢেঁকি ছাঁটা	১২.৬	৮.৫	০.৬	০.৯	--	৭৭.৪	৩৪৯	১০	২৮০	২.৮
কলে ছাঁটা	১৩.৩	৬.৪	০.৪	০.৭	০.২	৭৯.০	৩৪৬	৯	১৪৩	১.০
আতপ চাল ঃ										
ঢেঁকি ছাঁটা	১৩.৩	৭.৫	১.০	০.৯	০.৬	৭৬.৭	৩৪৬	১০	১৯০	৩.২
কলে ছাঁটা	১৩.৭	৬.৮	০.৫	০.৬	০.২	৭৮.২	৩৪৫	১	১৬০	০.৭
ডাল ঃ										
ছোলার ডাল	৯.৯	২০.৮	৫.৬	২.৭	১.২	৫৯.৮	৩৭২	৫৬	৩৩১	৫.৩
(Bengal Gram)										
মুগডাল	১০.১	২৪.৫	১.২	৩.৫	০.৮	৫৯.৯	৩৪৮	৭৫	৪০৫	৩.৯
(Green Gram)										
মাসকলাই'র ডাল	১০.৯	২৪.০	১.৪	৩.২	০.৯	৫৯.৬	৩৪৭	১৫৪	৩৮৫	৩.৮
(Black Gram)										
মশুর ডাল	১২.২	২৫.১	০.৭	২.১	০.৭	৫৯.০	৩৪৩	৬৯	২৯৩	৭.৫৮
(Lentils)										
সয়াবীন	৮.১	৪৩.২	১৯.৫	৪.৬	৩.৭	২০.৯	৪৩২	২৪০	৬৯০	১০.৪
অড়হর ডাল	১৩.৪	২২.৩	১.৭	৩.৫	১.৫	৫৭.৬	৩৩৫	৭৩	৩০৪	২.৭
(Red Gram)										
খেসারির ডাল	১০.০	২৮.২	০.৬	২.৩	২.৩	৫৬.৬	৩৪৫	৯০	৩১৭	৬.৩
শাকসবজি										
বাধাঁকপি	৯১.৯	১.৮	০.১	০.৬	১.০	৪.৬	২৭	৩৯	৪৪	০.৮
ফুলকপি পাতা	৮০.০	৫.৯	১.৩	৩.২	২.০	৭.৬	৬৬	৬২৬	১০৭	৪০.০
ধনেপাতা	৮৬.৩	৩.৩	০.৬	২.৩	১.২	৬.৩	৪৪	১৮৪	৭১	১.৪২

লেটুস	৯৩.৪	২.১	০.৩	১.২	০.৫	২.৫	২১	৫০	২৮	২.৪
পালং শাক	৯২.১	২.০	০.৭	১.৭	০.৬	২.৯	২৬	৭৩	২১	১.১৪
বিট	৮৭.৭	১.৭	০.১	০.৮	০.৯	৮.৮	৪৩	১৮.৩	৫৫	১.১৯
গাজর	৮৬.০	০.৯	০.২	১.১	১.২	১০.৬	৪৮	৮০	৫৩০	১.০৩
পেঁয়াজ (বড়ো)	৮৬.৬	১.২	০.১	০.৪	০.৬	১১.১	৫০	৪৬.৯	৫০	০.৬
আলু	৭৪.৭	১.৬	০.১	০.৬	০.৪	২২.৬	৯৭	১০	৪০	০.৪৮
রাঙা আলু	৬৮.৫	১.২	০.৩	১.০	০.৮	২৮.২	১২০	৪৬	৫০	০.২১
টেপিওকা	৫৯.৪	০.৭	০.২	১.০	০.৬	৩৮.১	১৫৭	৫০	৪০	০.৯
শালগম	৯১.৬	০.৫	০.২	০.৬	০.৯	৬.২	২৯	৩০	৪০	০.৪
মাশরুম	৮৮.৫	৩.১	০.৮	১.৪	০.৪	৪.৩	৪৩	৬	১১০	১.৫
কুমড়ো শাক	৮১.৯	৪.৬	০.৮	২.৭	২.১	৭.৯	৫৭	৩৯২	১১২	—
অন্যান্য তরকারি										
বিন	৫৮.৩	৭.৪	১.০	১.৬	১.৯	২৯.৮	১৫৮	৫০	১৬০	২.৬
করলা	৯২.৪	১.৬	০.২	০.৮	০.৮	৪.২	২৫	২০	৭০	০.৬১
বেগুন	৯২.৭	১.৪	০.৩	০.৩	১.৩	৪.০	২৪	১৮	৪৭	০·৩৮
ফুলকপি	৯০·৮	২·৬	০·৪	১·০	১·২	৪·০	৩০	৩৩	৫৭	১·২৩
শশা	৯৬·৩	০·৪	০·১	০·৩	০·৪	২·৫	১৩	১০	২৫	০·৬
ক্যাপসিকাম	৯২·৪	১·৩	০·৩	০·৭	১·০	৪·৩	২৪	১০	৩০	০·৫৬৭
কাঁঠালবিচি	৬৪·৫	৬·৬	০·৪	১·২	১·৫	২৫·৮	১৩৩	৫০	৯৭	১·৫
ট্যাঁড়স	৮৯·৬	১·৯	০·২	০·৭	১·২	৬·৪	৩৫	৬৬	৫৬	০·৩৫
আম (কাঁচা)	৮৭·৫	০·৭	০·১	০·৪	১·২	১০·১	৪৪	১০	১৯	০·৩৩
পেঁপে (কাঁচা)	৯২·০	০·৭	০·২	০·৫	০·৯	৫·৭	২৭	২৮	৪০	০·৯
টম্যাটো (কাঁচা)	৯৩·১	১·৯	০·১	০·৬	০·৭	৩·৬	২৩	২০	৩৬	১·৮
পটোল	৯২·০	২·০	০·৩	০·৫	৩·০	২·২	২০	৩০	৪০	১·৭
মূলো (গোলাপী)	৯০·৪	০·৬	০·৩	০·৯	০·৬	৬·৮	৩২	৫০	২০	০·৩৭
বাদাম ও										
তৈলবীজ										
বাদাম	৫·২	২০·৮	৫৮·৯	২·৯	১·৭	১০·৫	৬৫৫	২৩০	৪৯০	৫·০৯
কাজুবাদাম	৫·৯	২১·২	৪৬·৯	২·৪	১·৩	২২·৩	৫৯৬	৫০	৪৫০	৫·৮১
নারকেল (ঝুনো)	৩৬·৩	৪·৫	৪১·৬	১·০	৩·৬	১৩·০	৪৪৪	১০	২৪০	১·৭
সরষেদানা	৮·৫	২০·২	৩৪·৭	৪·২	১·৮	২৩·৮	৫৪১	৪৯০	৭০০	৭·৯

সুষম খাদ্যের তালিকা : একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের খাদ্য তালিকায় ক্যালোরি অনুযায়ী নিম্নরূপ তিন প্রকার খাদ্য উপাদান থাকা প্রয়োজন; যেমন—

কার্বোহাইড্রেট — 415 g (415 × 4.0 K. Cal = 1660 K. Cal)

প্রোটিন — 100 g (100 × 4.1 K. Cal = 410 K. Cal)

ফ্যাট — 100 g (100 × 9.3 K. Cal = 930 K. Cal)

মোট 3000 K. Cal

নিম্নে একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্যের একটি তালিকা দেওয়া হলো—

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য

(i)	শস্য জাতীয় খাদ্য	400-500 g
(ii)	গুড় বা চিনি	50 g
(iii)	শাক সবজি	150 g

প্রোটিন জাতীয় খাদ্য

(i)	মাছ বা মাংস বা ডিম	85-100 g
(ii)	ডাল	75-85 g

ফ্যাট জাতীয় খাদ্য

(i)	তেল বা ঘি	50 g
(ii)	দুধ	500 g
(iii)	জল	2-3 lit
(iv)	একটি টাটকা ফল	

আবার প্রকৃতপক্ষে সুষম খাদ্য বলতে একটি পূর্ণাঙ্গ খাদ্য তালিকার কথা বলা হলেও সুষম আহার অবশ্য বিভিন্ন বয়সী ও বিভিন্ন কার্য সমাধানকারীদের (যেমন—ছাত্র, দৌড়বীর, শ্রমিক, গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদাত্রী মা, নারী ও পুরুষ প্রমুখ ভেদে) ক্ষেত্রে তাদের পুষ্টিগত উপাদানের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন হয়ে থাকে।

তাই খাদ্য তালিকা তৈরি করার পূর্বে ওই ব্যক্তির শক্তির চাহিদা পরিমাপ করা প্রয়োজন। আবার শক্তির পরিমাপ করতে গেলে বয়স, লিঙ্গ, দেহের ওজন, উচ্চতা, কাজের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক তথ্য থাকা প্রয়োজন। তাই ক্রীড়াবিদ, শিক্ষার্থী, গর্ভবতী মহিলা ভেদে সুষম খাদ্য তালিকা ভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিরামিষাশীদের ক্ষেত্রে মাছ, মাংস ও ডিমের পরিবর্তে ছোলা ও চিনেবাদাম 100-125 g এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মতো ১ থেকে ২.৫০ লিটার জল প্রত্যহ পান করা বাঞ্ছনীয়।

৪.৮.২ অপুষ্টি / বিভিন্ন পুষ্টিগত অভাব (Mal-Nutrition)

জীবের যথাযথ বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য সকলপ্রকার পরিপোষকই সঠিক মাত্রায় গ্রহণ করা উচিত। পরিপোষকের অনুপাতের মাত্রা সঠিক না হলে এবং কম পরিমাণে খাদ্যগ্রহণ করলে সাধারণত পুষ্টির অভাব হয়ে থাকে। অর্থাৎ ৬টি পরিপোষকের (প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, খনিজলবণ ও জল) যে কোনো একটির অথবা একাধিক উপাদানের অভাব থেকে পুষ্টির অভাবজনিত বিবিধ রোগ শরীরে দেখা দিতে পারে।

এই অভাবজনিত অবস্থা সাধারণত ২ ধরনের হয়ে থাকে। যথা—

(i) **অপুষ্টি :** আহার্যে এক বা একাধিক পরিপোষক অনুপস্থিত থাকলে জীবদেহে পুষ্টির অভাবজনিত অবস্থাকে অপুষ্টি বলে বা আন্ডার নিউট্রেশন বলে।

(ii) **উনপুষ্টি :** আহার্যে কোনো নির্দিষ্ট পরিপোষকের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে কম থাকলে মানবদেহে পুষ্টির অভাবজনিত যে রোগ হয় তাকে উনপুষ্টি বা ম্যালানিউট্রেশন বলে। উনপুষ্টি মূলত দুই প্রকার। যথা—

(i) **প্রাথমিক বা মুখ্য উনপুষ্টি :** আহার্যে এক বা একাধিক উপাদানের অভাবে যে উনপুষ্টি হয় তাকে বলে প্রধান উনপুষ্টি।

(ii) **গৌণ উনপুষ্টি :** আহার্যে কোনো উপাদানের অভাব ছাড়াই কোনো অসুস্থতার জন্য বা বিপাকগত ত্রুটির জন্য কোনো পুষ্টি উপাদানের যখন ঘাটতি পড়ে যায় তখন তাকে গৌণ উনপুষ্টি বলে।

উনপুষ্টিজনিত সমস্যা ও লক্ষণ : কোনো সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় উনপুষ্টিতে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের ওজন এবং উচ্চতা কম হয়। তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম হয়। উনপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পেটের রোগে ভোগে। এদের সহজেই ঠান্ডা লাগে। এরা শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণেও আক্রান্ত হয়।

নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যোপাদানের অভাবে সৃষ্ট উনপুষ্টিজনিত বা অপুষ্টিজনিত ব্যাধির উল্লেখ করা হলো—

খাদ্যোপাদানের নাম	**অভাবজনিত রোগ-ব্যাধি**
প্রোটিন	ম্যারাসমাস
প্রোটিন	কোয়াশিওরকর
ভিটামিন-A	রাতকানা
ভিটামিন -B	বেরিবেরি
ভিটামিন-B_1	গ্লসাইটিস
ভিটামিন-B_2	অ্যানিমিয়া
ভিটামিন-B_6	স্কার্ভি
ক্যালশিয়াম	রিকেট
লোহা	অ্যানিমিয়া
আয়োডিন	গলগণ্ড

প্রতিকারের ব্যবস্থা : শিশুর অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। আবার খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেও এই অপুষ্টিজনিত সমস্যা যথাযথ শারীরিক দক্ষতা অর্জনের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং অপুষ্টিজনিত সমস্যা প্রতিরোধে খেলোয়াড়দের খাদ্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি মেনে চলা প্রয়োজন—

(i) সম্পূর্ণ ভোজনের পর কখনই শ্রমসাধ্য কোনো কাজ বা ব্যায়াম করা উচিত নয়।

(ii) সাধারণত ব্যায়ামবীর বা খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে প্রত্যেকদিন প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের ক্ষেত্রে একগ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত।

(iii) যে কোনো শ্রমসাধ্য ব্যায়াম বা খেলা শুরুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে অধিকমাত্রায় কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করা ঠিক নয়। এতে কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে।

(iv) খেলোয়াড়দের নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এর ফলে স্বভাবতই তাদের ভিটামিন, প্রোটিন ও খনিজ ধাতুর চাহিদা পূরণ হবে। যদি নিয়মমাফিক সুষম খাদ্য ও টাটকা শাকসবজি গ্রহণ বজায় থাকে তাহলেও অপুষ্টির হাত থেকেও তারা রক্ষা পান।

৪.৯ সারসংক্ষেপ (Let us sum up)

এই পাঠ এককে আলোচনা করা হয়েছে :

স্বাস্থ্যের ধারণা ও গুরুত্ব, বাড়ন্ত শিশুর চাহিদা, স্বাস্থ্যবিধি, পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা, দেহের উচ্চতা ও ওজনের চার্ট প্রস্তুতি, টিকাকরণ, নিরাপদ পানীয় জল, বিদ্যালয় ঘরের আলো, বায়ুর ব্যবস্থা, শিশুর পুষ্টি, খাদ্যাভ্যাস, অপুষ্টি, প্রতিকার, স্থানীয় খাদ্যের ব্যবহার ইত্যাদি।

৪.১০ অনুশীলনী (Unit-End Excercise)

১। ২৫টি শব্দের মধ্যে লিখুন :

(ক) স্বাস্থ্যশিক্ষার ধারণা দিন।

(খ) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

(গ) পরিবেশ কিভাবে দূষিত হয়?

২। ২৫০ টি শব্দের মধ্যে লিখুন :

(ক) স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্যগুলির সম্পর্কে লিখুন।

(খ) পুষ্টি কাকে বলে? অপুষ্টি কাকে বলে? অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য আপনি কী কী ব্যবস্থা গ্রহন করবেন?

৩। (ক) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মত অনুযায়ী স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিন।

(খ) বাড়ন্ত শিশুদের সুস্বাস্থ্যের দুটি প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

(গ) ত্বকের কয়েকটি রোগের নাম লিখুন।

(ঘ) বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্মসূচীকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

(ঙ) BMI (Body Mass Index) এর সূত্রটি লিখুন।

(চ) কয়েকটি জন্মগত সমস্যা ঘটিত রোগের নাম লিখুন।

(ছ) পুষ্টি পরিকল্পনার জন্য কোন কোন নীতিগুলি গ্রহন করবেন?

(জ) কয়েকটি অপুষ্টিজনিত রোগের নাম লিখুন।

৪.১১ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন-এর উত্তর (Answer check your progress)

অগ্রগতি যাচাই করুন — ১

(ক) দাদ, চুলকানি, ব্রণ

(খ) দাঁতের নিয়মিত পরিচর্যার অভাব ও ভিটামিনের অভাব

(গ) আঞ্জনি, রাতকানা

অগ্রগতি যাচাই করুন — ২

(ক) তিনভাগে

(খ) নির্মল বাতাস, বিশুদ্ধ পানীয় জল, শব্দদূষণ নিরাপত্তা, খেলার মাঠ ও শরীরচর্চার উপযুক্ত ব্যবস্থা

(গ) Body Mass Index

পাঠ একক — ৫
শারীর শিক্ষা (Physical Education)

৫.১ সূচনা

৫.২ উদ্দেশ্য

৫.৩ শারীর শিক্ষার আধুনিক মত

৫.৩.১ শারীর শিক্ষার ভ্রান্ত ধারণা

৫.৩.২ ভারতের বিখ্যাত মনিষী স্বামী বিবেকানন্দের মত

৫.৪ শারীর শিক্ষার ধারণা

৫.৫ শারীরিক বৃদ্ধি ও স্নায়ু পেশীর সমন্বয়ের বিকাশ

৫.৬ শারীরিক সক্ষমতা

৫.৭ শিশুদের জন্য প্রথামুক্ত খেলাধূলা

৫.৭.১ বিনোদনমূলক খেলা

৫.৭.২ উল্টানো খেলা

৫.৭.৩ মেজর গেমস্— ফুটবল, ভলিবল, কবাডি, খো-খো

৫.৭.৪ লম্ফন ও নিক্ষেপ জাতীয় প্রতিযোগিতা

৫.৭.৫ দেশীয় খেলা সমূহ

৫.৮ নিদ্রা ও বিশ্রামের গুরুত্ব

৫.৯ দেহভঙ্গী

৫.১০ যোগশিক্ষা

৫.১১ সারসংক্ষেপ

৫.১২ অনুশীলনী

৫.১৩ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর

৫.১ সূচনা

শারীর শিক্ষা ও ক্রীড়াশৈলী (Skill) উভয়ই হলো সমাজ ও সংস্কৃতির ঘটনা প্রবাহ। উভয়দিকেই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে জড়িত এবং যার একদিকে যুক্ত শিখন প্রক্রিয়া (Learning), অন্যদিকে ক্রীড়া দক্ষতা (Performance) অতীত যুগেও শারীর শিক্ষার বহুল প্রচার ছিল। সভ্যতার বিবর্ত্তনের নিরিখে শারীর শিক্ষাও উন্নততর রূপ লাভ করেছে।

সাধারণভাবে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ক্রিয়াকলাপে (বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া বা ব্যায়াম) অংশগ্রহনের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে শারীর শিক্ষা বলা হয়। এজন্য নানা ধরনের মৌলিক শারীরিক ক্রিয়াকলাপ (Fundamental Movements) মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই মৌলিক ক্রিয়াকলাপগুলি একদিকে যেমন সহজাত প্রবণতা নির্ভর তেমনি এগুলির কার্য্যকারিতা দৈনন্দিন জীবনে অনস্বীকার্য্য। মৌলিক শারীরিক ক্রিয়াকলাপগুলি হলো দৌড়ানো, লাফানো, ছোঁড়া, ঝোলা এবং বেয়ে ওঠা বা চড়া। এই মৌলিক গুণগুলি মানুষ জন্ম থেকেই পেয়ে থাকে। জন্মের পর থেকেই যে সকল শিশু এই মৌলিক গুণগুলি রপ্ত করতে এবং পরিচালিত করতে পারে-তারা বিজয়ীর মর্যাদা পায় (Survival of the fittest)। অপরদিকে যারা এই গুণগুলি রপ্ত করতে এবং উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে না তারা বাঁচার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ে। এইসব মৌলিক ও গুণগত উপাদানগুলিকে শারীর শিক্ষার মৌলিক ক্রিয়াকলাপেব বিশেষ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এবং প্রতিটি মৌলিক ক্রীয়াকলাপই মানব শারীরের কোনো না কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন নির্ভর। অর্থাৎ শারীর শিক্ষার সঙ্গে মানবদেহের অঙ্গ সঞ্চালন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই সমস্ত মৌলিক অঙ্গ-সঞ্চালন/ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়েই ঘটে মানুষের আত্মবিকাশ, আত্ম-সংরক্ষণ ও উন্নত আত্ম-বিশ্বাসের সত্ত্বার। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে এই গুণগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী জীবনীশক্তি যুগিয়েছে-মানব উন্নয়নে ও বিকাশে। এটা মানুষের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারা।

শারীরশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র আমাদের দেশেই নয়-প্রত্যেকটি উন্নতিকামী দেশই শরীর শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার অন্যতম বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং সর্বাঙ্গীন শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছে। শারীর শিক্ষার মাধ্যমেই অনায়াসে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ব্যক্তি সত্ত্বার বিকাশ ও চরিত্র গঠনের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান , গণিত চর্চার এইগুণগুলির সুষম বিকাশ সম্ভব নয়। এর জন্য শারীর শিক্ষার নিয়মিত চর্চা ও অনুশীলন প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষায় শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। কারণ, শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের পাশাপাশি তার মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে শারীরশিক্ষা প্রাথমিক দিক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শিশু মনের বিকাশ নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস, পিতা-মাতার আচার আচরণ, সমবয়সীদের আচরণ-যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক শারীরশিক্ষার পাঠ্যসূচীর অর্ন্তভুক্ত যাহা মূলত: মনোবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। আবার প্রাথমিক শিক্ষায় শারীর শিক্ষার উপযোগী ভূমিকাকে আরো বেশী করে আলোকিত করেছে শারীরবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমে। কারণ, শারীরবিদ্যার একটি বিখ্যাত তত্ত্ব: মাংসপেশীর বিকাশ কেবলমাত্র সম্ভব সুষম খাদ্য, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিশ্রাম ও ব্যায়ামের মাধ্যমে। সুষম বিন্যাসের প্রাথমিক তিনটি উপাদান যথাযথভাবে উপস্থিত থাকলেও শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতিতে মাংসপেশীর মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন এখানে শিশুর বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকলাপে উপযুক্ত অংশগ্রহণের মাধ্যম। সেইকারণে, শিশু/শৈশব অবস্থায় শারীরিক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্তির প্রয়োজন আছে।

এই পাঠ্যএককের পরবর্তী অংশে শারীরশিক্ষার বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করবো।

৫.২ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থী-শিক্ষক যে বিষয়গুলি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করবেন এবং অপরকে বোঝাতে বা শেখাতে সক্ষম হবেন—

- প্রথামুক্ত বিনোদনমূলক খেলাধূলো সম্পর্কে জানবে।
- মেজর গেমস অর্থাৎ ফুটবল, ভলিবল, কাবাডি ও খো-খো সম্পর্কে জানবে।

- বিভিন্ন ধরনের লম্ফন ও নিক্ষেপজাতীয় খেলার সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে।
- যোগশিক্ষা সম্পর্কে জানবে।

৫.৩ শারীর শিক্ষার আধুনিক মত

শারীর শিক্ষার আধুনিক মতবাদ হল শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিক্ষা। প্রাথমিকভাবে শারীর শিক্ষা বলতে বোঝানো হতো শরীর শিক্ষা (Education of the Physique)। পরবর্তী সময়ে সেই তত্ত্বের পরিবর্তন হয়। বলা হতে থাকে শারীরের জন্য শিক্ষা (Education for the Physique)। পরবর্তীকালে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের নিরীখে শারীরিক শিক্ষার ধারণার মধ্যেও পরিবর্তন আসে। সামনে আসে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ও নীতি নির্ভর তত্ত্ব: শারীরের মাধ্যমে শিক্ষা (Education through the Physique)। যার মাধ্যম হিসাবে আমরা পাই বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকলাপের অংশগ্রহণ সম্বন্ধীয় তত্ত্বটি।

আমরা অনেকেই আজও শারীর শিক্ষা বলতে শুধু ক্রীড়াচর্চা বা বিভিন্ন ক্রীড়ার ক্রীড়াশৈলীর প্রকাশকেই ধরে নিই। কিন্তু এই ধারণাটি একেবারেই ঠিক নয়। অবশ্য যে কোন ধরনের ক্রীড়া শারীর শিক্ষার ক্রিয়াকলাপের একটি অংশ। শারীর শিক্ষার একটি অংশ । শারীর শিক্ষার একটি অংশ যেমন ক্রীড়া তেমনি অন্য অংশগুলি হল মার্চিং, খালি হাতে সৌন্দর্য্যমূলক ব্যায়াম (Callisthemics), ভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম নিয়ে ব্যায়াম (Apparatus Drill), যোগাসন (Yoga), ক্যাম্পিং (Camping), ইত্যাদি । আবার ক্রীড়ায় অংশগ্রহনকেই শুধুমাত্র শিক্ষা বলা যায় না। কারণ যেকোন ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজন হয়; দৌড়ানো, লাফানো, ঝাঁপানো, ছোঁড়া ইত্যাদি মৌলিক শারীরিক কার্য্যকলাপ। সেই সকল মৌলিক ক্রিয়াকলাপের চর্চার মধ্যে দিয়েই ক্রীড়াকলাপ প্রদর্শনের ভিত্তি তৈরি হয়। সুতরাং ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনে পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে শারীর শিক্ষার চর্চা একান্ত প্রয়োজন ও শারীর শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ সহজাত শারীর বিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগ করতে পারে কারণ, শারীর বিদ্যার একটি মৌলিক শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চর্চা ও অভ্যাস করতে পারে। যেগুলির বিজ্ঞান সম্মত নীতি নির্ভর পরিকল্পনা ও প্রয়োগ মানুষের জীবনে আনতে পারে জীবনভিত্তিক সর্বাঙ্গীন বিকাশের ধারা।

সুতরাং শারীর শিক্ষার আধুনিক মত অনুসারে একথা বলা যেতে পারে যে মানুষ তার দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের অংশ গ্রহনের মাধ্যমে তার জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে বিশেষ ধরনের শিক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে।

৫.৩.১ শরীর শিক্ষার ভ্রান্ত ধারণা (Misconcepts about Physical Education)

শারীরিক প্রশিক্ষণঃ- (Physical Training) অনেকে শারীর শিক্ষাকে শারীরিক হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যার অর্থ কোন ব্যক্তির শরীরের প্রশিক্ষন -যার মাধ্যমে, শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যকর শরীর গড়ে তোলা যায়। এই প্রকার একটি কার্য্য প্রণালী সাধারণত: সেনাবাহিনী, পুলিশ ও অন্যান্য সামরিক বাহিনীর সদস্যদের রপ্ত করতে হয়।

দেহ সৌষ্ঠব/ শরীর চর্চা ঃ- উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় অবধি এই ধারণা প্রচলিত ছিল। ভারোত্তলনের মাধ্যমে দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী হওয়া। ইহা ছাড়াও Drill, Sports (ক্রীড়া) অ্যাথলেটিক্স ও Gymnastics ইত্যাদি বিষয়গুলিকে ভ্রান্তধারণার মধ্যে আনা যায়।

৫.৩.২ ভারতের বিখ্যাত মনিষী স্বামী বিবেকানন্দের মত : (Education is the manifatation of perfection already in man)

মহাত্মা গান্ধীর মতে: মনুষ্য জাতির, আত্মা ও মনের সর্বাঙ্গীন বিকাশই হলো শিক্ষা।

মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই কোন কোন শিক্ষায় ফল লাভ করিয়াছে। এক্ষেত্রে মানুষের একটি গুনগত সুবিধা হইলো উন্নততর মস্তিষ্কের সংযোজন। যাহা মানুষের সকল বুদ্ধি বৃত্তির রূপকার।

অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার লক্ষ্য হলো মানুষের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানো এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে সামাজিক জীব হিসাবে

গড়ে তুলে সুনাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এক কথায় তার ব্যবহারিক গুণগুলির মধ্যে সেই পরিবর্তন আনা যা তাকে পরিস্থিতির সাপেক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

অপরদিকে শারীরশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার একটি অঙ্গ। সুতরাং সাধারন শিক্ষা ও শারীর শিক্ষার লক্ষ্য ও একই। যেহেতু শারীর শিক্ষা হলো সাধারণ শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ-তাই শারীর শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সফল করতে সর্বাঙ্গীনভাবে সাহায্য করে।

শারীর শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক দিকগুলির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। একজন ছাত্র যেমন তার কোন বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ব্যবহারিক দিকের সামঞ্জস্যবিধানের লক্ষ্যে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক বিদ্যাকে অর্জন করে তেমনি শারীরশিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে তৈরি করে বা গড়ে তোলে: শৃঙ্খলাবোধ, আত্মবিশ্বাস, সামাজিকতার বৈশিষ্ট্য, সততা, নিয়মানুবর্তীতা দলীয় সংহতি ও সহযোগিতার গুণগুলিকে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়। সারাদিনের গবেষণার শেষে প্রতিদিন বিকালে তাদের ১-২ ঘন্টা সাতাঁর বা যেকোন ধরনের খেলাধুলোয় অংশগ্রহণে আবশ্যিক ছিলো। বলা যেতে পারে-ছাত্রদের মধ্যে শরীর শিক্ষার জ্ঞান সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রমে পূর্ণতা আনে।

আমাদের দেশে অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন যে-শারীর শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা একসঙ্গে পাশাপাশি চলতে পারে না, কোন অজ্ঞাত কারণে-সাধারণ শিক্ষা ও শারীর শিক্ষার মধ্যে একটি প্রাচীর তুলে দেওয়া হচ্ছে-তা আমাদের জানা নেই। তাঁরা মনে করেন শারীর শিক্ষায় অংশগ্রহন মানে সময়ের অপচয় এবং ইহা অবসরের সাথী। আবার অনেকে মনে করেন যারা শারীর শিক্ষায় অংশগ্রহণ কবেন তারা সকলেই অলিম্পিক বা সমতুল্য কোন প্রতিযোগীতামূলক অংশ গ্রহণ করে খেলার পুরস্কার লাভ করবেন এই চিন্তা ও ঠিক নয়।

ইতিহাসের পাতা উল্টোলেই আমরা দেখতে পাবো-খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিখ্যাত দার্শনিক গনিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক পিথাগোরাস প্রাচীন অলিম্পিক গেমসে কয়েকজন অংশগ্রহণ করেছেন ও বিজয়ীর সম্মান ও লাভ করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার বিখ্যাত শরীর বিদ্যার বিজ্ঞানী প্যাভলব-যিনি পরিপাক বিদ্যার গবেষণার জন্য ১৯০৪ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনিও সে দেশের একজন প্রখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৫৪ সারা পৃথিবীকে মাত্র ৪ মিনিটে ১ মাইল দৌড়ে যিনি নতুন বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন-তিনি ছিলেন লন্ডনের নামকরা স্নায়ুবিদ্যার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার - রজার ব্যানিস্টার। ঐ বিখ্যাত দৌড়ের ছয় মাস পরেই তিনি কৃতিত্বের সাথে ডাক্তারী পাশ করে এবং লন্ডনের একটি বিখ্যাত হাসপাতালে হাউস সার্জন রূপে যোগ দেন। ইহা ছাড়াও আরো অনেকে উদাহরণ আছে যাহা এখনও বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সুতরাং সাধারণ শিক্ষা ও শারীর শিক্ষার মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর তৈরির চেষ্টা আমাদের দেশে হয়েছে এবং যাহা এখন বহমান তাহা কিছু শিক্ষাবিদের মস্তিষ্ক প্রসূত বলেই মনে হয়।

এক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট Botanist এর সহিত আমার আলাপ চারিতার কিছু তত্ত্ব আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই বিশিষ্ট অধ্যাপক ১৯৬৮ সালে মিচিগ্যান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলেন গবেষণার কাজে এবং কয়েক বছর সেখানে ছিলেন। সারাদিনের গবেষণার শেষে প্রতিদিন বিকালে তাদের ১-২ ঘন্টা সাঁতার বা যে কোন ধরনের খেলাধুলায় অংশগ্রহন করতে হত সুতরাং বিদেশে খেলাধূলায় অংশগ্রহণ অপরিহার্য্য তাহা প্রমানের উল্লেখ রাখে না।

অর্থাৎ শারীর শিক্ষা হলো সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে যার নিজস্ব লক্ষ্য হলো সঠিক নির্বাচিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষাভিক ও সমাজের গুণাবলীর বিকাশ মানুষকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।

৫.৪ শারীর শিক্ষার ধারনা

শারীর শিক্ষার আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত সংজ্ঞা হলো:- শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিক্ষা (Education through Physical activity) । বিখ্যাত শারীর শিক্ষাবিদ জে.এফ.উইলিয়ামসের মতে ''শারীর শিক্ষা হল মানুষের সেইসব যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়াকলাপের যোগফল যেগুলি নির্বাচিত হয় পদ্ধতি হিসাবে এবং পরিচালিত হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে।' অর্থাৎ শারীর শিক্ষার সেইসব শারীরিক ক্রিয়াকলাপকে নির্বাচিত করা যায় যাতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তির শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, আত্মবিশ্বাস ও সহযোগিতার মনোভাব ইত্যাদি ব্যক্তি সত্ত্বার গুণগুলির বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ লাভ সম্ভবপর হয়।

বিশিষ্ট শারীর শিক্ষাবিদ চার্লস এ বিউকার (Charles A. Bucher) এর মতে - শারীর শিক্ষা হলো শিক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ অর্থাৎ শারীরশিক্ষাকে কখনই শিক্ষার থেকে আলাদা করা যায় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য লাভ করতে হলে শারীর শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন।

তিনি শারীর শিক্ষার সংজ্ঞা হিসাবে আনেন:- শারীর শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার সেই প্রক্রিয়া যার নিজস্ব লক্ষ্য হলো নির্বাচিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মানুষের দক্ষতার উন্নতি ঘটানো। (Physical Education is an educational process that has its aim the improvement of human Performance through the medium of physical activties selected to realize this outcome.

শারীর শিক্ষার লক্ষ্য :

শারীর শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানো অর্থাৎ শারীর শিক্ষার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে মানুষের সম্পূর্ন ব্যক্তিত্বের - শারীরিক, মানসিক, সামাজিক গুণগুলির বিকাশ ঘটানো। তার জন্য এমন সঠিক দক্ষ নেতৃত্ব দিতে হবে ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে সংগঠিত করতে হবে যাতে ব্যক্তি বা দল সেগুলিতে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে তৃপ্তি ও আনন্দ পায় এবং সেই সঙ্গে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক গুণগুলির বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায়।

শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্য :

শারীর শিক্ষার উদ্দেশ্য হল—

(১) সুস্বাস্থ্য লাভ

(২) সুঅভ্যাস গঠন

(৩) শারীরিক পটুতা অর্জন

(৪) স্নায়ু ও মাংসপেশীর সমন্বয় সাধন

(৫) ব্যক্তিত্বের বিকাশ

(৬) জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা

(৭) সামাজিকতার বিকাশ

শারীরশিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞানের সম্পর্ক :

এই শতাব্দীর শুরু থেকে প্রায় খেলাধুলোর ক্ষেত্রে যতটুকু উন্নতি হয়েছে, তুলনামূলকভাবে ১৯৬৮ সালের পরবর্তী চল্লিশ বছরে ক্রীড়ার ব্যাপক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এর কারণ শরীর শিক্ষার একটি দিক হিসাবে খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বহুল প্রসার ও প্রচলন। বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শাখা থেকে প্রয়োজনীয় সূত্র ও নীতি খেলাধূলার মান ও পরিকাঠামো উন্নয়নে যুক্ত হয়ে এর পরিধি এত ব্যাপক হারে সংগঠিত হয়েছে যার ফলে ক্রীড়াবিজ্ঞান নিজেই একটি পঠন-পাঠনের বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রীড়া চিকিৎসার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যসূচী।

একজন মানুষকে 'খেলোয়াড় মানুষে' রূপান্তরের পদ্ধতি ও পরিকল্পনা সম্পূর্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক হয়ে উঠেছে। তেমনি খেলোয়াড় ও তার পরিবেশ, খেলোয়াড় যখন অসুস্থ ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন চিকিৎসা ও পূর্ণবাসনের মাধ্যমে হিসাবে ক্রীড়া চিকিৎসা (Sports Medicine) এর ব্যবহার ক্রীড়া বিজ্ঞান ও ক্রীড়া চিকিৎসার নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করেছে।

প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের যে সমস্ত শাখাগুলি ক্রীড়াবিজ্ঞান ও ক্রীড়া চিকিৎসায় ওতোপ্রতো ভাবে যুক্ত তা হলো -

ফলিত অঙ্গ-সংস্থান বিদ্যা, শারীর বিদ্যা, মনোবিদ্যা, জীব-বলবিদ্যা, জীব-রসায়ন বিদ্যা, পুষ্টি, ও পথ্য ব্যবস্থা বিদ্যা, অস্থিবিদ্যা, ভৌত চিকিৎসা বিদ্যা ও ভেষজ বিদ্যা।

শারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য:

শারীর শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় স্বাস্থ্য। কারণ যেকোন দেশের আর্থিক উন্নতি, সমৃদ্ধি ও বিকাশ নির্ভর করে সেই দেশের নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের উপর। দেশের স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় জনগনের স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য গড়ে তোলার বিষয়গুলি হলো নিয়মিত সুষম খাদ্য, বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে প্রয়োজন নিয়মিত শারীর শিক্ষার চর্চা। ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ একদা বলেছিলেন ঃ আমরা হাসপাতাল চাই না-আমরা চাই খেলার মাঠ ও পরিবেশ। অর্থাৎ মানুষ তার স্বাস্থ্যকে কিনতে চায় না- মানুষ চায় তার স্বাস্থ্য তৈরি করতে। স্বাস্থ্য তৈরির মাধ্যম হিসাবে শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৫.৫ শারীরিক বৃদ্ধি ও স্নায়ু পেশীর সমন্বয়ের বিকাশ

বৃদ্ধি ও বিকাশ শব্দ দুটি সাধারণত: একে অপরের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয় থাকে কিন্তু বাস্তবে একটি অপরের থেকে আলাদা। সাধারনভাবে, 'বৃদ্ধি' বলতে বোঝায় জৈব প্রক্রিয়ার বৃদ্ধি যার দ্বারা জীবের আয়ত্তগত, ওজনগত ও পরিমানগত পরিবর্তন নির্দেশিত হয়।

অপরদিকে 'বিকাশ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে গুণগত পরিবর্তনের একক হিসাবে এবং বিকাশ মূলত: প্রকাশ পেয়ে থাকে শিশুর পূর্ণতা প্রাপ্তির অগ্রগমনের মাধ্যমে। এটি একটি গুণগত পরিবর্তনের পদ্ধতি যাহা বহন করে শিশুর পূর্ণতা (Maturity) এবং কার্য্যকারিতার বৃদ্ধির (Functional improvement) উপাদান-যেটি ধারাবাহিক, গতিশীল ও স্বাভাবিক ভাবে যা খালি চোখে ধরা পড়ে না।

শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বংশগতি ও পরিবেশ (Heridity & Environment)। বৃদ্ধির যেকোন স্তরে বা পর্যায়ে শিশুকে একটি যৌথ উপাদান হিসাবে ধরে রাখা হয়ে থাকে। এবং যে কোন মাত্রার বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জন্মগত অবস্থান ও পরিবেশের বিভিন্ন বিষয় প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

সুতরাং বিকাশ কেবলমাত্র শিশুর আকার আকৃতির বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবর্তে ইহার মধ্যে নিহিত থাকে শিশুর পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে একগুচ্ছ ধারাবাহিক ব্যবহারিক পরিবর্তনের ধারা। বিকাশের ফলে শিশুর মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা প্রকাশ পায়।

শিশুর মনস্তত্ত্ব :

শিশুকে সহজে জানতে ও তার সঙ্গে উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে মনোস্তত্ত্ববিদেরা বিকাশ পর্যায়কে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) শৈশব (Infancy) - শিশুর জন্মলগ্ন থেকে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত সময়কাল।

(২) বাল্যকাল (Childhood) - শিশুর ৫ বৎসর বয়স থেকে ১১ বা ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত সময়কাল।

(৩) কৈশোর বা বয়সন্ধিকাল - ১২ বৎসর বয়স থেকে ১৪ বা ১৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত সময়কাল।

(৪) প্রাপ্তবয়স্ক (Adult hood) - ১৮ বৎসর বয়স ও তার উর্দ্ধে।

আমরা আলোচনার সুবিধার্থে বাল্যকালকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হল।

(১) বাল্যকাল (প্রারম্ভিক) - Early chldhood [3 to 6/7 years]

(২) বাল্যকাল (মধ্যবর্তী) - Middle chldhood [6 or 7 to 8 years]

(৩) বাল্যকাল (অন্তিম পর্যায়) - Later chldhood [8 to 11/12 years]

শৈশব কালে শারীরিক বৃদ্ধি ও স্নায়ুপেশীর সমন্বয়ের বিকাশ :

শৈশব হলো বৃদ্ধি ও বিকাশের দ্রুত পর্যায়/অধ্যায়। এই সময় শিশুর আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক বিভিন্ন অঙ্গের দ্রুত উন্নতি/বৃদ্ধি হয়। এই বৃদ্ধি শিশুর উচ্চতা, ওজন ও আকৃতি সমন্বীয়। তাছাড়া এই সময়কালে শিশুর মধ্যে বিকাশ হয় এবং শিশুর মধ্যে এই সময়কালে সকল রস প্রয়োজনের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় শিশু সম্পূর্ণভাবে তার বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়ের জন্য প্রয়োজনে পিতামাতার সাহায্য নিয়ে থাকে। তার আচার আচরণ সম্পূর্ণভাবে (Emotion) হয় হয়ে পরিচালিত হয়। শিশুর শারীরিকভাবে যদিও বিকাশ না হয় তাহলে বিকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অপরের উপর নির্ভরশীলতার দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য।

শারীরিক বিকাশ শুরু সাধারণ থেকে বিশেষ দক্ষতার স্তরে। যেমন একজন খেলোয়াড় কোন খেলায় পারদর্শিতা অর্জন করতে চাইলে তাকে প্রথমে সেই বিশেষ খেলার সাধারণ দিকগুলি রপ্ত করতে হয় এবং পরে সেই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সে বিশেষ কৌশলগুলি রপ্ত করতে পারে।

আবার বিকাশ নির্ভর করে বংশগত ও পরিবেশের বুনিয়াদের উপর। অতএব শারীরিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বংশগতি ও পরিবেশ। শরীর শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন খেলোয়াড় শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশ সূচিত হয় তার বংশগতি ও পরিবেশ অনুযায়ী।

সাধারণত: বাল্যকালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে (Middle childhood) শারীরিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনামূলক ভাবে একটু আলাদা প্রকৃতির হয়ে থাকে।

বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম যা বৃদ্ধি ধীর গতিতে হয়। এই পর্যায়ে কন্যা সন্তান শারীরিক বিকাশের গুণগত বিচারে পুত্র সন্তানদের তুলনায় এগিয়ে থাকে।

শিশুদের মধ্যে সার্বিকভাবে স্নায়ুপেশীর সমন্বয়/নিয়ন্ত্রন পরিলক্ষিত হয় যদিও ছোট পেশীগুলির বিকাশ যথাযথভাবে হয় না। আবার সংবেদনশীল স্নায়ু পেশীর উপকরণগুলি পড়াশুনার উপযুক্ত হয়ে ওঠে না। চোখ ও হাতের সমন্বয় সমৃদ্ধ হয় যদি তা যথোপযুক্ত নয়। স্বাভাবিক প্রবণতায় দূরদর্শিতা প্রকাশ পেতে থাকে।

কিন্তু জনসংযোগের ব্যাপ্তি অবলম্বনের জন্য স্থায়ী হলেও ইহা বাড়তে থাকে। কর্মতৎপরতা বেশি থাকে যদিও তা বেশিক্ষণ চালাতে পারে না। হৃৎপিন্ডের বৃদ্ধি দ্রুত গতিতে হতে থাকে। সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন ভালো হয়। কিন্তু কোন বিষয়ে আগ্রহ বেশিক্ষন স্থায়ী হয় না। দলবদ্ধ ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহন করতে ভালোবাসে।

৭-৮ বছর বয়সে কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের মধ্যে আগ্রহের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভরপুর প্রানশক্তি সঞ্চারিত হয় কিন্তু সহজেই ক্লান্তি আসে।

বাল্যকালের শেষ পর্যায় বা কৈশোরের পূর্বাবস্থায় :

দৈহিক বিকাশের হার তুলনামূলকভাবে কম থাকে। শারীরিক সুস্থিতি অর্জন করতে সমর্থ হয়। দু:সাহসী রোমাঞ্চকর কর্মসূচীর প্রতি ভালোবাসা বাড়তে থাকে। এবং সবসময় শারীরিক ক্রিয়াকলাপে নিহীত থাকে। ধারাবাহিকভাবে উচ্চতা ও ওজন বাড়তে থাকে। হাড়ের পরিণত অবস্থা তৈরি হতে থাকে। যদিও শৈশবের প্রাথমিক অবস্থার স্নায়ুপেশীর সমন্বয়ক্রম থাকে তথাপি ব্যক্তির স্নায়ুপেশীর সমন্বয় সংক্রান্ত ক্রীড়াশৈলীর উন্নতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়।

সাধারণভাবে এই পর্যায়কে অবসরের অবস্থা বলা হয়ে থাকে। কারণ, ইহার পরবর্তী অবস্থায় বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে হতে থাকে। বিশেষত: উচ্চতা ও ওজনের নিরীখে। কোন কোন সময় এই বৃদ্ধি শুরু হয় ৯-১৩ বছর বয়সের মধ্যেই। কন্যা সন্তানের বৃদ্ধির তুলনায় পুত্র সন্তানদের বৃদ্ধি শুরু হয় তুলনামূলক ভাবে দেরীতে।

শারীরিক বিকাশ :

শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রথম অবস্থায় সে পিতামাতার উপর সঠিকভাবে নির্ভরশীল বিভিন্ন প্রয়োজনে। তার আচার আচরণ পরিচালিত হয় সম্পূর্ণভাবে তার জৈব প্রবৃত্তির উপর। যে শিশু শারীরিক দিক থেকে বিকশিত হয় না সে সার্বিকভাবে তার বিভিন্ন প্রয়োজনে অপরের উপর নির্ভরশীল।

এই পর্যায়ে শারীরিক বিকাশের গতি অতি দ্রুত। জন্মের পরবর্তী সময় থেকে তার ওজন বাড়তে থাকে তার প্রাথমিক ওজনের তিনগুন হারে এই সময়।

জন্মাবস্থায় শিশুর হাড়ের গঠন খুব নরম ও শিথিল। তাদের বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করে ফসফরাস, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ যেগুলি তারা সংগ্রহ করে তাদের খাদ্য-খাবারে। মাত্র ১ বৎসর বয়সে একজন শিশু তার হাত ও পায়ের আকার প্রায় দ্বিগুন করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ও খুব দ্রুত হয়। জন্মের সময় মস্তিষ্কের যে ওজন থাকে মাত্র দু বছরে দ্বিগুন বা তার বেশী হয় এবং মাত্র ছয় বছর বয়সে তার মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ হয়।

২ থেকে ৩ বছরের শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা তার অঙ্গ-সঞ্চালনের মধ্যে নিয়ন্ত্রনের দিকটির উপর। যদিও স্নায়ু পেশীর সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল ক্রীড়াশৈলীর বিকাশ অসমভাবে গড়ে ওঠে কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে বিকশিত হয় বৃহৎ পেশী সমূহের সমন্বয়ের কিন্তু ক্ষুদ্রপেশীর এবং চোখ ও হাতের সমন্বয়ের বিকাশ খুব একটা ভালোভাবে দেখা যায় না। শিশুর তিন বৎসর বয়সের মধ্যে অস্থায়ী দাঁতের সম্পূর্ণ কয়টি দেখতে পাওয়া যায়। এই বয়সে বালক ও বালিকার মধ্যে শরীরের গঠনগত কোন লক্ষনীয় পার্থক্য দেখা যায় না। ধীরে ধীরে তারা দক্ষতা অর্জন করে নিজে খাবার খেতে ও নিজের পোষাক পরার অভ্যাস তৈরি হয়। তার দ্রুত ভাষার বিকাশ হতে থাকে। বাথরুম ব্যবহারের অভ্যাস তার মধ্যে তৈরি হয়। শিশুদের মধ্যে ঘুমানোর সময়ে পরিবর্তন আসে। প্রতিনিয়ত সক্রিয় থাকে। যার ফলে শিশুদের মধ্যে ক্লান্তির ছাপ প্রায়শই দেখা যায়।

কন্যাসন্তান তুলনামূলকভাবে পুত্র বা বালকদের চেয়ে বেশী উচ্চতা ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রজনন যন্ত্রগুলি পরিণত হতে শুরু করে। আবার প্রজনন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি জড়িত নয় এমন যৌন লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য গুলি বিকশিত হয়।

দ্রুত পেশীর বৃদ্ধি হতে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংশের অসম বিকাশ বিশেষভাবে দেখা যায় এবং খেয়ালখুশি মতো আহার করে থাকে।

বুদ্ধি ও বিকাশের জন্য নির্দেশাবলী :

শৈশবের প্রাথমিক অবস্থায় প্রয়োজন শিশুর প্রতি পিতামাতার স্নেহ ও ভালোবাসা। বিশেষভাবে প্রয়োজন বিস্তৃত কর্মতৎপরতার সুযোগ। শিশুদের বিচরনের ক্ষেত্রে সীমিত স্বাধীনতা দেওয়া উচিত এবং এই পর্যায়ের শেষে তাকে তার নির্দিষ্ট পরিবেশ থেকে বাইরে আনতে হবে।

২.৫ থেকে ৫ বৎসর বয়সী শিশুদের প্রয়োজন ভালো পথপ্রদর্শকের। যার মাধ্যমে সে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। শিশুদের যথেষ্ট পরিমাণ কর্মতৎপরতার সুযোগ দেওয়া উচিত। ৫ বৎসর বয়সী শিশুদের বৃহৎ পেশীর ব্যবহারে প্রয়োজনীয় উপকরনের দরকার।

৬-৯ বৎসর বয়সী শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন উৎসাহের। বিভিন্নভাবে কর্মতৎপরতার সুযোগ থাকা দরকার, বিশেষত: বৃহৎ পেশীর ব্যবহারের জন্য। ন্যূনতম হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শিশুদের তদারকি করতে হবে। গ্রহণযোগ্য আকার ব্যবহার ও অভ্যাস অর্জনে সাহায্য করতে হবে।

বুদ্ধি ও বিকাশে প্রয়োজনীয় শরীর শিক্ষার কার্যকলাপ :

শিশুর জন্ম থেকে ৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত উপযোগী শরীর শিক্ষার কার্যকলাপ।

(ক) শিশু জন্ম থেকেই সক্রিয় এবং খেলা তার জীবনের অঙ্গ। সুতরাং সঠিক খেলাধূলার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

(খ) শিশু যখন দোলনায় সময় অতিবাহিত করে তখন সে তার প্রয়োজনীয় অঙ্গ সঞ্চালন করে থাকে হাত ও পায়ের নড়াচড়ার মাধ্যমে।

(গ) শিশু যখন বড় হতে থাকে তখন সে কখনই অলসভাবে থাকতে চায় না। সে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। সুতরাং কিছু সহজ সরল ব্যায়াম যেমন দৌড়ানো, লাফানো, ঝাঁপানো ইত্যাদি কর্মসূচী খুবই উপযোগী।

(ঘ) এই বয়সে শিশুরা খেলনা সামগ্রী খুব ভালোবাসে। সুতরাং খেলনা সামগ্রী খেলাধূলার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ঙ) শিশুরা এই বয়সে আত্মকেন্দ্রিক ও একাকী খেলাধূলা করতে ভালবাসে। সুতরাং এই অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য কিছু সাধারণ দলবদ্ধ খেলার প্রচলন করা উচিত যাতে তার মধ্যে সামাজিক গুণগুলির বিকাশ ঘটতে পারে এবং তার মধ্যে একাকীত্বের প্রবণতা দূর হয়।

সাধারণত ৫ বৎসর বয়সে শিশুরা প্রথাগত শিক্ষার আঙ্গিনায় আসে। সেই কারণে শরীর শিক্ষার শিক্ষক শিশুর বুনিয়াদ তৈরির লক্ষ্যে উপযুক্ত শরীর শিক্ষার কর্মসূচী তুলে ধরতে সুস্থ পরিবেশ প্রদান করে।

সুস্থ স্কুলের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে ৫-১১ বৎসর বয়সী শিশুদের পারিবারিক বৃদ্ধি ও বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পিত উপযোগী কার্য্যকলাপের প্রয়োজন।

(ক) সাধারণত: শিশুরা প্রথাগত শিক্ষায় আসার পূর্বে প্রাক-বিদ্যালয়ের প্রধানত: মৌলিক অঙ্গ সঞ্চালনের উপর নিয়ন্ত্রন অর্জন করতে শেখে। সুতরাং তার মধ্যে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের অভি জ্ঞতা থাকে।

(খ) দীর্ঘক্ষন সময়ের পরিশ্রম সাধ্য শারীরিক ক্রিয়াকলাপ এই বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে কাম্য নয়। যদিও সে অত্যাধিক সক্রিয় এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের প্রবল ইচ্ছা থাকে তথাপি সে ঘনঘন বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করে।

(গ) শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক ক্রিয়াকলাপের বৈচিত্র্য থাকা দরকার।

(ঘ) ছন্দোময় ক্রীয়াকলাপ যেমন:লোকনৃত্য, লেজিম ইত্যাদির শারীর শিক্ষার কর্মসূচীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিশুরা সেগুলি উপভোগ করে। এই সকল শারীর শিক্ষার কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশুরা স্নায়ুপেশীর সমন্বয়, শারীরিক ভারসাম্য পরিচালিত অঙ্গ সঞ্চালন ভঙ্গিমা ও ছন্দময়তার ধারণা তৈরিতে সাহায্য করে।

(ঙ) তুলনামূলকভাবে কম সাংগঠনিক রীতিবদ্ধ বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলার প্রয়োজন প্রাথমিক পর্যায় থেকে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রীতিবদ্ধ খেলাধূলা, দলবদ্ধ ক্রীড়া, ব্যক্তিগত ক্রীড়া এবং আত্ম-অভীক্ষার বিভিন্ন কার্যকলাপ চালু করা প্রয়োজন।

(চ) শিশুদের মধ্যে যেহেতু চরম অনুকরণ প্রবণতা ও নাটকীয় গুণগলি বর্তমান থাকে এই নাটকও মুকাভিনয় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(ছ) সাধারন মানের বদলি দৌড় (Relay Race) ক্রীড়াসূচীর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে।

(জ) সাঁতারও ক্রীড়াসূচীর মধ্যে আনা যেতে পারে।

(ঝ) ছাত্র-ছাত্রীদের ছন্দোময় নৃত্যের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলকভাবে করা উচিত কিন্তু এই বয়:ক্রমের শেষদিকে আলাদা আলাদাভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া উচিত।

প্রতিযোগীতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আন্ত: প্রাচীর ক্রীড়া (Inter Competition)

বুদ্ধি ও বিকাশের সম্পর্ক :

বুদ্ধি ও বিকাশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো বুদ্ধি পরিমাণগত বুদ্ধির একক ও বিকাশ গুণগত বৃদ্ধির একক। যেখানে শিশুর প্রাথমিক বুদ্ধির উপর নির্ভর করে বিকাশের যাত্রা শুরু হয়। দুটি ক্ষেত্রকে শিশুর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে শারীরিক ক্রিয়াকলাপ। তাছাড়াও বংশগতি, পরিবেশ, সুষম খাদ্য ও অভ্যাস ও বিশ্রামের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য।

সুস্থ স্বাস্থ্য লাভের মাধ্যম শারীরিক ক্রিয়াকলাপ। সুতরাং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের নিরিখে বৃদ্ধি ও বিকাশ সূচীত হয়।

৫.৬ শারীরিক সক্ষমতা

যদিও সক্ষমতা শব্দটি স্বাস্থ্যের সমার্থক নয়, তথাপি সক্ষমতার স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সাহায্য করে। ভালো স্বাস্থ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সক্ষমতা নির্ভর করে এবং অন্যদিকে সক্ষমতা-স্বাস্থ্য ও সুস্থ্য জীবনীশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশক। রোগমুক্ত, দৈহিক বিকাশ, সজাগ চলাফেরা, সচেতন মন এবং প্রাক্ষোভিক সক্ষমতার (Provide the framework of fitness) উপাদান। একথা অনেক সময় বলা হয়ে থাকে সক্ষমতা কেবলমাত্র জীবনের সঙ্গে বৎসর যুক্ত করে না। সক্ষমতা কেবলমাত্র কৈশোর বা যুব সমাজের শর্ত নয়-ইহা সকল বয়সের ক্ষেত্রেই বাস্তব সম্মত।

ক্রীড়াশৈলীর বিকাশ শরীর শিক্ষার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। ক্রীড়া শৈলীর প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে একটি অন্যতম উপাদান হলো শারীরিক সক্ষমতা। শারীরিক সক্ষমতা সক্ষমতার একটি অংশ।

এই পাঠ্যএককের পরবর্তী অংশে অভিযোজিত শরীর শিক্ষা বিষয়ে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করব।

এই পাঠ্য এককের বিষয়বস্তু পড়ে আপনি

শারীরিক সক্ষমতার ধারনা লাভ করতে পারবেন।

শারীরিক সক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ।

শারীরিক সক্ষমতার ধারণা :

সক্ষমতা একটি বিশেষ ধারণা-যা মানুষকে অর্জন করতে হয়। শারীরিক সক্ষমতার সামগ্রিক ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শারীরিক সক্ষমতা বলতে বোঝায় ব্যক্তির এমন এক শারীরিক অবস্থা যার দ্বারা সে দৈনন্দিন কাজ দক্ষতার সাথে করতে পারে এবং অনাবশ্যক অবসাদ এড়াতে পারে। এছাড়াও তার শরীরে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চিত থাকবে যার দ্বারা সে অবসরে সক্রিয় শরীরচর্চা বা খেলাধূলায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। এই শক্তি অপ্রত্যাশিত জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করতে সাহায্য করে এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের নূন্যতম মান প্রদর্শন করতে পারে যার দ্বারা শ্রম বিমুখ জনিত রোগের (Hypokinetic disease) আক্রমন প্রতিহত করতে পারে। এক কথায় বলা যেতে পারে শারীরিক সক্ষমতা মানুষের একটি বিশেষ ধরনের অর্জিত দক্ষতা যার দ্বারা সে সব ধরনের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ, কিছু নির্দিষ্ট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

শারীরিক সক্ষমতা মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থ জীবন ধারণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। শারীরিক সক্ষমতা সামগ্রিকভাবে একটি ধারণা বা অভিজ্ঞতা যা অর্জন করা শরীর শিক্ষার কর্মসূচীর একটি লক্ষ্য।

শারীরিক সক্ষমতার সাহায্যে একজন মানুষ গতি, শক্তি, সহনশীলতা, ক্ষিপ্রতা, ভারসাম্য প্রভৃতির একটি নূন্যতম মান বজায় রাখতে পারে। সবধরণের খেলাধূলার ক্ষেত্রেই শারীরিক সক্ষমতার একটি বিশেষ মানের প্রয়োজন।

শারীরিক সক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ :

শারীরিক সক্ষমতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন।

(ক) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সক্ষমতা (Physique Health related fitness)
ক্রীড়া দক্ষতা সম্পর্কিত ক্ষমতা (Performance related fitness)
স্নায়ুপেশী সম্পর্কিত সক্ষমতা (Motion fitness)

বর্তমানে ক্রীড়া শরীর বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে আরোও দুটি উপাদানকে যুক্ত করেছেন। দেহের ওজন নিয়ন্ত্রন (Weight Control) এবং স্থূলতা থেকে মুক্ত শরীর।

শারীরিক সক্ষমতার উপাদান সমূহ :

শারীরিক সক্ষমতার উপাদান

(ক) গতি

(খ) সহনশীলতা

(গ) শক্তি

(ঘ) ক্ষীপ্রতা

(ঙ) ভারসাম্য

(ক) গতি : একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে যে সময় লাগে তা গতি নির্ভর। গতি প্রতিক্রিয়ার সময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। গতি বৃদ্ধির জন্য সেই কারণে সঞ্চালন সময় (Reaction time) ও প্রতিক্রিয়ার সময়ের উন্নতি ঘটানো প্রয়োজন। স্বল্প দূরত্বের (৩০ মিটার) পূণ:পূণ: ত্বরণ দৌড় (Acceleration Run) সঞ্চালন সময়ের উন্নতি ঘটায়। বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনার (Stimulus) পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া সময় কমানো হয়। এই দুই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গতির বৃদ্ধি/উন্নতি সম্ভব। পেশী বিস্ফোরক শক্তির (Muscle Power) বৃদ্ধি ঘটলে গতি বৃদ্ধির সহায়ক হয়। পেশীর বিস্ফোরক শক্তি পেশীর শক্তি ও গতির গুণফলের আধার মাত্র।

গতিকে শ্রেণীবিন্যাস করলে আমরা পাঁচটি রূপে দেখতে পাবো।

(ক) প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা (Reaction ability)

(খ) ত্বরান্বয়ের ক্ষমতা (Acceleration ability)

(গ) স্থানান্তরের ক্ষমতা (Locomotion ability)

(ঘ) গতি সহনশীলতার ক্ষমতা (Speed Endurance ability)

(ঙ) দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষমতা (Movement Speed ability)

সাধারণভাবে গতি পরিমাপের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক্স টাইমিং ডিভাইস ব্যবহার করা হয়।

(খ) সহনশীলতা : সহনশীলতা বলতে বোঝায় অনেকক্ষণ ধরে কাজ করার ক্ষমতা যা অবসাদ বা ক্লান্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে। কাজের তীব্রতাকে (Intensity) অল্প পরিমানে কমিয়ে কোন ব্যক্তির অনেকক্ষন ধরে কাজ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। সহনশীলতা হৃৎপিন্ড, রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং শ্বসনতন্ত্রের মিলিত অভিব্যক্তি। ক্রীড়াবিজ্ঞানীদের মতে-সহনশীলতা হলো ক্লান্তি প্রতিরোধের ক্ষমতা। ইহা শারীরিক সক্ষমতার একটি অন্যতম প্রধান উপাদান।

শারীরিক ক্রিয়াকলাপের স্থায়িত্ব বা শারীরিক সক্ষমতার অন্যান্য উপাদান সাপেক্ষে সহনশীলতাকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা যায়।

স্বল্প স্থায়িত্বের সহনশীলতা

মাঝারি পাল্লার সহনশীলতা

সঠিক স্থায়ীত্বের সহনশীলতা

শক্তি নির্ভর সহনশীলতা

গতি নির্ভর সহনশীলতা

সহনশীলতার পরিমাপ কুপার টেস্ট (Cooper's test), Harvard Step test, ট্রেডমিল টেস্ট , বাইসাইকেল অ্যারগোমিটার টেস্ট, ইত্যাদির দ্বারা করা যায়।

(গ) শক্তি :

শক্তি বলতে বোঝায় পেশীর দ্বারা উৎপন্ন বল (Force) যা কোন বাধার বিরুদ্ধে কাজ করে। এক বা একগুচ্ছ পেশী সর্বোচ্চ সংকোচনকালে কোন বাধার (Resistance) বিরুদ্ধে যে বল প্রয়োগ করতে পারে তাকেই শক্তি বলে।

শক্তি প্রধানত: তিন প্রকারের

(ক) সর্বোচ্চ শক্তি (Maximum strength)

(খ) বিস্ফোরক শক্তি (Explosive strength)

(গ) সহনশীল শক্তি (Strength Endurance)

পেশীর শক্তি বৃদ্ধিতে ওজন নিয়ে ব্যায়াম (Weight Resistance Exercise) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিন ধরনের ওজন সহকারে ব্যায়াম শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক।

(ক) সমটান সংকোচন নির্ভর ব্যায়াম (Isotonic Exercises)

(খ) সমদৈর্ঘ্য সংকোচন নির্ভর ব্যায়াম (Isometric Excercises)

(গ) সমগতি সংকাচন নির্ভর ব্যায়াম (Isokinetric Exercises)

শক্তি পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম ভারটিক্যাল জাম্প (Vertical jump), Grip Dynamometer, টেনসিওমিটার ইত্যাদি।

(ঘ) ক্ষিপ্রতা :

ক্ষীপ্রতা বলতে বোঝায় দ্রুতগতিতে দিক পরিবর্তন যোগ্য অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষমতা। ক্ষীপ্রতাকে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে ব্যক্তির এমন এক ধরনের শারীরিক ক্ষমতা যা তাকে দ্রুত পরিস্থিতির সাপেক্ষে দিক পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে এই ধরনের শারীরিক ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবহেলা করা যায় না। খো-খো, ফুটবল, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন ও দ্রুত গতি নির্ভর সকল খেলায় ক্ষীপ্রতা ক্রীড়া দক্ষতার নির্নায়ক হিসাবে কাজ করে। ক্ষীপ্রতার মান নির্ভর করে গতি, শক্তি ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর ক্ষীপ্রতার পরিমাপের পদ্ধতি-স্কোয়াট থ্রাস্ট বা বার-পি টেস্ট, বুমেরাং রান, ৪×১০ মিটারের স্যাটল রান। ইহা ছাড়াও (Flim Analysis) এর মাধ্যমেও গবেষণাগারে ক্ষীপ্রতা পরিমাপ করা যায়।

(ঙ) ভারসাম্য :

শরীরের ভারসাম্য বলতে সেই শারীরিক ক্ষমতাকে বোঝায় যার দ্বারা ব্যক্তি সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। সাধারণত: দুই ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষকে এই বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয় ও সাধারণত: কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সেমি-সারকুলার ক্যানাল, বাইনেসেথেটিক পারসেপশন ও পেশী-অস্থি সন্ধি ও টেনডনের এবং তৃতীয়ত: ভিসুয়াল পারসেপশন প্রভৃতি তিনটি উৎস থেকে উৎপন্ন হয় এর মাধ্যমে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে মূলত: জিমন্যাসটিক্স এর ভূমিকা অপরিসীম।

শারীরিক সক্ষমতার প্রভাব ক্রীড়াশৈলীর বিকাশে :

ক্রীড়াশৈলীর বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে খেলোয়াড়ের শারীরিক সক্ষমতা ও সেই বিশেষ খেলার সঙ্গে যুক্ত কৌশল গুলির উপর। খেলোয়াড়দের টেকনিকের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতাকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় নিয়ে যেতে হয়-নচেৎ তার পক্ষে প্রতিযোগিতার সময় পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী ক্রীড়া কৌশলগুলি ব্যবহার করতে পারে না। কারণ যে খেলোয়াড় প্রতিযোগিতার সময় ন্যূনতম পরিশ্রমের মাধ্যমে ক্রীড়া কৌশলগুলিকে তুলে ধরতে পারে। তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা সবসময় বেশি থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা গেছে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে হলে প্রয়োজন শারীরিক সক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট মাত্রা। সেই মাত্রাকে সঠিকভাবে সংরক্ষিত

করতে না পারলে ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যকে নিশ্চিত করা যাবে না। সুতরাং ক্রীড়াশৈলী নির্ভর শারীরিক সক্ষমতা বর্তমানে ক্রীড়া বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর বিশেষ আলোচ্য বিষয় ও সঠিক গবেষণার দাবি রাখে।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—১ (Check your progress-1)

(ক) শারীর শিক্ষার দুটি উদ্দেশ্য লেখ

————————————————————

————————————————————

(খ) বাল্যকাল কতো বছর বয়স থেকে শুরু হয়?

————————————————————

————————————————————

(গ) শারীরিক সক্ষমতার উপাদানগুলি লেখ।

————————————————————

————————————————————

৫.৭ শিশুদের জন্য প্রথামুক্ত খেলাধূলা (Various Minor Games for Growing Children)

১) হাতির মতো চলা

শিক্ষার্থীদের বাঁ হাত লেজের মতো পিছনে ঝুলিয়ে রেখে হাতির লেজ নাড়ার ভঙ্গি করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু সামনের দিকে কুঁজো হতে হবে। এবার একইসঙ্গে ডান হাত নাকের কাছে নিয়ে এসে হাতির শুঁড়ের মতো করতে হবে। মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে মাথা ও শুঁড় নাড়ার ভঙ্গিতে দু-পায়ে থপথপ করে আস্তে আস্তে এগোতে হবে।

২) নৌকা চালানো

'এসো নৌকা চালাই, মাঝি মাঝি খেলি'। দু-পা একটু ফাঁক রেখে সামনের দিকে ছড়িয়ে বসতে হবে। দু-হাত দিয়ে নৌকার দাঁড় ধরার ভঙ্গি করে শরীর ও হাত সামনে ঝুঁকিয়ে পায়ের পাতার দিকে নীচু করতে হবে। আবার পরক্ষণেই সোজা হয়ে বসতে হবে এবং হাত দুটি বুকের কাছে নিয়ে আসতে হবে। এইভাবে কখনও ধীরে, কখনও দ্রুত কাজটি করতে হবে।

৩) সাইকেল চালানো

দু-হাত সামনে প্রসারিত করে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরার মতো করে মুষ্টিবদ্ধ করতে হবে। মুখে ক্রিং ক্রিং ক্রিং শব্দ করে পা দিয়ে সাইকেল চালানোর মতো করে দৌড়োতে হবে।

৪) নদী পার করা

শিক্ষার্থীদের দুটি লাইনে দাঁড় করাতে হবে । একটা লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনটি ২ ফুট থেকে ৩ ফুট দূরত্বের মধ্যে হবে।প্রত্যেকটি শিশুকে এই নদীটি এপার থেকে ওপার লাফ দিয়ে পার হতে হবে। যারা না পারবে তার 'কাপড় ভিজে'

যাবে সেজন্য তারা আউট হয়ে বসে পড়বে। এইভাবে খেলা চলবে।

৫) ঝড়ে গাছের মতো দোলা

ভীষণ ঝড়ে গাছের ডালপালা নড়ে, গাছ দোলে। দাঁড়িয়ে থাকা গাছের মতো শিক্ষার্থীরা নিজেদের দু-হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়াবে। পা একটু ফাঁক থাকবে। প্রথমে ধীরে ধীরে শরীরটাকে দোলাবে, দু-হাতও নাড়াতে হবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বাঁদিক থেকে ডান দিকে এবং ডান দিক থেকে বাঁদিকে ধীরে বা দ্রুত নাড়াতে হবে। অবশেষে শিক্ষার্থীরাও প্রচণ্ড দুলতে দুলতে গাছের মতো পড়ে যাবে।

৬) পাখির মতো ওড়া

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটি দু-পাশে বিস্তার করতে হবে। পাখি ওড়ার ভঙ্গিতে দু-হাত উপরে নীচে নাড়তে নাড়তে কখনও একটু জোরে আবার কখনও আস্তে, কখনও হাঁটু ভেঙে নীচু হয়ে, কখনও বা একটু এঁকেবেঁকে ছুটতে হবে।

৭) এরোপ্লেনের মতো চলা

পাখির ওড়ার মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটি দু-পাশে বিস্তার করতে হবে। ওই অবস্থায় কখনও ডাইনে ,কখনও বাঁয়ে ,কখনও জোরে আবার কখনও আস্তে কখনও বা একটু এঁকেবেঁকে ছুটতে হবে।

৮) গাছ থেকে আম পাড়া

ডান হাত উপরে তুলে উঁচু ডাল থেকে আম পাড়ার জন্য শূন্যে লাফ দেওয়ার ভঙ্গি করতে হবে। কাজটি করার সময় মুখে সকলে একসঙ্গে এই ছড়াটি বলবে — 'আম যদি চাও, জোরে লাফ দাও', জোরে লাফ দাও। একই ভাবে বাঁ হাত উপর তুলে একই রকম ভঙ্গিমা করতে হবে।

৯) চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া

শিশুরা ছোটো ছোটো লাইনে দাঁড়িয়ে পিছনের শিশুটি সামনের শিশুটির কোমর দু-হাত দিয়ে ধরতে হবে। লাইনের প্রথম শিশুটি হবে ইঞ্জিন। তারপর অন্যান্য শিশুরা হবে রেলগাড়ির কামরা এবং লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা শেষ শিশুটি হবে গার্ড সাহেব। বাঁশি বাজলে প্রথম শিশু সবাইকে নিয়ে ছুটতে শুরু করবে। প্রথম জন, যে ইঞ্জিন হয়েছে সে মুখে ট্রেন ইঞ্জিনের চলার মতো শব্দ -- ''কু ঝিক্ ঝিক্/ ভোঁ'' ইত্যাদি শব্দ করবে। শিশুরা দল বেঁধে চিড়িয়াখানা দেখতে যাবে। ছোটো ছোটো লাইন করে এবং দু-হাত দিয়ে সামনের জনের কাঁধ স্পর্শ করে রেলগাড়ি চলার ভঙ্গিতে কু ঝিক্--ঝিক্, হুসহুস শব্দ করতে করতে যাবে। শিশুরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে দূর থেকে বাঘ দেখে -- ওই যে বাঘ বলে বাঘের দলের কাছে ছুটে যাবে। বাঘের দল তখন তাদের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তাদের গণ্ডির মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করবে। আবার আর একটা জায়গায় ঘোড়া লেজ দোলাতে থাকবে এবং লাফালাফি করবে। শিশুরা সংখ্যা অনুযায়ী ৫ থেকে ৮ জন নিয়ে একটি দল (বাঘের দল, হাতির দল, শিম্পাঞ্জি, ঘোড়া, শিশুর দল প্রভৃতি) ভাগ করতে হবে। চিড়িয়াখানা দেখে শিশুরা এক জায়গায় সকলে বৃত্ত গঠন করে বসবে। শিক্ষকের নির্দেশে শিশুরা বিভিন্ন জন্তুজানোয়ারের মতো হাঁটা, দৌড়াদৌড়ি, লাফঝাঁপ ও হাঁকাহাঁকি করবে। হাতি যাওয়ার সময় ডান হাত মাথার ওপর দিকে নিয়ে মাথাটা নীচু করে হাতির শুঁড় বানাতে হবে এবং নাড়াতে হবে পরে হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে লেজ বানাতে হবে। ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, হনুমান, প্রভৃতির স্বভাব অনুকরণ পদ্ধতি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে দেবেন।

৫.৭.১ বিনোদনমূলক খেলা

শিশুদের খেলাধূলার ক্ষেত্রে অনিয়মানুগ খেলাধূলা স্থান পায়। অর্থাৎ যে সমস্ত খেলাধূলার ক্ষেত্রে তেমন কোনো

নিয়মকানুনের বাধ্যবাধকতা থাকে না। এখানে সকলে একসঙ্গে আনন্দপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে।

এই রকম কতগুলি খেলার মধ্যে দড়ি টানাটানি, ইঁদুর বেড়াল খেলা অন্যতম। দড়ি টানাটানিতে শিশুরা আনন্দ পায় এবং দুটো দলে ভাগ হয়ে একদল অপর দলকে নিজেদের দিকে টেনে টেনে আনতে চেষ্টা করে এর মধ্য দিয়ে আনন্দলাভের মধ্য দিয়ে পেশিশক্তি বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়।

বিড়াল ও ইঁদুর খেলায় হাত ধরাধরি করে খেলোয়াড়রা পরস্পরের দিকে মুখ করে বৃত্তাকারে দাঁড়াবে। বৃত্তের মধ্যে যে খেলোয়াড় থাকবে সে হবে ইঁদুর এবং বাইরে যে খেলোয়াড় থাকবে সে হবে বিড়াল। বৃত্তে আবদ্ধ খেলোয়াড়দের দায়িত্ব হবে ইঁদুরকে বিড়ালের আক্রমণ হতে রক্ষা করা। বিড়ালকে কোনোভাবেই বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করতে না দেওয়া। যদি কোনোভাবে বিড়াল বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে ফেলে তবে তৎক্ষণাৎ ইঁদুরকে বৃত্তের বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করা এবং বিড়ালকে বাইরে বেরোতে না দেওয়া। বিড়াল যদি ইঁদুরকে ধরে ফেলে তবে সে আউট হয়ে যাবে। এইভাবে প্রত্যেকে ইঁদুর ও বিড়ালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

৫.৭.২ উল্টানো খেলা

Forward Roll (সামনে গড়ানো)

পদ্ধতি : ক) হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসতে হবে। হাত দুটি কাঁধের সমান ব্যবধানে থাকবে। হাতের আঙুলগুলি গড়ানো দিকে রেখে পায়ের থেকে প্রায় 2 ফুট দুরে হাত মাটিতে রাখতে হবে।

খ) আস্তে আস্তে নিতম্ব ওপরে তুলতে হবে এবং চিবুক বুকে ঠেকাতে হবে।

গ) দুই হাত নীচু করতে হবে যাতে গলা ও কাঁধের পিছন জমি স্পষ্ট করে। পা মাটি থেকে তুলে শরীর গুটিয়ে নিয়ে সামনে গড়াতে হবে।

ঘ) পা মাটিতে রেখে দেহের ওজন পায়ের ওপর রাখতে হবে এবং ভারসাম্য বজায় রেখে সোজা হয়ে দাড়াতে হবে।

Backward Roll (পেছনে গড়ানো)

পদ্ধতি : ক) পা জোড়া করে squat বা হাঁটু ভাঙা অবস্থায় যে দিকে গড়াতে হবে সেদিকে পেছন করে থাকতে হবে।

খ) দেহের ওজন পেছন দিকে রেখে গড়াতে হবে, যখনই পিঠের মাঝখান জমি স্পর্শ করবে তখন দুই হাতের তালু মাটিতে রাখতে হবে।

গ) দেহ গুটিয়ে হাতের চাপ দিয়ে গড়ানো শেষ করতে হবে যাতে পা মাটি স্পর্শ করে।

ঘ) হাটু ভাঙা অবস্থায় থেকে ভারসাম্য বজায় রেখে সোজা হয়ে দাড়াতে হবে।

Cart wheel (গরুর গাড়ির চাকা)

পদ্ধতি : ক) বাম পা সামনে রেখে দাড়াতে হবে। বাম কাঁধ সামনে থাকবে এবং হাত দুটো ওপরে থাকবে।

খ) দেহের ওপরের অংশ, বাম হাত ও বাম কাঁধ খুব তাড়াতাড়ি সামনে বাম পায়ের প্রায় দেড়ফুট সামনে রাখতে হবে।

গ) ডান হাতকেও কাঁধ ব্যবধান দূরত্বে বাম হাতের লাইনে রাখতে হবে।

ঘ) দেহ সোজা অবস্থায় এসে ডান পায়ের ওপর নেমে বাম পা মাটিতে রাখতে হবে।

ঙ) Cart wheel-এর চারটি দশা আছে। যথা - হাত, হাত, পা ও পা।

Camel walks in pairs (জোড়ায় উটের মত হাঁটা)

পদ্ধতি : ক) সামনা সামনি দাঁড়ানোর পর একজন অন্যজনের কোলে উঠবে এবং কোমরের দুপাশ দিয়ে পা নিয়ে পিছনে ফাস তৈরি করবে।

খ) যে কোলে উঠেছে সে আস্তে আস্তে শরীরটা পেছনে বাঁকিয়ে হাত দুটো মাটিতে রাখবে এবং সঙ্গীর পায়ের মাঝখানে নিয়ে দেহ অন্যদিকে নিয়ে আসতে হবে।

গ) যে দাঁড়িয়েছিল সে আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুকে মাটিতে হাত রাখবে। অন্য সঙ্গী অপরের পায়ের গোছ দুটিকে দুহাতে শক্ত করে ধরবে।

ঘ) যে সঙ্গীর হাত মাটিতে আছে সে সামনের দিকে হাঁটতে থাকবে। অনুরূপ ভাবে সঙ্গীর অবস্থান বদল করে উটের মত হাঁটা যাবে।

৫.৭.৩ মেজর গেমস - ফুটবল, ভলিবল, কাবাডি, খো-খো (Football, Volley Ball, Kabaddi, Kho-Kho)

কাবাডি (Kabaddi)

ইতিহাস ঃ- এই খেলার উৎপত্তি ভারতবর্ষে। তাই একে রাষ্ট্রীয় খেলা বললেও ভুল বলা হবে না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই খেলা বিভিন্ন নামে হয়ে থাকে। যেমন- পশ্চিমবঙ্গে-হাডুডু, মহারাষ্ট্রে-হুতুতু, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে চেডুগুডু ইত্যাদি। ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে অমরাবতীর হপুমান ব্যায়াম প্রসারক মন্ডল এই খেলাটির অভিপ্রদর্শন করেছিল। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এই খেলাটিকে স্বীকৃতি জানায়। এরপর ১৯৫০ সালে বোম্বাইয়ে শ্রী- এস গৌড়বেলের সভাপতিত্বে ভারতীয় কবাডি সংস্থাটি গঠিত হয়। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে কবাডির সংস্থার সৃষ্টি হয়।

কবাডি খেলার মাঠের মাপ ও সাধারণ নিয়মাবলি :-

(ক) মাঠের আয়তন অনুসারে কবাডি খেলার মাপ দুই রকমের হয়ে থাকে।

(i) পুরুষ (অনুর্ধ ৮০ কেজি)/জুনিয়ার বালক (৬৫ কেজি ও ২০ বছর অনুর্ধ) - ১২.৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১০ মি. প্রস্থ।

(ii)মহিলা (অনুর্ধ ৭০ কেজি)/জুনিয়ার বালিকা (৬০ কেজি ও ১৬ বছর অনুর্ধ)-১১ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৮ মিটার প্রস্থ।

মাঠের দুপাশে পার্শ্বরেখা থেকে ভিতরে ১ মিটার প্রস্থ দুটি লবি থাকে। মাঠের দুপাশে লবিকে বাদ দিয়ে যে অংশটা থাকে তাকেই খেলার মাঠ হিসাবে ধরা হয়। খেলার সময় অবশ্য লবিকে তখন খেলার মাঠের মাপের মধ্যেই ধরা হয়। মধ্য রেখা থেকে মধ্যরেখার সমান্তরাল ভেতরের দুপাশে দুটি রেখা টানা হয়। একে কোল চড়াই বা Baulk line বলে। এই রেখার সমান্তরাল ১ মিটার ভিতরে একটি রেখা টানা হয় যাকে Bonus line বলে।

(খ) প্রতিটি দলে ১২ জন খেলোয়াড় থাকে। ৭জন খেলোয়াড় মাঠে অংশগ্রহণ করে থাকে।

(গ) পুরুষদের ক্ষেত্রে এই খেলা ২০ মিনিট + ৫মিনিট + ২০ মিনিট = ৪৫ মিনিট এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫ মিনিট + ৫

মিনিট + ১৫ মিনিট = ৩৫ মিনিট হয়ে থাকে।

(ঘ) প্রত্যেক দল বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে আউট করলে ১ পয়েন্ট পাবে। আর যদি বিপক্ষের সব খেলোয়াড়কে আউট করে তাহলে অতিরিক্ত ২ পয়েন্ট পাবে।

(ঙ) কোনো খেলোয়াড় আহত হলে অধিনায়ক রেফারির অনুমতি সাপেক্ষে টাইম আউট (২ মিনিট) পাবেন। এছাড়া রেফারির অনুমতিতে প্রতি অর্ধে 30 সেকেন্ডের দুবার টাইম আউট পাওয়া যাবে।

(চ) কবাডি খেলার ১ জন রেফারি, ২জন আম্পায়ার, ১ জন স্কোরার ও ২ জন সহকারী স্কোরার থাকেন।

(ছ) প্রথমার্ধের পর প্রত্যেক দলের যতজন খেলোয়াড় মাঠে থাকবেন বিরতির পর সেই খেলোয়াড়রাই মাঠে খেলা শুরু করবেন।

(জ) খেলার লড়াই চলাকালীন লবিকে কোর্টের সীমানা ধরা হয়।

(ঝ) প্রতিপক্ষের কোর্টে প্রবেশের সময় পরিষ্কার 'কবাডি' উচ্চারণ করতে হবে।

ভলিবল (Volleyball)

ইতিহাস :- ভলিবল খেলার জন্ম ১৮৯৫ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের হলিওকে। হলিওকের ওয়াই. এম. সি-এর শারীরশিক্ষার অধিকর্তা উইলিয়াম. জি. মর্গান ১৮৯৬ সালে ভলিবল খেলার প্রবর্তন করেন। এরপর ১৯৪৭ সালে প্যারিসে ভলিবলের আন্তর্জাতিক সংস্থা—ফেডারেশন অফ ইন্ট্যারন্যাশানাল ভলিবল গঠিত হয়।

ভারতে এই খেলা প্রথম প্রচলন করে ওয়াই. এম. সি. এ। তাদেরই প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে এই খেলা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে লুধিয়ানায় অধ্যক্ষ শ্রী এফ. সি. অরোরা সভাপতি ও শ্রী এম. কে. বসুকে সম্পাদক করে প্রথম ভারতীয় ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়।

ভলিবল খেলার মাঠের মাপ ও সাধারণ নিয়মাবলী :-

(ক) মাঠ ১৮ মিটার লম্বা ও ৯ মিটার চওড়া। সীমানার দাগ ৫সেমি চওড়া যা সম্পূর্ণ মাঠের মধ্যে ধরা হয়। মধ্যরেখার সমান্তরাল মাঠের দু-পাশে ৩ মিটার দূরে একটি লাইন টানা হয়। এই অংশটিকে আক্রমণ অঞ্চল বলা হয়। মধ্যরেখা যেখানে পার্শ্বরেখাকে স্পর্শ করেছে সেখান থেকে উভয় পার্শ্বে ০.৫০ মিটার থেকে ১ মিটার দূরে২.৫৫ মিটার উচ্চতার দুটি খুঁটি থাকে। সেই খুঁটিতে ৯.৫০ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া একটি নেট বাধা থকে। নেটের দুদিকে পার্শ্বরেখার লাইনে ১মিটার লম্বা ৫ সেমি চওড়া পট্টি লাগানো থাকে। এই পট্টির সাথে খাড়াভাবে ১.৮০ মিটার লম্বা ও ১০ মি.মি. ব্যাস বিশিষ্ট অ্যান্টেনা লাগানো থাকে । জালের উচ্চতা পুরুষদের ক্ষেত্রে ২.৪৩ মিটার ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.২৮ মিটার হয়।

(খ) ভলিবলের পরিধি ৫৬-৬৭ সেমি. ওজন ২৬০-২৮০ গ্রাম এবং বলের ভিতরের বায়ুর চাপ ০.৩০-০.৩২৫

কেজি/সেমি^{২} হওয়া দরকার।

(গ) প্রতিদলের সর্বাধিক ১২ জন খেলোয়াড় থাকে যার মধ্যে ৬ জন খেলোয়াড় মাঠে খেলা করে। ১২ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন লিবেরোর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে, যার পোশাক অন্য সব খেলোয়াড়ের থেকে আলাদা রঙের হবে।

(ঘ) সাধারণত খেলায় পাঁচটি সেট হয়। প্রতিটি সেটে ৩০ সেকেন্ডের দুবার করে টাইম আউট নিতে পারবে প্রতিটি দল। প্রথম ৪টি সেট ২৫ পয়েন্ট শেষ হয় (যে দল আগে শেষ করবে) তবে ৫নং সেটটি ১৫ পয়েন্টে হয় (যে দল আগে শেষ করবে)।

(ঙ) সার্ভিস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষে দলের খেলোয়াড়রা তিনবার বলে আঘাত করে অপরপক্ষে কোর্টে বল ফেলতে পারবে।

(চ) পিছনের কোর্টের খেলোয়াড় কখনোই সামনের কোর্টে এসে বিপক্ষ দলের কোর্টে বল পাঠাতে পারবে না।

(ছ) খেলা চলাকালীন নিজের কোর্টের বল অপর কোর্টে পাঠানোর সময় জাল স্পর্শ করতে পারবে না। এমনকি মধ্যরেখাও অতিক্রম করতে পারবে না।

(জ) ভলিবল খেলায় দুজন রেফারি, একজন স্কোরার ও চারজন পার্শ্বলাইন জাজ হিসাবে থাকেন।

ফুটবল (Foot ball)

ইতিহাস :- বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হল ফুটবল। ফুটবলের জন্ম কোথায় সে ব্যাপারে বহু মত আছে। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে ইংল্যান্ডে প্রথম এই খেলার প্রচলন ঘটে। ১৮৩৩ খ্রী: ইংল্যান্ডে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম হয়। ১৯০৪ সালে প্যারিসে ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ফিফা) গঠিত হয়। এই সংস্থা প্রতি চার বছর অন্তর ১৯৩০ সাল থেকে বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে চলেছে। আমাদের দেশেও ফুটবল খেলার প্রচলন হয় ইংরেজদের মাধ্যমে। ১৮৭২ সালে কলকাতায় প্রথম ভারতীয় ফুটবল ক্লাব ডালহৌসি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সালে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (I. F. A) গঠিত হয়।

ফুটবল খেলার মাঠের মাপ ও সাধারণ নিয়মাবলী :-

(ক) মাঠ আয়তাকার হবে যা লম্বায় সর্বাধিক ১৩০ গজ (১২০ মিটার) এবং নূন্যতম ১০০গজ (৯০ মিটার), চওড়ায় সর্বাধিক ১০০গজ (৯০ মিটার) এবং নূন্যতম ৫০ গজ (৪৫ মিটার) আন্তর্জাতিক খোলার মাঠ লম্বায় ১১০-১২০ গজ ও চওড়ায় ৭০-৮০ গজ। লম্বার দিকের সীমানাকে টাচ লাইন এবং চওড়ার দিকের সীমানাকে গোল লাইন বলে। লম্বা দৈর্ঘ্যের মধ্যবিন্দু থেকে একটি লাইন টেনে মাঠটি দুটো ভাগ করতে হবে যাকে মিডল লাইন বলে। মিডল লাইনের মধ্যবিন্দু থেকে ১০ গজের ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কিত হবে যাকে সেন্টার সার্কেল বলে। গোল লাইনের মধ্যবিন্দু থেকে উভয় কর্ণারের দিকে ৪ গজ করে মোট ৮ গজ দূরত্বে দুটি ৮ ফুট উচ্চতার খুঁটি পোতা হবে যাকে গোল পোস্ট বলে। উভয়

গোলপোস্ট থেকে কর্ণারের দিকে ৬গজ দূরত্বে ৬গজ মাঠের ভিতরের দিকে একটি লাইন টানা হবে উভয় লাইন গোল লাইনের সমান্তরাল করে যুক্ত করা হবে, যে আয়তক্ষেত্রটি তৈরী হবে তাকে গোল এরিয়া বলে। উভয় গোল পোস্টের মধ্যবিন্দু থেকে মাঠের ভিতরের দিকে ১২ গজ দূরত্বে ৩০সেমি একটি স্পট অঙ্কিত হবে যাকে পেনাল্টি স্পট বলে।

(খ) বলের পরিধি ২৭-২৮ ইঞ্চি, বলের ওজন৪১০-৪৫০ গ্রাম এবং হাওয়ার পরিমাণ ৬০০- ১১০০ গ্রাম/সেমি^{২}।

(গ) প্রতিদলে ১৮ জন করে খেলোয়াড় থাকে যার মধ্যে ১১ জন খেলোয়াড় মাঠে খেলা করে। সমগ্র খেলায় মোট ৩ জন খেলোয়াড় পরিবর্তিত হতে পারে।

(ঘ) ফুটবল খেলায় ৪ জন রেফারি থাকেন। তার মধ্যে একজন মাঠের মাঝখানে বাঁশি হাতে থাকেন, দুজন পার্শ্বরেখা বরাবর পতাকা নিয়ে থাকেন এবং চতুর্থজন মাঠের বাইরে থাকেন।

(ঙ) খেলা চলাকালীন কোনো প্রকার নিয়ম ভঙ্গ হলে রেফারি 'ফাউল' দেন। এই ফাউল ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট দু-প্রকারের হয়ে থাকে।

(চ) মাঠের মধ্যে কোনো খেলোয়াড় খারাপ আচরণ, সময় অপচয়, রেফারির অনুমতি ছাড়া মাঠে ঢোকা বা প্রস্থান করলে, খারাপ মন্তব্য করলে রেফারি হলুদ কার্ড ব্যবহার করে থাকেন।

(ছ) মাঠের মধ্যে কোনো খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের কোনো খেলোয়াড়কে গুরুতরভাবে আঘাত করলে, খুব খারাপ ব্যবহার করলে, মাঠে অশালীন মন্তব্য করলে, দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখলে তাকে লাল কার্ড দেখানো হয়ে থাকে।

(জ) যখন প্রতিপক্ষের কোনো খেলোয়াড় বলের থেকে এগিয়ে থাকে এবং বিপক্ষের গোল লাইনের কাছে এগিয়ে থাকেন, তখন সেই খেলোয়াড়কে অফসাইডে আছে বলে মনে করা হয় এবং ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেওয়া হয়।

খো-খো (Kho - Kho)

ইতিহাস :- খো-খো খেলা আমাদের প্রাচীন দেশীয় খেলা এবং এই খেলার প্রচলন হয় পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। সরকারী ভাবে ১৯১৪ সালে পুনেতে (মারাঠা ডেকান জিমখানা ক্লাবে) এই খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৩ সালে এই খেলার নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরী হয়। ১৯৫৬ সালে ভারতের খো- খো সংস্থা গঠিত হয়।

খো - খো খেলার মাঠের মাপ ও সাধারণ নিয়মাবলী :-

(ক) খো - খো খেলার মাঠ আয়তাকার হয় । পুরুষ, মহিলা, জুনিয়ার বালক ও বালিকাদের জন্য মাঠের দৈর্ঘ্য ২৯ মিটার ও প্রস্থ ১৬ মিটার হয়। সাব জুনিয়ার ও মিনিদের জন্য দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার ও প্রস্থ ১৪ মিটার হয়। মাঠের মাঝখানে ৩০ মিটার চওড়া কেন্দ্রপথ থেকে। এই কেন্দ্রপথের ওপর ৩০ সেমি চওড়া আড়াআড়িভাবে সমান দূরত্বের ৮টি এড়োপথ থাকে। যেখানে কেন্দ্রপথ ও এড়োপথ যুক্ত হয়েছে সেখানে ৮টি ৩০ সেমি মাপের বর্গক্ষেত্র তৈরী হয়। মাঠের কেন্দ্রপথের শেষে যেখানে যুক্ত অঞ্চল শুরু হয় ঠিক তার মাঝে ১.২০ মিটার থেকে ১.২৫ মিটার উচ্চতার দুটি খুঁটি থাকে যাকে সাধারণত পোল বলা হয়।

(খ) খো-খো খেলার ১২জন খেলোয়াড় থাকে যার মধ্যে ৯ জন খোলোয়াড় মাঠে খেলা করে। খো-খো- খেলায় একটি দলকে ধাবক ও অপর দলকে অনুধাবক হিসাবে খেলা শুরু করতে হয়।

(গ) খেলা হবে দুটি পর্যায়ে যথা ৯+৫+৯+ (বিরতি ৯) ৯ + ৫ + ৯ = মোট ৫৫ মিনিট সাব জুনিয়ারদের ক্ষেত্রে ৭ + ৩ + ৭ (বিরতি ৬ মিনিট) +৭ + ৩ +৭ = মোট ৪০ মিনিট হয়ে থাকে।

(ঘ) এই খেলায় ১ জন রেফারি ২জন আম্পায়ার, ১ জন সময়রক্ষক ও ২জন স্কোরার থাকেন।

(ঙ) ধাবক দলের ৯ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে প্রথমে ৩জনকে মাঠে নামাতে হবে। তারপর তারা আউট হলে পরবর্তী ৩ জনকে নামতে হবে, এইভাবে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত খেলাটি চালিয়ে যেতে হবে।

(চ) অনুধাবক দলের খেলোয়াড়রা অবশ্যই বর্গক্ষেত্রের মধ্যে বসতে হবে, কখনোই কেন্দ্র পথের মধ্যে ছোঁড়া যাবে না।

(ছ) ধাবকরা কেন্দ্রপথের যেকোনো দিকে যেতে পারে কিন্তু অনুধাবকরা কেন্দ্রপথ অতিক্রম করতে পারবে না।

(জ) অনুধাবকরা যতজন ধাবককে আউট করবে তত পয়েন্ট হবে, সময় শেষ হওয়ার মধ্যে যদি সমস্ত ধাবক আউট হয় তবে অনুধাবকের দল সোনা পাবে।

৫.৭.৪ লম্ফন ও নিক্ষেপজাতীয় প্রতিযোগিতা (Jumping and Throwing Events)

লৌহগোলক নিক্ষেপ (Shot Put)

প্যারি ও 'বায়েন পদ্ধতি : প্রথমে ৬টি পর্যায়কে ধীরে ধীরে রপ্ত করে একত্রে পর্যায়ক্রমিক ৬টি স্তর সম্পাদনের মাধ্যমে এই পদ্ধতিটি রপ্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে বলা গতিবিদ্যায় ধ্যানধারণাকে সবচেয়ে বেশি কার্যকর করা সম্ভব হয়েছে।

মাঝের তিনটি আঙুল আরামদায়কভাবে ছড়িয়ে আঙুলের গোড়ায় লৌহগোলককে ধরতে হবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দু-পাশ থেকে লৌহগোলককে ধরে থাকতে সাহায্য করবে। আঙুলগুলি ছড়িয়ে লৌহগোলককে না ধরলে কবজি ও কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত অংশের উপর চাপ এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ থাকবে না। লৌহগোলককে ধরে কণ্ঠার উপর চোয়োলের নীচে এবং চিবুকের খুব কাছে স্থাপন করতে হবে।

ঠিকমতো লৌহগোলক ধরে, ছোঁড়ার বিপরীত দিকে মুখ করে বৃত্তের পিছনের দিকে দাঁড়াতে হবে, শরীরের ভার থাকবে (ডানদিকের ক্ষেত্রে) ডান পায়ের উপর, বাঁ পা প্রায় ৩০ সেমি পিছনে পায়ের পাতা মাটির উপর রেখে দাঁড়াবে। নিক্ষেপকারী শরীর শিথিল অবস্থায় আনবে এবং ছোড়ার বিষয়ে মনোনিবেশ করবে।

শরীর নীচু অবস্থায় আনা : বিস্ফোরকভাবে শরীরকে পিছনে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিক্ষেপকারী শরীরকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে শরীর ও লৌহগোলকের জাড্য ভাঙা হয়, ডান হাঁটু সামান্য ভাঙা হয়, বাঁ পা মাটি থেকে তুলে হাঁটু ডান পায়ের কাছে আনা হয়। দুই কাঁধ বেশ আড়াআড়ি রাখা হয় এবং বাঁ বাহু টানার (gliding) ভঙ্গিমাটি সম্পন্ন করতে হবে।

টানা: নিক্ষেপের দিকে গতি এবং ভরবেগ লাভের জন্য এর প্রয়োজন। নিক্ষেপের অভিমুখে ডান ও বাঁ পায়ের চালনার সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায় শুরু হয় বাঁ পায়ে পিছনে লাথি ছোড়া দিয়ে, যা হবে নীচু এবং সমোচ্চতাসম্পন্ন, যখন বাঁ পা শূন্য থেকে মাটিতে আসবে তখন এটা প্রায় সোজা হবে, যদিও সামান্য একটু বেঁকে থাকবে। ভরকেন্দ্র যথাসম্ভব নীচে থাকবে। শরীরের সামনের দিক এবং ঊর্ধ্বংশের মধ্যে, কৌণিক মান যত কম হবে তত নিক্ষেপের প্রায়োগিক বিস্তার বেশি হবে। বাঁ পায়ে লাথি ছোড়ার সময় এটা সামান্য ঘুরে যায়, কিন্তু ঊর্ধ্ব প্রত্যঙ্গ এইরকম থাকে। লৌহগোলক নিক্ষেপের ক্ষেত্রে পায়ের জোর খুব গুরুত্বপূর্ণ।

নিক্ষেপ ভঙ্গি : ডান পা শরীরের ঠিক নীচে থাকবে। বাঁ পা বলিষ্ঠভাবে সোজা দু-পায়ের মধ্যে প্রায় ৯০সেমি ব্যবধান থাকবে। কাঁধ আড়াআড়িভাবে পিছনে, বাঁ হাত বুকের আড়াআড়ি, লৌহগোলক ধরা থাকবে চিবুকের খুব কাছে, ডান পায়ের গোড়ালি ও বাঁ পায়ের পাতা প্রায় এক সরলরেখায় থাকবে।

নিক্ষেপ : ডান পায়ের সাহায্যে সজোরে ধাক্কা দিয়ে গোড়ালি ও হাঁটু সোজা করা হয় এবং শরীরকে একইসঙ্গে উপরের দিকে ও ছোড়ার অভিমুখে আনা হয়। পরিবেশে পা, নিতম্ব, মধ্যশরীর, ডান কাঁধ, বাহু, কবজি এবং শেষে আঙুলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লৌহগোলক নিক্ষিপ্ত হয়। শরীরের প্রসারণ থাকবে উল্লম্বভাবে। মাটিতে পা রাখা এবং নিক্ষেপ উচ্চতার মধ্যে সমন্বয় এমন হবে যাতে শরীরের সর্বোচ্চ প্রসারণ সম্ভব হয়। গোলক নিক্ষেপ কোণ প্রায় ৩৫°—৪০° হবে।

সাম্যব্যবস্থায় ফিরে আসা : দেহ বৃত্তের বাইরে চলে যায়, ভিতরে কিছুটা নিক্ষেপকারীর ভারসাম্য নষ্ট নয়। লৌহগোলক নিক্ষেপের সময় হাঁটু সামান্য ভেঙে আড়াআড়িভাবে ফেলা হয়। বাঁ পা পিছনে উপরের দিকে উঠে যায়। ভরকেন্দ্র নীচে আসবে যাতে ভাবসাম্য রক্ষা করা যায়।

লৌহগোলক নিক্ষেপের এই প্রয়োগ কৌশলটি 'প্যারি ও' ব্রায়েন টেকনিক নামে পরিচিত। ছোড়ার সময় যাতে কনুই স্থানচ্যুত না হয় এবং নিক্ষেপের পর যাতে ছোড়ার বৃত্তের পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে আসে সেদিকে নিক্ষেপকারীর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, না হলে ওই নিক্ষেপ সঠিক বলে গণ্য হবে না।

ডিসকাস নিক্ষেপ (Discuss Throw)

ধরা : প্রথমে ডিসকাস বাঁ হাতে ধরা হয়, তারপর ডান হাতে। আঙুলগুলি ছড়িয়ে আঙুলের প্রথম সন্ধি ডিসকাসের কিনারা রেখে ধরতে হয়, ছাড়ার পর যাতে ডিসকাস ঠিকমতো পাক খায়। ডান হাতের তালু ডিসকাসের কেন্দ্রে থাকবে আর বুড়ো আঙুল স্বাভাবিকভাবে ডিসকাসের ভারসাম্য রাখতে সাহায্য করে।

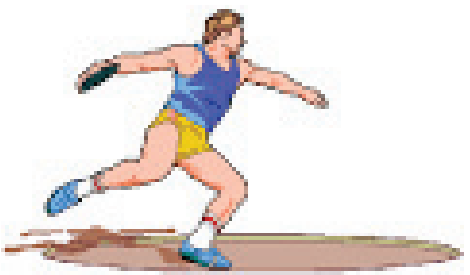

প্রাথমিক অবস্থা : নিক্ষেপকারী বৃত্তে নিক্ষেপের বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়াবে, পা দুটি স্বাচ্ছন্দ্যমতো ফাঁক করে। প্রথম পর্যায়ে গতিবিধি ধীর করার জন্য হাঁটু দুটো সামান্য ভাঁজ করে দাঁড়াতে হয়, ডান পা বৃত্তের কিনারার কাছে এবং বাঁ পা একটু দূরে থাকবে, যাতে সুন্দর ও সহজভাবে ঘোরা যায়। শরীরের ভার উভয় পায়ের উপর থাকবে।

প্রারম্ভিক দোলন : ক্রীড়াবিদকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে এবং তার শরীর ও ডিসকাসের জাড্য ভাঙতে এর প্রয়োজন। নিক্ষেপের পরিসর বাড়ানোর জন্য গোড়ালি উঁচু করতে হবে, যখন ডান হাত বাঁ পায়ের উপরে আসবে, আবার বাহু আন্দোলন করে যখন পিছনে আনা হবে তখন হাতের তালু নীচের দিকে থাকবে। প্রারম্ভিক দোলন হবে শিথিল, মসৃণ এবং ধীর, এই পর্যায় নিক্ষেপের বৃহৎ পরিসরের জন্য দরকার।

ঘোরা : ঘোরার জন্য হাঁটু ভাঁজ করতে হয়, ওজন বাঁ পায়ে স্থানান্তরিত করতে হয়, বাঁ হাত শরীরের আড়াআড়ি, দৃষ্টি সামনের দিকে, মাথা সোজা থাকবে। ক্রীড়াবিদ পদতলের মাংসল অংশের উপর ভর দিয়ে ঘোরা শুরু করে। মধ্যশরীর সামনে একটু ঝুঁকে থাকে, ডান পা মাটি ছেড়ে উঠে যায়। ঘোরার প্রথম পর্যায় হয় অপেক্ষাকৃত ধীর, তারপর গতি বাড়ে। ভরকেন্দ্র নীচু থাকে, নতুবা ঘোরা সম্ভব হবে না।

ভঙ্গি : ভঙ্গি হবে ভারসাম্যযুক্ত ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, খুব ছড়ানো বা খুব গোটানো হবে না, নিয়ন্ত্রিত হবে যাতে ফলস্বরূপ উৎপন্ন গতি ডিসকাসে চালিত করা যায়। শরীরের ওজন ডান পায়ের উপর থাকবে, কখনো-কখনো পায়ের পাতার মাংসল অংশের উপর থাকতে পারে। যে হাতে নিক্ষেপ করা হবে তা শরীরের বেশ পিছনে থাকবে, দৃষ্টি থাকবে পিছনে, মধ্যশরীর শটপাটের মতো বেশি ঝুঁকে থাকবে না।

নিক্ষেপ : বাঁ পা জায়গায় রেখে ডান পায়ের তাড়নায় ডিসকাস নিক্ষিপ্ত হয়, বাঁ পায়ের হাঁটু সামান্য ফাঁক থাকে। পায়ের, নিতম্বের, মধ্যশরীরের, কাঁধের, বাহুর, কবজির এবং মধ্যমা আঙুলের মাংসপেশিগুলি তাড়নায় পরিসর বাড়ানো সাহায্য করে। প্রায় কাঁধের রেখা বরাবর ডিসকাস নিক্ষেপ হয়, এই সময় বুক বেরিয়ে আসে এবং চিবুক ঊর্ধ্বে থাকে বেশি গতি পাওয়া সম্ভব যদি ডিস ও শরীরের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য বেশি হয়। তর্জনীর সাহায্যে ঘড়ির কাঁটার দিকে অপেক্ষাকৃত দ্রুত পাক খাওয়ানো হলে ডিসকাসের স্থিরতা বেশি হবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ঠিকমতো চাপ দেওয়া হলে ডিসকাসের ঘূর্ণন স্থিরতা আনয়ন করে।

বিপরীত ক্রিয়া : ডিসকাসের নিক্ষেপের পর ভারসাম্য রক্ষার জন্য এর দরকার হয়। ডিসকাস ছোঁড়ার পর ডান পা বৃত্তের সামনে বাঁ পা আড়াআড়িভাবে ফেলতে হবে। বাঁ পা পিছনে উপরের দিকে উঠে যাবে এবং হাঁটু কিছুটা ভাঁজ করে দেহের ভরকেন্দ্র কিছুটা নামিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

দীর্ঘলম্ফন (Long Jump)

উপকরণ : (১) ৩৫-৪৫ মিটার দীর্ঘ সমতল রানওয়ে, চওড়া ১.২২ মিটার।

(২) কাঠের তৈরি টেক অফ বোর্ড ১.২২ মিটার লম্বা, ২০ সেমি চওড়া এবং ১০ সেমি গভীর হবে।

(৩) প্লাস্টিকসাইন যা কিনা মাটির বাঁধ-এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। অথবা কাচের জানালায় ব্যবহৃত পুডিং নচেৎ যে-কোনো সাবান নরম করে ব্যবহার করা হয়।

(৪) ল্যান্ডিং এরিয়া সমতল নরম বালির তৈরি, দৈর্ঘ্য ৭ থেকে ১০ মিটার, চওড়া ২.৭৫ মিটার।

(৫) মাপার ফিতে।

কৌশল :

(ক) প্রারম্ভিক দৌড়

(১) টেক অফ বোর্ড-এর ৩০-৩৫ মিটার পিছন থেকে সাধারণত দৌড়ে শুরু করা হয়।

(২) দুটি পা সান্তরাল রেখে বা সামনে-পিছনে রেখে দৌড় শুরু করা হয়।

(৩) দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটু ভাঁজ করে কোমর সামনে ঝুঁকিয়ে দৌড় শুরু করা হয়।

(৪) টেক অফ বোর্ড অভিমুখে ধীরে ধীরে দৌড়ের গতি বৃদ্ধি করতে হবে।

(৫) দৌড়-এর সময় প্রতিটি পায়ের পদক্ষেপ এমনভাবে মাপ করে ফেলতে (Stride-length) হবে যাতে শক্তিশালী পা টেক অফ বোর্ডে স্থাপন করা যায় স্বাভাবিকভাবে।

(খ) মাটি ছেড়ে ওঠা :

১. শক্তিশালী পা টেক অফ বোর্ডে সম্পূর্ণভাবে স্থাপন করতে হবে।

২. এই সময়ে হাঁটু, পায়ের পাতা ল্যান্ডিং এরিয়ার দিকে থাকবে, শরীরের ওজন এই পায়ে আনতে হবে, হাঁটু ভাঁজ হবে, পিছনের পা মাটি ছেড়ে শূন্যে সোজা অবস্থায় থাকবে।

৩. দুই হাত দুলিয়ে সামনে তুলে উপরের দিকে যাবে।

৪. শক্তিশালী পা সঙ্গে সঙ্গে সোজা করতে হবে। একইসঙ্গে পিছনের পায়ের হাঁটু দুলিয়ে নিয়ে সামান উপরের দিকে নিতে হবে।

৫. শক্তিশালী পা-এর গোড়ালি থেকে পাতায় ওজন আনতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে টেক অফ বোর্ড ছেড়ে শরীর তুলতে হবে।

(গ) শূন্যে ভাসা বা অবস্থান :

১. টেক অফ পা মাটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দোলক পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে সামনে তুলতে হবে এবং এই সময় হাত পিছনে যাবে।

২. সঙ্গে সঙ্গে টেক অফ পা-এর হাঁটু ভাঁজ করে সামনের দিকে এদিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এবং বিপরীত হাত পিছন থেকে মাথার উপরের দিকে উঠবে।

৩. এইভাবে শূন্যে হাঁটতে হবে (Step-in-air), সঙ্গে সঙ্গে দুই পা সামনে এনে সোজা করে দুই পা জোড়া করে পাশাপাশি রাখতে হবে।

৪. হাত দুটি সঙ্গে সঙ্গে কানের পাশ থেকে সামনে পায়ের পাতার দিকে তাক করে হাঁটু বা পায়ের সমান্তরালভাবে রাখতে হবে।

(ঘ) মাটিতে নামা :

১. মাটিতে নামার আগের মুহূর্তে পা দুটো যতটা সম্ভব লম্বা করে মাটির সমান্তরাল রাখার চেষ্টা করতে হবে।

২. প্রথমে জোড়া গোড়ালি মাটি বা বালি স্পর্শ করবে।

৩. হাঁটু দুটোকে ভাঁজে করে, গোড়ালি থেকে শরীরের ওজন পাতায় নিতে হবে।

৪. হাঁটু ভাঁজ করার সঙ্গে সঙ্গে নিতম্ব সামনে গড়িয়ে নিতে হবে। হাত দুটি পাশে থাকবে।

৫. শরীর উপর অংশসহ মাথা সামনে আনতে হবে।

উচ্চলম্ফন (High Jump)

ফসবারি ফ্লপ (Fosbury flop) :

উপকরণ : ১। ফোমের তৈরি গদি

২। উচ্চলম্ফনের ক্রসবার ও একজোড়া খাড়া দণ্ড

৩। ২০ থেকে ২৫ মিটার দীর্ঘ সমতল ভূমি প্রয়োজন।

ফসবারি ফ্লপ শেখার কৌশল :

(ক) প্রারম্ভিক দৌড় (Approach Run)

১. যে পায়ে মাটি ছাড়া হবে (take off) ক্রসবারের দিকে ফিরে তার উলটো পাশ থেকে দৌড় শুরু হবে।

২. প্রারম্ভিক দৌড়ের দুটি অংশ—

(i) সরলরেখা—গতি বৃদ্ধি করার জন্য প্রথম দৌড় 5-6 মিটার সরলরেখায় হবে।

(ii) বক্র বা অর্ধবৃত্তাকার রেখা—শেষের 4-5 মিটার দৌড় হবে বৃত্তাকার পথে। অর্থাৎ দৌড়-পথ হবে অনেকটা ইংরেজি অক্ষর J-এর মতো।

৩. বৃত্তাকার পথে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপরি অংশ অর্থাৎ মাথা, কাঁধ কেন্দ্রের দিকে হেলানো অবস্থায় থাকবে।

৪. কেন্দ্রের দিকের হাতের তুলনায় বাইরের হাতের দোলন বেশি হবে।

৫. হাঁটু উপরের দিকে তুলে ছুটতে হবে।

(খ) মাটি ছাড়া (Take off)

১. যে পায়ে মাটি ছাড়া হবে সেই পা ক্রসবার থেকে দূরে থাকবে অর্থাৎ বাঁ পায়ে টেক অফ হলে ডান কাঁধ ও ডান পা ক্রসবারের কাছে থাকবে।

২. টেক অফ অঞ্চল : ক্রসবার থেকে 50/80 সেন্টিমিটার দূরে এবং নিকটতম খাড়া দণ্ড থেকে 50/80 সেন্টিমিটারের মতো ভিতরের দিকে হয়। লম্ফনের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর দূরত্ব বৃদ্ধি পায় এবং খেলোয়াড়ের উচ্চতা ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে।

৩. যে পায়ে টেক অফ বা মাটি ছাড়া হবে সেই পায়ের গোড়ালি প্রথমে মাটিতে আঘাত করবে। দেহের ভরকেন্দ্র পেছনদিকে রাখতে হবে।

৪. টেক অফ পায়ে শরীরের ওজন স্থানান্তরিত করতে হবে, হাঁটু ভাঁজ থাকবে, দুই হাত টেনে কনুই ভাঁজ অবস্থা থেকে উপরদিকে তুলতে হবে। অন্য পা অর্থাৎ দোলক পা-এর হাঁটু ভাঁজ করে বুকের দিকে তুলতে হবে।

৫. এই অবস্থা থেকে টেক অফ পায়ের আঙুলের উপর শরীরের ওজন তুলে আনতে হবে। পিঠটা ক্রসবারের দিকে চলে যাবে। মাথা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে, হাত দুটি তুলে, কোমর তুলে মাটি ছাড়া হবে। টেক অফ পা সোজা হয়ে যাবে।

(গ) **ক্রসবার ডিঙোনো বা পার করা (Clearance the cross Bar):**

১. হাত দুটি মাথার দুপাশে, মাথা ঘাড় থেকে পিছনে বাঁকিয়ে ক্রসবারের দিকে হাত নিয়ে (বাঁ পায়ে টেক অফ হলে ডান হাত) মাথা ও হাত প্রথমে ক্রসবার ডিঙোতে হবে।

২. তারপরেই পিঠটা বাঁকাতে হবে কোমর পর্যন্ত, অর্থাৎ অর্ধচক্রাকার হবে ক্রসবারের উপর, এইভাবে পিঠ ও কোমর ডিঙাতে হবে। এই অবস্থায় হাঁটু থেকে পা দুটি জোড়া করে ঝোলানো থাকবে মাটির দিকে।

৩. শেষ মুহূর্তে পা দুটি অতিক্রম করার সময় কোমর ক্রসবার অতিক্রম করার পরেই নিতম্ব জমির দিকে নামাতে হবে, হাত দুটি ও মাথা সামনের দিকে আনতে হবে, পা দুটি টেনে আকাশের দিকে তুলে বার অতিক্রম করতে হবে।

(ঘ) নীচে নামা (Landing) :

১. পা দুটি আকাশের দিকে, শরীর শূন্যে ভাসমান অবস্থায়।

২. হাত দুটি কানের পাশে, সোজা অবস্থায় থাকবে।

৩. মাথা তুলে পিঠ ও কোমর গদিতে ফেলতে হবে।

৪. পিঠ গদিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত এবং পা দুটি গদিতে পড়বে।

৫.৭.৫ দেশীয় খেলাসমূহ (Indigenous Games)

১) গোল্লা ছুট

একটি খোলা মাঠে ছয় থেকে আট/দশজন খেলোয়াড় থাকতে পারে। একটা ছোটো গর্ত খেলার কেন্দ্রস্থল। কিছু দূরে খানিকটা ইট-পাথর বা একটা গাছ হবে খেলার সীমানা বা নিশানা। গর্তটাকেই গোল্লা বলা হয়। গোল্লা থেকে ছুটে গিয়ে সীমানার শেষ কিংবা নির্ধারিত চিহ্ন ছোঁয়াই হলো এ খেলার মূল লক্ষ্য। যে পক্ষ প্রথম দান পায় তাদের দলনেতাকে গোল্লায় এক পা দিয়ে দাঁড়াতে হবে, অন্য পা যেখানে খুশি রাখতে পারবে। দলের বাকিরা পরপর হাত ধরাধরি করে তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকবে। দাঁড়াবার নিয়ম হলো, দলের প্রধানের হাত ধরে একজন যতটা পারে এগিয়ে যাবে, তারপর পরপর বাকিরা হাত ধরাধরি করে দাঁড়াতে হবে।

বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা চারপাশে ছড়িয়ে ওত পেতে থাকবে । ঘুরতে ঘুরতে প্রথম দলের একজন বা একাধিক খেলোয়াড় শিকল থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। তারপর তিরবেগে ছুটবে নিশানা লক্ষ্য করে।

বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়েরা চেষ্টা করবে সেই চিহ্নে ওই খেলোয়াড় পৌঁছোবার আগেই তাদের ছুঁয়ে দিতে ! কিন্তু প্রথম দলের একজনও যদি নিশানায় পৌঁছে যায় তবে তারা সেই দান জিতবে, আর তাদের সবাই যদি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোবার আগেই প্রতিপক্ষের হাতে ধরা পড়ে যায়, তবে তারা মোর হয়ে যায়। খেলোয়াড়েরা যতক্ষণ পরস্পরের হাত ধরাধরি করে গোল্লা ছুঁয়ে থাকে তখন কিন্তু বিপক্ষ দল তাদের ছুঁতে পারবে না, কারণ ওটা হলো নিরাপদ জায়গা। বরং অমন হাত ধরাধরি অবস্থায় গোল্লার দল যদি বিপক্ষ দলের কাউকে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে সে মোর হয়ে যাবে। গোল্লা থেকে বেরিয়ে খেলোয়াড়েরা যখন ছুটতে থাকে, তখনই তাদের ছুঁয়ে মোর করা যাবে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরলে খেলা হয় না, তাই সবাইকে ছুটতে হবে। এমন কি শেষ পর্যন্ত দলের দলনেতাকেও গোল্লা ছেড়ে ছুটতে হয়। এক দলের খেলা শেষ হবার পর অন্য দল দান পায়। এভাবে নির্ধারিত দান খেলার পর যে দলের পয়েন্ট বেশি হবে তারাই জিতবে।

২) বুলবুল হস্তক

খেলার উদ্দেশ্য : প্রতিবর্ত ক্রিয়া/সাড়াপ্রদানকালের উন্নয়নের অনুশীলন।

অঙ্গসঞ্চালনের সক্ষমতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা।

পদ্ধতি : খেলার শুরুতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের একটি হাত মাটিতে রেখে হাতের পাঁচটি আঙুল মাটিতে ছড়িয়ে বসবে। যে-কোনো একজন খেলোয়াড় প্রতিটি হাতে টোকা দিয়ে গুনতে থাকবে– হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, বুলবুল হস্তক। হস্তক শব্দটির টোকা যার হাতে গিয়ে পড়বে সে উঠে যাবে। এভাবে উঠে যাবার পর একজন যে অবশিষ্ট থাকবে সেই এই খেলার রক্ষণকারী। এরপর রক্ষণকারী তার ডান হাতের আঙুলগুলো মাটির উপরে টানটান করে তালুর সঙ্গে এক সরলরেখায় রেখে বাবু হয়ে বসবে। এরপর আক্রমণকারী অন্যসব খেলোয়াড়েরা পর্যায়ক্রমে রক্ষণকারী খেলোয়াড়ের মুখোমুখি একসঙ্গে বাবু হয়ে বসে ডান হাত ও বাঁ হাত রক্ষণকারী খেলোয়াড়ের হাতের দু-পাশে রেখে ডান দিক/বাঁদিক থেকে হাত স্পর্শ (চড় মারবার) করবার সুযোগ পাবে। এবং ওই সময় ছড়াটি বলবে–

তালে তালে দিই তালি
সুযোগ পাবি কি হাত সরাবি?

সর্বাধিক চারবার এই ধরনের সুযোগ পাওয়া যাবে। রক্ষণকারী সুযোগ বুঝে হাতটি সরিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। অর্থাৎ রক্ষণকারী যদি কোনো একবার হাত সরিয়ে নিতে সক্ষম হয় তাহলে আক্রমণকারী রক্ষণকারীর ভূমিকা পালন করবে। আর যদি পরপর চারবার আক্রমণকারী রক্ষণকারীর ডান হাত স্পর্শ করতে সমর্থ হয়, তাহলে রক্ষণকারীকে যে-কোনো একটি সাংস্কৃতিক দক্ষতা অভিপ্রদর্শন করতে হবে। এভাবে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খেলাটি চলবে।

৩) খাঁচার মধ্যে বাঘের মাসি, ধরতে পারে না।

'ছোটো পুতুল বড়ো পুতুল' কথাগুলো বলার সময় ছোট্টটি হয়ে ছোটো পুতুল এবং পায়ের পাতার উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বড়ো পুতুল হওয়ার ভঙ্গি করতে হবে। হা-হা করে হাসবে আর আনন্দে দুই হাত, মাথা ও শরীর নাড়িয়ে বলবে—'খাঁচার মধ্যে বাঘের মাসি ধরতে পারে না।' বাঘ রেগে গিয়ে গর্জন করে তেড়ে আসবে শিশুদের দিকে। কিন্তু বৃত্তের বাইরে যাবে না। বৃত্তের কেন্দ্রে আবার ফিরে এসে বলবে—'এই তোরা চুপ কর। আমি এখন ঘুমোচ্ছি। চিৎকার করলে মজা বুঝিয়ে দেবো।' শিশুরা একই ভঙ্গিতে আরও দুইবার বলবে—'ছোটো পুতুল..... পারে না।' একই ভঙ্গিতে বাঘ শিশুদের দিকে গর্জন করে ছুটে যাবে, কিন্তু বৃত্তের মধ্যেই থাকবে। কিন্তু তৃতীয়বার শিশুরা একই কথা বলার পর বাঘ জোরে হালুম হালুম গর্জন করে বলবে— 'আমার এখন খাবার সময় হলো, ধরত রে।' এই কথা বলে বড়ো এক লাফ দিয়ে বাঘ তার বৃত্ত বা গণ্ডির বাইরে শিশুদের তাড়া করবে। সব শিশুরা তাদের নিজেদের ঘর বা গণ্ডিটুকুতে পালিয়ে আসবে। পালাতে গিয়ে যে শিশু বাঘের কাছে ধরা পড়বে সে আবার বাঘের মাসি হয়ে বাঘের খাঁচা বা গণ্ডিতে গিয়ে বসবে। আর কেউ ধরা না পড়লে আগের বাঘের মাসি বা অন্য কেউ বাঘের মাসি হবে। এইভাবে খেলা চলবে।

৪) দাঁড়িয়াবান্ধা

উদ্দেশ্য: গতিবৃদ্ধি, প্রতিবর্ত ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়ার সময়।

খেলার পদ্ধতি: প্রতি দলে ৮ জন করে খেলোয়াড় থাকবে। একটি আয়তক্ষেত্রকে লম্বালম্বি দুটি ভাগে বিভক্ত করবার পর ওই আয়তক্ষেত্রটিকে আড়াআড়িভাবে সরলরেখা দ্বারা সাতটি ভাগে বিভক্ত করতে হবে। লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত সরলরেখায় একজন রক্ষক বা ডিফেন্ডার দাঁড়াবে, আর আড়াআড়িভাবে বিভক্ত সাতটি সরলরেখায় সাতজন রক্ষক দাঁড়াবে। এই খেলায় অন্য দলের

সকল খেলোয়াড় একটি ঘরে সমবেত হবে। ওই ঘরে সমবেত সকল দৌড়বাজ খেলোয়াড়েরা দাগে দাঁড়ানো রক্ষণকারী খেলোয়াড়দের ছোঁয়া বাঁচিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে চেষ্টা করতে হবে এবং রক্ষণকারী পাহারাদারেরা দাগে দাঁড়িয়ে তাদের ছুঁতে চেষ্টা করবে। রক্ষণকারীরা নিজেদের গ্যালারিতে দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে, সেইসঙ্গে পরবর্তী গ্যালারিতে দাঁড়ানো রক্ষক পর্যন্ত কেন্দ্রীর গ্যালারি দিয়েও দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে। যে ঘর থেকে খেলা শুরু হবে তার পাশের ঘরটির নাম নুনঘর। দৌড়বাজ খেলোয়াড়দের লক্ষ্য হলো যে ঘর থেকে খেলা শুরু করেছিল সমস্ত ঘর পরিক্রমা করে সেই ঘরে পৌঁছোনো। দৌড়বাজ খেলোয়াড়দের যে-কোনো একজন নুনঘর থেকে নুন নিয়ে সমস্ত ঘর পরিক্রমণ করে যে ঘর থেকে খেলা শুরু করেছিল যদি সেই ঘরে পৌঁছোতে পারে তাহলে গোটা দলটির জয় হয়। একে 'গাদি' খেলাও বলে। আর রক্ষণকারী পাহারাদারেরা যদি বিপক্ষ দলের দৌড়বাজদের একজনকেও ছুঁয়ে দিতে পারে তবে গোটা দলটিই মোর হয়ে যায়। তখন রক্ষণকারী ও দৌড়বাজরা নিজেদের মধ্যে অবস্থান বদল করবে।

৫) ইকড়ি- মিকড়ি

খেলার উদ্দেশ্য :

মনঃসংযোগ ও একাগ্রতার অনুশীলন,

শান্ত প্রকৃতির খেলা,

আঙুলের ব্যায়াম।

পদ্ধতি :

ইকড়ি-মিকড়ি-চাম-চিকড়ি

চামের কাটা মজুমদার

ধেয়ে এলো দামোদর।

দামোদরের হাঁড়িকুড়ি

দুয়ারে বসে চাউল কাঁড়ি

চাউল কাঁড়তে হলো বেলা

ভাত খায় সে দুপরবেলা।

ভাতে পড়ল মাছি

কোদাল দিয়ে চাঁছি ।

কোদাল হলো ভোঁতা

খ্যাঁকশিয়ালের মাথা ।

এটি একটি সামাজিক চরিত্রধর্মী খেলা । এই খেলার শুরুতে সবাই বৃত্তাকারে বসে তাদের দু-হাত উপুড় করে হাতের পাঁচটি আঙুল ছড়িয়ে সামনে মাটির উপরে রাখবে। এরপর একজন খেলোয়াড় তার বাঁ হাত একভাবে মাটিতে রেখে ডান দিক

থেকে এই ছড়া কেটে গণনা করতে শুরু করবে এবং যেখানে ছড়াটি শেষ হবে সেই আঙুলটি মুড়ে দিতে হবে। এইভাবে সবার সব আঙুলগুলো মুড়ে গেলেও যখন একজনের একটি আঙুল বাকি থাকে তখন সে বিজয়ী হয় ।

৫.৮ নিদ্রা ও বিশ্রামের গুরুত্ব (Importance of Sleep and Rest)

একজন ব্যক্তির কাছে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টিকর খাদ্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি বিশ্রাম ও নিদ্রাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শরীর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তার অভ্যন্তরস্থ অঙ্গ ও তন্ত্রগুলিরও বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। তাই সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রামের দরকার এবং এই বিশ্রামের জন্য ৬-৮ ঘন্টা গভীর ঘুমের প্রয়োজন, যা সেই ব্যক্তিকে দেহের ক্ষয়পূরণ ও পরবর্তীকাজে মনোযোগী হতে সাহায্য করে।

নিদ্রা ও বিশ্রামের নিয়মাবলী

ক) নিদ্রা বা বিশ্রামের জন্য খোলামেলা জানালা ও আলোবাতাসপূর্ণ ঘর হওয়া প্রয়োজন।

খ) প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী ঘুমানো উচিত।

গ) ঘুমানোর অন্তত এক ঘন্টা আগে খাবার খাওয়া উচিত এবং খাবার খাওয়ার পর একটু হাঁটাচলা করার পর বিছানায় যাওয়া উচিত।

ঘ) ঘুমানোর সময় একটি নির্দিষ্ট পোশাক হওয়া উচিত যাতে কখনই শরীরের সমস্যার সৃষ্টি না হয়।

ঙ) নিদ্রার সময় মশারি অবশ্যই টাঙানো উচিত যাতে করে মশা-মাছি, পোকা-মাকড় ইত্যাদি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে।

চ) যদি কোন ব্যক্তির ঘাড়ের সমস্যা থাকে তাহলে তাকে অপেক্ষাকৃত একটু শক্ত বিছানা ও বালিশ ছাড়া ঘুমানোর অভ্যাস করা উচিত।

ছ) বেশী রাত করে পড়াশুনা করা বা টিভি দেখা উচিত নয় যাতে ব্যক্তিটির ঘুমের সময় কমে গিয়ে শরীরে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৫.৯ দেহভঙ্গী (Posture)

দেহ ভঙ্গিমা হলো পারিপার্শিক পরিবেশের সাপেক্ষে দেহের অবস্থান। দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুসামঞ্জস্য রাখাকে সাধারণভাবে দেহভঙ্গিমা বলে, কিন্তু দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলির অঙ্গসংস্থানগত (Anatomical) নিয়মানুযায়ী আকার, বাঁক ও আয়তনের যখন বিচ্যুতি ঘটে তখন স্বাভাবিক দেহভঙ্গি বজায় রাখা সম্ভব হয় না। ফলে দাঁড়ানো, হাঁটা বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। যাকে দেহভঙ্গিমার বিকৃতি বলা হয়ে থাকে। সাধারণ দেহভঙ্গিমার বিকৃতিগুলি দেহের গঠনের উপর নির্ভর করে। দৈহিক বিকৃতি জন্মগত বা অর্জিত হতে পারে, এছাড়া দৈহিক বিকৃতির কারণগুলি হলো দুর্ঘটনা, অপুষ্টি, হাঁটাচলা ও ঘুমানোর কুঅভ্যাস ইত্যাদি।

দেহভঙ্গিমার বিকৃতি দূরীকরণের ব্যায়াম (Remedial Measures for Postural Deformities)

হাঁটা, বসা, দাঁড়ানো, দৌড়োনো শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক অঙ্গসঞ্চালনের অংশ। এই কাজটি সঠিকভাবে না করার ফলে মানবদেহে কিছু কিছু স্বাভাবিক বিকৃতি দেখা যায়। এছাড়া অন্যান্য কারণেও এই বিকৃতি আসতে পারে, তবে তা দূর করবার সঠিক পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে।

(ক) ফ্ল্যাট ফুট ঃ পায়ের তলার সাধারণ বাঁক থাকে না বা কম থাকে এবং খালি পায়ে দাঁড়ালে পায়ের তলার প্রায় বেশিরভাগ অংশই মাটি স্পর্শ করে।

পূর্ব সতর্কতা ঃ (১) স্থূলত্ব কমানো উচিত, (২) শিশুদের বেশিক্ষণ না হাঁটানো, (৩) উপযুক্ত জুতো ব্যবহার করা উচিত, (৪) শিশুদের ভারী ওজন বহন না করা উচিত।

কারণ ঃ (১) স্থূলাকার দেহ, (২) অনুপযুক্ত জুতোর ব্যবহার, (৩) পায়ের দুর্বল মাংসপেশি, (৪) দ্রুত শরীরের ওজন বৃদ্ধি, (৫) দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে কাজ করা, (৬) অতিরিক্ত ভারবহন ইত্যাদি।

(১) গোড়ালির উপর ভর দিয়ে হাঁটা।

(২) বালির উপর হাঁটা।

(৩) মেঝেতে তোয়ালে পেতে দিয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে গোটানো।

(৪) মাটিতে কাচের গুলি ছড়িয়ে রেখে পায়ের আঙুল দিয়ে তুলে তুলে একটি পাত্রে রাখা।

(৫) নিয়মিত বজ্রাসন অভ্যাস করা।

(খ) নক-নি ঃ দু-হাঁটু স্পর্শ জাতীয় ত্রুটি। পায়ের, বিশেষভাবে ঊরু ও হাঁটুসন্ধির ত্রুটিপূর্ণ গঠনের ফলে হয়।

পূর্ব সতর্কতা ঃ (১) শিশুর স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে শেখার আগে জোর করে হাত ধরে হাঁটার উপর জোর না দেওয়া, (২) উপযুক্ত সুষম খাদ্যগ্রহণ।

কারণ ঃ (১) শৈশবে অতিরিক্ত ভারবহনের কাজ করা। (২) চ্যাটালো পায়ের তল, (৩) স্থূলকায় দেহ, (৪) দীর্ঘদিনের অসুস্থতা, (৫) পুষ্টির অভাব, বিশেষ করে ভিটামিন 'ডি', ক্যালশিয়াম এবং ফসফরাস, (৬) রিকেট।

(১) শুয়ে দু-হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা দুটো পরস্পর লাগিয়ে উপরে তুলতে হবে।

(২) দু-হাঁটুর মাঝখানে বালিশ রেখে হাঁটা।

(৩) নিয়মিত পদ্মাসন ও গোমুখাসন অভ্যাস করা।

(৪) পায়ের পাতার বাইরের অংশের উপর ভর দিয়ে হাঁটা।

(৫) কড লিভার তেল মালিশ বিশেষ উপকারী।

(গ) বো-লেগ ঃ দু-পায়ের পাতা পাশাপাশি রেখে দাঁড়ানো অবস্থায় দু-হাঁটু ধনুকের মতো বেঁকে যায়।

পূর্ব সতর্কতা ঃ (১) শিশুকে খুব কম বয়সে হাঁটাতে না শেখানো, (২) শিশুর উপর অতিরিক্ত ভার না চাপানো।

কারণ ঃ (১) ভিটামিন 'ডি', ক্যালশিয়াম এবং ফসফরাসে অভাব, (২) অতিরিক্ত ভারবহন, (৩) খুব কম বয়সে হাঁটতে শেখানো, (৪) হাঁটার কু-অভ্যাস, (৫) শিশুর প্রতি অযত্ন।

(১) পায়ের পাতার ভিতরের দিক টিপে হাঁটার অনুশীলন।

(২) সুষম খাদ্যগ্রহণ ও ভিটামিন ডি-যুক্ত খাদ্যগ্রহণ।

(ঘ) গোলাকার কুঁজযুক্ত পিঠ (কাইফোসিস)ঃ মেরুদণ্ডের উপরের দিকের অংশ অস্বাভাবিক সামনের দিকে বেঁকে যাওয়ার ফলে এই ত্রুটি দেখা যায়।

পূর্ব সতর্কতা ঃ (১) কম বয়সে দেহে চর্বি জমা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন, (২) ক্ষমতা অনুযায়ী ওজন বহন করা, (৩) নিয়মিত সুষম খাদ্যগ্রহণ।

কারণ ঃ (১) অপুষ্টি, (২) বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব, (৩) ব্যায়ামের প্রতি অবহেলা, (৪) কাঁধে অতিরিক্ত ভারবহন, (৫) দুর্বল মাংসপেশি এবং সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ার অভ্যাস, (৬) বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন টিউবারকুলোসিস, সেরিব্রাল পালসি, (৭) মেরুদণ্ডের সংক্রমণ ইত্যাদি।

(১) চক্রাসন, হলাসন, ভুজঙ্গাসন।

(২) সোজা হয়ে হাঁটা, চলাফেরা ও দাঁড়ানো।

(৩) পড়তে বসার সময় সঠিক উচ্চতার সঠিক আকারের চেয়ার টেবিল ব্যবহার করা।

(৪) শোয়ার সময় পিঠের নীচে বালিশ রাখতে হবে।

(৫) কাঁধের সমান্তরালে হাত প্রসারণ করে কনুই থেকে ভাঁজ করে পিছনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৫.১০ যোগশিক্ষা (Yoga Education)

যোগ : ভারতীয় ঐতিহ্য

সারা বিশ্ববাসীর কাছে অতি পরিচিত 'যোগ' আজ থেকে প্রায় ৬০০০ বছর আগে ভারতীয়দের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন যে পদ্ধতির মাধ্যমে শরীর ও মনের সঠিক সমন্বয় ঘটানা সম্ভব, তাই হলো যোগ। যোগ (Yoga) শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'য়ূজ' (Yuj) শব্দ থেকে, যার মানে যুক্ত করা (union in to unite)। 'যোগ' (+) মানে জোড়া বা যুক্ত করা। ৩ + ২ = ৫, অর্থাৎ ৩-এর সঙ্গে ২ যুক্ত হয়ে যেমন ৫ হয়, ঠিক সেইভাবে শরীরের সঙ্গে মন যুক্তহয়ে (শরীর + মন) = সুস্থ মানবদেহ) সুস্থ ও সুন্দর মানবদেহ গঠিত হয়। শরীর ও মন সমন্বয় সাধনই হলো যোগ-এর প্রধান লক্ষ্য।

যোগ কোনো ধর্ম নয়। এটি হলো একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আত্মশক্তির উপলব্ধি ঘটে, উন্মেষ ঘটে আত্ম চেতনার। সমস্ত ধর্মের মধ্যে আছে এই আত্মশক্তির উপলব্ধি ও আত্মচেতনার উন্মেষের কথা। যোগ একজন মানুষের আত্মচেতনার উন্মেষ

ঘটিয়ে সমাজের আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে।

অষ্টাঙ্গ যোগা (Ashtanga Yoga)

অষ্টাঙ্গ যোগ-এর আটটি ধাপ আছে। এই ধাপগুলি একের পর এক শরীর ও মনের বিশুদ্ধিকরণ ঘটায়। একে বলা হয় অষ্টাঙ্গ যোগ। অষ্টাঙ্গ যোগের ভাগগুলি হলো—

১. ইয়ম্ ২. নিয়ম ৩. আসন ৪. প্রাণায়াম ৫. প্রত্যাহার ৬. ধারণা ৭. ধ্যান ৮. সমাধি।

১। **ইয়ম :** ইয়ম্ হলো সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা, যা পাঁচটি অভ্যাসের দ্বারা সংগঠিত হয়।

(i) অহিংসা : কাউকে হিংসা না করা।

(ii) সত্য : সর্বদা সত্য কথা বলা।

(iii) অস্থেয় : অপরের জিনিস চুরি না করা

(iv) ব্রহ্মচর্য : অবিবাহিত অবস্থায় থাকা।

(v) অপরিগ্রহ : সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করা।

২। **নিয়ম :** নিয়মের মাধ্যমে পাঁচটি আচরণ মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হলো—

(i) শৌচ — পরিচ্ছন্নতা।

(ii) সন্তোষ — তৃপ্তি।

(iii) তপ — তপস্যা।

(iv) সাধ্যায় — শাস্ত্র পাঠ

(v) ঈশ্বর পরিধান — ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ।

৩। **আসন :** অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় ধাপটি হলো আসন। যে নির্দিষ্ট শারীরিক ভঙ্গিমা স্থিরভাবে ধারণের মাধ্যমে সুখ অনুভব করা যায়, তাকে আসন বলে। আসন তিন প্রকারে হয়ে থাকে। যথা—

(i) শারীরিক সুস্থতা প্রদানকারী আসন—হলাসন, ভূজঙ্গাসন, সলভাসন, চক্রাসন ইত্যাদি।

(ii) মন সংযোগকারী আসন — পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, বীরাসন, সুখাসন ইত্যাদি।

(iii) আরামপ্রদানকারী আসন। শবাসন ও মকরাসন। আসন অভ্যাস যেমন শারীরিক সুস্থতা প্রদান করে, তেমনি উচ্চতর যোগাভ্যাসের জন্য শরীর ও মনকে তৈরি করে।

৪. **প্রাণায়াম :** প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা মানব শরীরের প্রধান প্রাণশক্তিকে উদ্দীপিত ও পরিচালিত করা হয়। প্রাণায়াম হলো নিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মনোসংযোগের একটি পদ্ধতি। প্রাণায়াম অভ্যাস করা হয় তিনটি ধাপে। প্রথম ধাপটি হলো—পূরক। এই ধাপে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শ্বাসবায়ু গ্রহণ (প্রশ্বাস) করা হয়। দ্বিতীয় ধাপ কুম্ভকে শ্বাসকে শরীরের মধ্যে ধরে রাখা হয়, এবং তৃতীয় ধাপ রেচকে অতি ধীরে ধীরে শ্বাসবায়ুকে বাইরে ছাড়া হয়। এই তিনটি ধাপ অভ্যাসের জন্য সময়ের অনুপাত হলো পূরক : কুম্ভক : রেচক = ১ : ৪ : ২ অর্থাৎ ১০ সেকেন্ড ধরে শ্বাসবায়ুকে ত্যাগ করতে হবে। প্রাণায়াম এক প্রকার শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত ব্যায়াম (Breathing Exercise)। এর দ্বারা শ্বসন তন্ত্রের বিভিন্ন রোগ দূর হয়। কয়েকটি অতি প্রচলিত প্রাণায়ামের নাম হল উজ্জয়ী, অনুলোম-বিলোম, শিতকারী, শিতলী, ভ্রামরী ইত্যাদি।

৫। **প্রত্যাহার :**প্রত্যাহার হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ। বহির্জগতে সৃষ্ট উদ্দীপনা গৃহীত হয় আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত উদ্দীপনা বিশ্লেষণের জন্য স্নায়ুকোশ দ্বারা বাহিত হয়ে মস্তিষ্কে যায়। মস্তিষ্কে উদ্দীপকের সম্পর্কে এক অনুভূতি জন্মায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। এই কর্মপ্রেরণা চিত্ত বা মনকে চঞ্চল করে তোলে। যাকে 'চিত্ত বিক্ষেপ' বলে। চিত্ত বিক্ষেপ আত্মোপলব্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যাহারের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে আত্মোপলব্ধির জন্য তৈরি হওয়া যায়।

৬। **ধারণা :** অষ্টাঙ্গযোগে প্রত্যাহারের পরবর্তী ভাগ হলো ধারণা। মনকে কোনো একটি বিন্দুতে স্থিরভাবে ধরে রাখাকে ধারণা বলে। পার্থিব সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, চাওয়া-পাওয়া থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মননিবেশ করাই হল ধারণার লক্ষ্য।

৭। ধ্যান : দীর্ঘ সময় 'ধারণা' অবস্থা ধরে রাখাকে ধ্যান বলে। এই অবস্থায় কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে দীর্ঘ সময় ধরে মন সংযোগ করা সম্ভব হয়। ধ্যানবস্থায় স্থান, কাল ও সময়ের কোনো অনুভবই থাকে না।

৮। **সমাধি :** এটি হলো অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তিম ধাপ। দেহ ও মনের পূর্ণ সমন্বয় ঘটে সমাধি পর্যায়ে। এই পর্যায়ে মন পার্থিব সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সমস্ত কিছু থেকে দূরে থাকে।

যোগের শ্রেণি-বিভাগ :

ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী যোগা প্রধানত সাত প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—

১.কর্মযোগ, ২. জ্ঞানযোগ, ৩. হঠযোগ, ৪. রাজযোগ, ৫. মন্ত্রযোগ, ৬. লয়যোগ, ৭. ভক্তিযোগ।

১. **কর্মরোগ :** কর্মযোগ হলো কর্মের যোগ। এটি হলো প্রথম এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যোগাভ্যাস যার মাধ্যমে আমরা যোগের পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারি। কর্ম হলো কাজ যা আমরা সচেতন বা অচেতনভাবে সম্পাদন করি। এই কর্মের সূত্রগুলি প্রত্যেকটি সৃষ্টির বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কর্মই হলো জ্ঞান যা ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে। এই কর্ম সম্পাদিত হয় বুদ্ধি চিন্তা ও উপলব্ধির দ্বারা। এই কর্মের দ্বারাই আমরা বস্তুকেন্দ্রিক এই পার্থিব জগতকে সুন্দরভাবে ভোগ করতে পারি। এই কর্মযোগের লক্ষ্য হলো একজন ব্যক্তিকে ধ্যানকেন্দ্রিক সচেতনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

২. **জ্ঞানযোগ :** জ্ঞানযোগ হলো জ্ঞানের যোগ। এই যোগের উদ্দেশ্য হলো ধ্যানমূলক অবস্থাকে আয়ত্ত করা। এই যোগ আমাদেরকে অভ্যন্তরীণ সত্তার কাছে নিয়ে যায় এবং আমাদের বৌদ্ধিক সত্তাকে জাগ্রত করে। এটি হলো আত্মানুসন্ধানের যোগ যার দ্বারা আমরা আমাদের শক্তি এবং সামর্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি।

৩। **হঠযোগ :** এটি একটি অতি সাধারণ যোগ। এর মাধ্যমে আমরা শারীরিক ও মানসিক পুরিশুদ্ধতা ও ভারসাম্য লাভ করতে পারি। হঠযোগের সাহায্যে খাদ্যভ্যাস জনিত কারণে শরীরের মধ্যে জমে থাকা বিষাক্ত পদার্থগুলিকে আমরা বর্জন করতে পারি ও অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির কার্যগুলিকে সচল করতে পারি।

৪। **রাজযোগ :** রাজযোগ হলো যোগের রাজা। এটি উচ্চতম যোগ। এই যোগের উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত করা। এই যোগকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—(i) বহিরঙ্গ যোগ ও (ii) অন্তরঙ্গ যোগ। বহিরঙ্গ যোগ বাহ্যিক সত্তাকে পরিবর্তন ও পরিবর্জন ঘটায়। অন্তরঙ্গ যোগ মানসিক জগৎকে পরিপূর্ণতা দেয়।

৫। **মন্ত্রযোগ :** মন্ত্রযোগ বা জপযোগ মনকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে। এই যোগ আধ্যাত্মিক অভ্যাসের সঙ্গে মনকে যুক্ত করে। আমাদের মানসিক শক্তির দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের মনকে বন্ধনে লিপ্ত করে। প্রথমটি হল impurity বা অপরিত্রতা এবং দ্বিতীয়টি হলো Vikshepa বা বিক্ষিপ্ত হওয়া। এদের কাজ হলো মনকে পার্থিব বিষয়ে আবদ্ধ করা ও মনকে বিক্ষিপ্ত করা। মন্ত্রযোগের কাজ হলো মনকে জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত করা।

৬। **লয়যোগ :** লয়যোগ ক্রিয়া ও কুণ্ডলিনী যোগের সমার্থক। এই যোগ আরও বেশি ধ্যানমূলক। এর উদ্দেশ্য শক্তি বা Energy কেন্দ্রকে জাগ্রত করা।

৭। **ভক্তিযোগ :** সুগভীর ভক্তিভাব ভক্তিযোগের একটি প্রক্রিয়া। ভক্তিভাবের প্রকৃতি অনুসরণকারী অপরাধবোধ এবং অহংবোধের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। একজন প্রকৃত ভক্তিযোগীকে জাগতিক দুঃখ বা আনন্দ প্রভাবিত করতে পারে না। তিনি অজাতশত্রু। কোনরকম অন্যায়, লোভ, হঠকারিতা, ঈর্ষা বা নিষ্ঠুরতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তার হৃদয় হয় শুদ্ধ এবং তিনি প্রকৃত সজ্জন বলে বিবেচিত হন।

শিশুস্বাস্থ্যে যোগার ভূমিকা (Benefit of Yoga)

নিয়মিত যোগ অভ্যাসের উপকারিতা স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সুস্থ জীবনযাপনে যোগ-এর গুরুত্ব অপরিসীম কারণ যোগ-এর সঙ্গে মানুষের জীবনও নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। মানুষের জীবনে যোগ-এর বিভিন্ন প্রভাবগুলি হলো —

দেহ-ভঙ্গিমার উন্নতি : নিত্য আসন অভ্যাসে শরীরের দুর্বল মাংসপেশি ও অন্যান্য অঙ্গগুলিকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করে তোলে। দেহকে সুন্দর ও সুঠাম করে গড়ে তোলে। বিভিন্ন দেহ-ভঙ্গিমার বিকৃতিগুলি থেকে (কাইফোসিস, স্কেলিওসিস বো-লেগ ইত্যাদি) মুক্ত হতে সাহায্য করে।

শারীরবৃত্তীয় প্রভাব : হৃৎপিন্ডের কর্মক্ষমতা ও ফুসফুসের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে এবং পরিপাক তন্ত্রের উন্নতি ঘটে।

শারীবৃত্তীয় সুবিধা :

১. অনিদ্রা দূরীভুত হয়।

২. রোগ সংক্রমণ থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায়।

৩. ওজন স্বাভাবিক থাকে।

৪. দেহভঙ্গিমার উন্নতি হয়।

৫. সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৬. পেশির নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়।

৭. শ্বসনহার হ্রাস পায়।

৮. রেচনতন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৯. হৃদ্‌স্পন্দনের হার হ্রাস পায়।

১০. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে।

১১. শারীরিক ব্যথার নিরাময় হয়।

১২. পরিপাক তন্ত্রের কার্যক্ষমতার উন্নতি হয়।

১৩. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৪. হাত-চোখের সমন্বয়ের উন্নতি হয়। অস্থিসন্ধির প্রসারণশীলতা সর্বোচ্চ হয়।

১৫. দক্ষতার উন্নতি হয়।

১৬. হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১৭. স্নায়ুতন্ত্রের উন্নতি ঘটে ফলে স্নায়বিক ও মানসিক দুর্বলতার অবসান ঘটে।

১৮. শিরা, উপশিরা, মাংসপেশি গ্রন্থি এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাংশের মধ্যে সমন্বয় ঘটে, এর ফলে শরীরের কার্যকারিতার উপর মনের প্রভাব বিস্তার করা সহজ হয়।

১৯. মানসিক রোগীদের ক্ষেত্রে যোগাসন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মনঃসংযোগকারী আসন (পদ্মাসন, বীরাসন), প্রাণায়াম (উজ্জয়ী, অনুলোম, বিলোম) এবং আরাম প্রদানকারী আসনের (শবাসন, মকরাসন) দ্বারা আমরা মানসিক রোগীদের সারিয়ে তুলতে পারি।

মনের উপর প্রভাব : স্নায়বিক ও মানসিক দুর্বলতার অবসান ঘটে। আত্মসংযম বৃদ্ধি পায় ও সংযত মনোভাবের ফলে মানসিক শক্তির উন্নতি ঘটে এবং জীবন আনন্দময় হয়। ধ্যান, ধারণা, একাগ্রতা ও চেতনার বিকাশ ঘটে থাকে।

শিশুদের উপযোগী কয়েকটি যোগাসন (Yogasana for Children)

১) তালাসন

এই আসনে আমাদের শরীর তালগাছের মতো আকৃতি ধারণ করে বলে এই আসনকে তালাসন বলা হয়।

অভ্যাসের পদ্ধতি

প্রারম্ভিক অবস্থা : শরীরের পাশে হাত রেখে পা জোড়া অবস্থায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে থাকবে।

(১) হাত দুটোকে সোজা অবস্থায় কাঁধের সমান উচ্চতায় তুলতে হবে। দুটি হাতের চেটো মুখোমুখি থাকবে।

(২) হাত দুটোকে সোজা অবস্থায় ধরে রাখার পর আসনটি ছাড়ার সময় প্রথমে গোড়ালি মাটিতে রাখতে হবে। পরে হাত দুটোকে শরীরের পাশে নিয়ে আসতে হবে।

সময়কাল : মনে মনে দশ গোনা পর্যন্ত অভ্যাস করার পরে ক্রমশ ধীরে ধীরে তিরিশ পর্যন্ত গোনা বাড়াতে হবে। এইভাবে দু-তিনবার অভ্যাস করা যেতে পারে।

নিষেধ : যাদের গোড়ালিতে ব্যথা বা পায়ের পাতাতে ব্যথা আছে তাদের এই আসন অভ্যাস করা উচিত নয়।

উপকারিতা : (১) এই আসন উচ্চতা বাড়াতে সাহায্য করে। (২) পায়ের পেশিকে সবল করে তোলে। (৩) মেরুদণ্ডের ব্যথা দূর করে।

২) অর্ধকূর্মাসন

অভ্যাসের পদ্ধতি

প্রারম্ভিক অবস্থা : দুটো পা সামনের দিকে মেলে বসতে হবে।

(১) হাঁটু গেড়ে পায়ের পাতার উপর দুটো গোড়ালির মাঝে বজ্রাসনে বসতে হবে।

(২) এরপর হাত দুটোকে সোজা করে উপরে তুলে নমস্কারের ভঙ্গিতে জোড়া করতে হবে।

(৩) দুটো হাত দু-পাশের কানের সঙ্গে লেগে থাকবে।

(৪) এরপর কোমরের কাছ থেকে ভেঙে সামনে ঝুঁকে প্রণাম করতে হবে।

(৫) কপাল মাটিতে ঠেকে থাকবে।

(৬) পেট ও বুক উরুর সঙ্গে লেগে থাকবে।

(৭) এই অবস্থায় লক্ষ রাখতে হবে নিতম্ব যেন গোড়ালিতে লেগে থাকে।

(৮) কিছুক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থায় আসনটি ধরে রাখার পর আস্তে আস্তে প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসতে হবে।

সময়কাল : এই অবস্থায় মনে মনে দশ পর্যন্ত গুনতে হবে, ধীরে ধীরে তিরিশ পর্যন্ত গোনা বাড়াতে হবে।

নিষেধ : যাদের মেরুদণ্ডের ব্যথা, চোখের হাই পাওয়ার তাদের যোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া এই আসন অভ্যাস করা উচিত নয়।

উপকারিতা :

১. পেটের রোগ— কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয়, ক্ষুধামান্দ্য দূর করে।

২. হাঁপানি রোগে যারা ভোগে তাদের পক্ষে এটি একটি উপকারী আসন।

৩. হাঁটু ও মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধির নমনীয়তা বাড়াতে সহায়তা করে।

৩) অর্ধশলভাসন

সংস্কৃতে 'শলভ' কথার অর্থ হলো পঙ্গপাল। এই আসন অভ্যাসের সময় দেহভঙ্গিমা কিছুটা পঙ্গপালের মতো হয় বলে, এই আসনকে অর্ধশলভাসন বলে।

অভ্যাসের পদ্ধতি

প্রারম্ভিক অবস্থা : থুতনি মাটিতে লাগিয়ে উপুড় হয়ে শুতে হবে। পা জোড়া অবস্থায় সোজা থাকবে। হাত শরীরের পাশে থাকবে। হাতের চেটো উপরের দিকে থাকবে।

(১) প্রথমে ডান পায়ের হাঁটুকে সোজা রেখে যতটা সম্ভব পা-টিকে মাটি ছেড়ে উপরের দিকে তুলতে হবে। পা সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছোনোর পর ওই অবস্থাটাকে কিছু সময় ধরে রাখতে হবে। (২) আস্তে আস্তে উপরে তোলা পা মাটিতে রাখতে হবে। (৩) এইভাবে বাঁ পা-টিকে মাটি ছেড়ে উপরে তুলতে হবে এবং অন্তিম অবস্থায় কিছু সময় ধরে রাখতে হবে। (৪) আস্তে আস্তে পূর্ব অবস্থায় পা ফিরিয়ে আনতে হবে।

সময়কাল : আসনের অন্তিম অবস্থায় মনে মনে দশ পর্যন্ত গুনতে হবে। ক্রমশ সময়সীমা বাড়িয়ে তিরিশ পর্যন্ত গুনতে হবে।

নিষেধ : কোমর ও মেরুদণ্ডের ব্যথায় যারা ভুগছে তাদের এই আসন অভ্যাস করা উচিত নয়।

উপকারিতা : (১) এই আসন অভ্যাসের ফলে কোমরের পেশিগুলোর শক্তি বৃদ্ধি পায়। (২) পায়ের ও পেটের পেশিসমূহকে সবল করে। (৩) পেটের মধ্যস্থিত অঙ্গগুলোকে সুস্থ রাখে।

৪) পদহস্তাসন

প্রথম পদ্ধতি :

১. দু-পা জোড়া করে দাঁড়াতে হয়।

২. এরপর দু-হাত উপর দিকে তুলে কানের পাশে ঠেকিয়ে রাখতে হয়।

৩. আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুঁকে দু-হাতের তালু পায়ের আঙুলের সামনে মাটিতে রাখতে হয় এমনভাবে যাতে পায়ের বুড়ো আঙুল ছুঁয়ে থাকে।

৪. কপাল দু-হাঁটুর মাঝখানে ঠেকিয়ে রাখতে হয়।

৫. হাঁটু সোজা রাখতে হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি :

১. প্রথম পদ্ধতির মতো সামনে ঝুঁকে দু-হাত দিয়ে পায়ের পিছনের গোড়ালির উপরটা ধরতে হয়, এবং পেট, বুক উরুর সঙ্গে লাগাতে হয়।

২. কপাল পায়ে ঠেকাতে হয়।

৩. হাঁটু সোজা রাখতে হয়।

উপকারিতা :

ডায়াবেটিস, ক্ষুধামান্দ্য, পেটের অসুখ, অজীর্ণ, সায়েটিকা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, কোলাইটিস, পেটে মেদ, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, লম্বা হওয়ার প্রয়োজনে ও সাইনুসাইটিস ইত্যাদিতে এই আসনটি ভীষণ উপকারী।

৫) অর্ধচন্দ্রাসন

প্রথম পদ্ধতি :

১. দু-পা জোড়া করে দাঁড়াতে হয়।

২. এরপর দু-হাত মাথার ওপর তুলে এক হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে অপর হাতের বুড়ো আঙুল জড়িয়ে ধরতে হয়।

৩. এবার আস্তে আস্তে পিছনে শরীরটাকে যতটা সম্ভব বেঁকাতে হয়।

৪. লক্ষ রাখতে হয় দু-পা যেন সোজা থাকে।

উপকারিতা :

এই আসন করার ফলে কাঁধ ও কোমরের বাতের যন্ত্রণার উপশম হয়। পেট ও কোমরের চর্বি কমতে সাহায্য করে। উপকার হয় কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগীদের। বুকের খাঁচার গঠনেও এই আসন ভীষণ উপকারী। কোমরের ব্যথা ও পেশির দুর্বলতা রোধ করতে এই আসনটি ভীষণভাবে সাহায্য করে।

৬) উৎকটাসন

শ্বাসক্রিয়া : শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক। যেমন আমরা শ্বাস নেওয়া-ছাড়া করে থাকি তেমনভাবেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়।

প্রথম পদ্ধতি :

১. প্রথমে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়।

২. তারপর দু-হাত কাঁধ বরাবর তুলতে হয় যেন মাটির সঙ্গে সমান্তরাল থাকে।

৩. আস্তে আস্তে চেয়ারে বসার ভঙ্গিতে অর্ধেক বসতে হয়।

৪. মেরুদণ্ড যতটা সম্ভব সোজা রাখতে হয়।

৫. বুক যেন সামনের দিকে বেশি ঝুঁকে না যায়।

উপকারিতা :

হাঁটুর ব্যথা, ঊরুর পেশির ব্যথা, পায়ের কবজির ব্যথায় এই আসনটি খুব উপকারী। এই আসনটি হাত ও পায়ের পেশির দুর্বলতা দূর করে। বাচ্চাদের গ্রোথ পেন, অল্প হাঁটতে গেলে ব্যথায় এই আসনটি বিশেষ উপকারী। এছাড়া বাচ্চাদের পেশি মজবুত রাখতে সাহায্য করে।

৭) মণ্ডুকাসন

শ্বাসক্রিয়া : শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক। মানুষ যেভাবে প্রতিনিয়ত শ্বাস নেয় এবং শ্বাস ছাড়ে তেমনভাবেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়। কখনও শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হবে না।

প্রথম পদ্ধতি :

১. প্রথমেই বজ্রাসনে বসতে হয়।

২. হাঁটু দুটো যতটা সম্ভব ফাঁক করতে হয়।

৩. এবার গোড়ালি ও পায়ের পাতা দুটো ফাঁক করে নিতম্ব দু-পাশে রেখে মাটিতে বসতে হয়।

৪. দু-পায়ের বুড়ো আঙুল পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করবে।

৫. দুটো হাত দু-হাঁটুর উপর সোজা করে রাখতে হয়।

৬. শিরদাঁড়া সোজা থাকবে।

উপকারিতা :

পায়ের মাংসপেশির ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা হতে দেয় না। পায়ের পেশির দুর্বলতা দূর করে। গোড়ালির সচলতা বৃদ্ধি করে। পায়ের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে। ফলে পায়ের পেশি মজবুত হয়। বজ্রাসনের মতো পেট টানটান থাকে বলে শ্বাসক্রিয়াও ভালো হয়।

আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—২ (Cheek your progress-2)

(ক) তিনটি প্রথামুক্ত খেলার নাম লিখুন

উঃ .....।

(খ) ভলিবলের মাঠের মাপ কত?

উঃ .....।

(গ) ইয়ম্ বলতে কি বুঝি?

উঃ .....।

৫.১১ সারসংক্ষেপ (Let us sum up)

সারাংশ: এই পাঠ এককে আপনারা জেনেছেন:

- অনুকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন খেলাধূলা
- নিজের মতো করে খেলা
- উল্টানো খেলা
- ভলিবল, কাবাডি, ফুটবল, খো-খো, দেশীয় খেলা
- লম্ফন, ছোঁড়াছুড়ি
- বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজনীয়তা, অঙ্গভঙ্গী, দেহবিকৃতি ও নিরাময় পদ্ধতি
- যোগার সংজ্ঞা, ইতিহাস, যোগাভ্যাস, অষ্টাঙ্গযোগ
- যোগ ও সুস্বাস্থ্যের যোগাযোগ

৫.১২ অনুশীলনী (Unit-End Excercise)

১। ২৫টি শব্দের মধ্যে লিখুন:

(ক) অনুকরণ জাতীয় খেলার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলি নজরে রাখবেন?

(খ) ফুটবলের ইতিহাস সম্পর্কে লিখুন।

(গ) যোগা বলিতে কি বোঝেন?

২। ২৫০টি শব্দের মধ্যে লিখুন:

(ক) শিশু স্বাস্থ্যে যোগার ভূমিকা আলোচনা করুন।

(খ) লৌহ গোলক নিক্ষেপের পদ্ধতির (প্যারি ও বায়েন) ব্যাখ্যা করুন।

৩। শূণ্যস্থানে লিখুন —

(ক) কাবাডি খেলায় কতজন অফিসিয়াল থাকেন? .....

(খ) ফ্ল্যাট ফুট রোগের তিনটি ব্যায়াম উল্লেখ করুন। .....

(গ) নিদ্রা ও বিশ্রামের গুরুত্ব কী? .....

(ঘ) দেহভঙ্গি বিকৃতি বলিতে কী বোঝেন? .....

(ঙ) 'নিয়ম'-এর আচরণগুলি কী কী? .....

(চ) মন সংযোগকারী আসনগুলি কী কী? .....

(ছ) কয়েকটি দেশীয় খেলার নাম লিখুন। .....

(জ) সামনে গড়ানো (Forward Roll)-এর পদ্ধতিগুলি কী কী? .....

৫.১৩ আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন এর উত্তর (Answer check your progress)

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন ১-এর উত্তর

(ক) হাতির মতো চলা, পাখির মতো ওড়া, গাছ থেকে আম পাড়া

(খ) ১৮ মিটার লম্বা ও ৯ মিটার চওড়া

(গ) ইয়ম্ হলো সামাজিক শৃঙ্খলা, যা পাঁচটি অভ্যাসের দ্বারা সংঘটিত হয়

আপনার অগ্রগতি যাচাই করে নিন ২-এর উত্তর

(ক) সুস্বাস্থ্য লাভ, সু-অভ্যাস গঠন

(খ) পাঁচ বছর থেকে ১১ বা ১২ বছর পর্যন্ত

(গ) গতি, সহনশীলতা, শক্তি, ক্ষীপ্রতা, ভারসাম্য

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION ASSIGNMENT
SUB: Art, Health, Work Education & Physical Education
TWO YEAR D.EL.ED. COURSE (ODL) FOR PARA AND RESIDUAL TEACHERS

SESSION: 2015-17

FULL MARKS: 30

There are five sets (1,2,3,4,5) of questions. You will be given any one set of assignment which you will solve and submit within the stipulated time. The answers must be hand written. No photocopy or computer generated copy of the answer would be accepted. Each set has three parts (a),(b) and (c). The first two parts,i,e. (a), and (b) in each set are to be answered within 250 words each and the maximum marks for each such answer: 07. The third part, i.e.(c) in each set is to be answered within 500 words and the full marks of such answer: 16. All the three parts in each set are compulsory.

Set-1

a) Write the objectives of teaching Music at Primary Level. 7

b) What is the reason for inclusion of Art Education at Elementary level? 7

c) Discuss in detail the characteristics of four important types of dances in India. 4×4=16

Set-2

a) What is the reason for inclusion of Art Education at Elementary level? Discuss briefly. 7

b) Write the importance of collage work in Primary education. 7

c) Discuss in detail the role of dance in the physical development of the students of upper primary classes. 16

Set-3

a) What is origami? Give its characteristics. With an example show how you would use origami in any geometry lesson at primary level. 2+3+2

b) What is clay modeling? Discuss the technique of clay modeling with an example. 3+4

c) Discuss the techniques of calligraphy for English and Bengali letters. 8+8

Set-4

a) Discuss : The importance of hygiene in the prevention of diseases. 7

b) What is meant by SUPW? Write on the preparation of any one SUPW. 7

c) What is folk song? Discuss in detail the regional folk songs. 16

Set-5

a) What are recreation games? Give two examples of them. 7

b) Discuss the strategy of teaching the scope of Work Education. 7

c) What is puppet? Discuss the uses of puppet in Primary Education. 16